# মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য

# মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য

**তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

এম্-এ (বাঙ্গলা ও অর্থনীতি)

স্কটিশ-চার্চ্চ কলেজের বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের প্রধানঅধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক
**ডক্টর শ্রীযুত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত** এম্-এ, পিএইচ্-ডি
পরিচায়িত

প্রাপ্তিস্থান

**দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড**

৫৪-৩ কলেজ স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

শ্রীমতী মেরী ডোনাল্ড্‌সন্‌ রায়-কে

# পরিচায়িকা

বইখানির লেখক প্রীতি-ভাজন শ্রীতুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের একজন প্রাক্তন ছাত্র। সেই দাবীতেই এই পরিচায়িকা লিখিতে হইতেছে। প্রাণধর্ম্মের প্রাচুর্য্যে তুলসী তাহার ছাত্র-জীবনেই অনেকের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবন-বোধ ও জীবন-সংগ্রামের বোধ তখনই তাহার বেশ পরিস্ফুট ছিল। তাহাদেরই সংগঠনশক্তির নৈপুণ্যে কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতি সেই যুগে একটি বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। তুলসীর বিদ্যানুরাগ এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বর্ত্তমান কঠোর কর্ম্মজীবনেও অম্লান আছে দেখিয়া খুসি হইলাম। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যে এবং অর্থনীতিতে এম্‌-এ উপাধি লইয়া বোম্বে নগরীতে একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করিবার অবসরে এই বইখানি লেখা হয়।

এই আলোচনা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের নয়, অপেক্ষাকৃত নীরস মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের। এই আলোচনাও সর্ব্বাংশে আধুনিক সমালোচনা নয়; ইহা খানিকটা শ্রদ্ধা ও অনুরাগ-পূর্ণ আস্বাদন, খানিকটা ঐতিহাসিক পরিচয় এবং আখ্যানভাগের সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার এই অনুরাগ লক্ষ্য করিবার মতো। ইহাতে নূতন গবেষণা ঠিক নাই, নূতন ঘটনা-যোজনা, নূতন ব্যাখ্যান বা নূতন আলোকপাতও হয়তো তেমন নাই। সুদীর্ঘ-কাল সাধনা ও গবেষণার ফলে যে সকল বৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদেরই অবলম্বনে পাঠক-সাধারণ, বিশেষভাবে ছাত্র-সাধারণের জন্য স্বল্পাক্ষরে স্বল্পায়তনে সহজ ভাবে লেখক বিষয়গুলি নিজ সরস

ভঙ্গী সহকারে উপস্থিত করিয়াছেন। পড়িলেই বুঝা যাইবে—কথা বলিবার পটুতা লেখকের আছে।

জাতিকে বুঝিতে হইলে জাতির ইতিহাস ও দর্শন বুঝিতে হয়, অথবা কেবল জাতির সাহিত্য আলোচন করিতে হয়। কারণ, ইতিহাস ও দর্শন দুই-এর একসঙ্গে প্রকাশ হয় সাহিত্যে। তাই রসাস্বাদন ও জাতির স্বরূপ পরিচয় জ্ঞান—উভয় কারণে সাহিত্যই আমাদের প্রধান আলোচ্য বস্তু। জাতির অতীত ছাড়া বর্ত্তমান বা অনাগতকে ঠিক বুঝা যায় না। অতীতের ঐশ্বর্য্য আমাদের আভিজাত্য বোধ জন্মায়, আত্মশক্তির স্ফুরণ ঘটায়, আমাদের জাতীয়প্রবণতা আবিষ্কার করিয়া ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ নির্দ্দেশ করে। রামায়ণ, মহাভারত, অথবা ভাগবত কেবল বাঙ্গালীর নয়, ভারত-বাসীরই নিত্য কালের বস্তু। মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙ্গালীজাতির একপ্রকার পুরাণ-কাব্য। শাক্ত, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য বাঙ্গালীর মর্ম্মবাণী। পদ-সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে কে না মুগ্ধ হইয়াছেন, নিবিড়তায় ও গভীরতায় কে না আত্মহারা হইয়াছেন! জাতির গীতিকাব্যপ্রবণতার ও ভাব-তন্ময়তার মূল কোথায়, তাহা এই আলোচনা হইতে সহজেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। তাই মধ্যযুগের সাহিত্য আলোচনার প্রয়োজন অপণ্ডিত সাধারণের পক্ষেও অল্প নয়। উচ্চ-শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষে তো এ আলোচনা অপরিহার্য্য।

লেখক সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। সমালোচনা-সাহিত্যে আমাদের দৈন্য অথবা অনগ্রসরতা সকলকেই পীড়া দেয়। ভরসা করি, বৃহত্তর ও মহত্তর ক্ষেত্রে আমরা শ্রীমান্ তুলসীপ্রসাদকে শীঘ্রই বিচরণ করিতে দেখিব।

২১শে আষাঢ়,
১৩৫৮

**শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত**

## নিবেদন

গৌরচন্দ্রিকার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ঋণ স্বীকারের একটা বড় দায়িত্ব আছে। সেই সঙ্গে নিজের দোষ ঢাকারও অভিপ্রায় কম নয়। এ বইটিতে নতুন বিষয় এমন কিছু নেই যা বিদ্বজ্জন সমাজে অপরিচিত। গ্রন্থ-পঞ্জীতে যে সমস্ত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকাদির উল্লেখ করা হ'য়েছে, সেগুলি থেকে উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ ক'রে ও অল্পবিস্তর সাহায্য নিয়ে এতে বাঙলা দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায়, বিষয় বিভাগ করে, সমগ্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের প্রধান তিনটি শাখার সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'য়েছে। গ্রন্থকার ও প্রবন্ধ লেখকগণের উল্লেখ যথাস্থানে করা হ'য়েছে। পূর্ব্ব সূরিগণের জীবনব্যাপী ঐকান্তিক সাধনায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হ'য়েছে, বাঙলা দেশ গৌরবময় আসন লাভ করেছে। সেই সঙ্গে অনুগামীর পথও সুগম হ'য়েছে। এখানে একত্রে সকলের কাছেই শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার গভীর ঋণ স্বীকার করছি।

বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে পারবে বলে ভরসা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্ররূপে এক সময়ে যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হ'য়েছিলাম এতে তার কতকটা দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি,—বইটির কলেবর জটিল আলোচনায় অযথা বৃদ্ধি না করেও। তাছাড়া, সাধারণ রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকা, যাঁদের পক্ষে এ বিষয়ে পথিকৃৎ শ্রদ্ধেয় আচার্য্যগণের গবেষণাপূর্ণ বিরাট্ গ্রন্থগুলি পড়ার অবকাশ অল্প, তাঁদের কথাও স্মরণ রেখে অগ্রসর হ'য়েছি। এ থেকে তাঁরা প্রাক্-আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মূল ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন। সেই সঙ্গে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামতের সঙ্গেও মোটামুটি পরিচয় লাভ করবেন। অবশ্য কুহাচ্ছন্ন মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের দুর্গম প্রদেশে এ বইটি সামান্য প্রদর্শিকা মাত্র।

ডক্টর শ্রীযুত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় এবং ডক্টর শ্রীযুত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁদের অমূল্য সময়ের অনেকখানি দিয়ে বইখানি আগাগোড়া পড়েছেন এবং অনুগ্রহ করে যথাক্রমে 'পরিচায়িকা' ও 'অভিমত' লিখে দিয়েছেন। এঁরা উভয়েই আমার পূজনীয় অধ্যাপক। এঁদের কাছে তাই আমার ঋণ

চিরদিনই অপরিশোধ্য। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার বসু বইটির পাণ্ডুলিপিখানি ছাপাখানায় যাওয়ার আগেই পড়ে দেখেছিলেন এবং একটি অভিমত লিখে পাঠিয়ে প্রীতিমুগ্ধ করেছেন।

স্বনামখ্যাত শিল্পী শ্রীযুত সত্যজিৎ রায় প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ বইটির প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও অঙ্কন করে দিয়েছেন।

বইখানি লেখার কাজে প্রথম থেকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর শ্রীযুত সুশীলকুমার রায় মহাশয় এবং আমার অগ্রজ ডাক্তার শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটি লেখা হ'য়েছে বোম্বাই প্রবাস কালে। সেখানে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা মাধুরী দেবী এবং রসায়নাচার্য্য ও সাহিত্যরসিক প্রীতিভাজন শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে তাঁদের গ্রন্থাগার দু'টি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। সোদরপ্রতিম শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল বইটি ছাপার সময় দেখাশোনা করেছেন। শ্রীমান্ সুজিৎকুমার গুপ্ত কাগজের দুর্ভিক্ষের মাঝে কালোবাজারের পৃষ্ঠপোষকতা না করেও কাগজ সংগ্রহ করে আমাকে বিস্মিত করেছেন। বইখানি ছাপাও হ'য়েছে তাঁরই আগ্রহে। বইটি ছাপানো যদি অন্যায় হ'য়ে থাকে সেজন্য তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী। কল্যাণীয়া রিণা ও রাকা গুপ্ত এবং শ্রীমতী কমলিকা জোর করে প্রুফ দেখার ভার নিয়ে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করেছেন।

গ্রন্থকারের অজ্ঞতা ও অনবধানতা-বশতঃ ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু থেকেই গেছে। সেজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি।

'ব্যানার্জ্জী লজ্'
সকরি (দ্বারভাঙ্গা)
রথযাত্রা ১৩৫৮

বিনীত
**গ্রন্থকার**

# সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

# মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য

# পরিচয়

বাঙগলা সাহিত্যের গোড়া'র কথা বেশী কিছু জানা যায় না। প্রাচীনতম বাঙগলাভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় রাগরাগিণী ও সংস্কৃত টীকা সম্বলিত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় (মোট সাড়ে ছে' চল্লিশটি পদ) পুঁথিতে। মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ খৃীষ্টাব্দে নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে এই খণ্ডিত পুঁথিখানি আবিস্কার করেন। এটি একখানি পদসংগ্রহ গ্রন্থ। এই চর্য্যাগীতিগুলি শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত "হাজার বছরের পুরান বাঙগালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৩২৩ বঙগাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক কাল পরে ডক্টর শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় এই সংগ্রহ গ্রন্থের একটি তিব্বতী অনুবাদও নেপালে পান। এই তিব্বতী অনুবাদে পদ আছে একান্নটি। মূল সংখ্যা বোধকরি এই-ই ছিল। এগুলিতে আদি যুগের অর্থাৎ মোটামুটিভাবে খৃীষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের বাঙগলা ভাষায় লেখকদের পরিচয় মেলে। এইগুলি বোধ হয় রাঢ় অঞ্চলের ভাষায় লেখা হয়েছিল। প্রায় হাজার বছরের পুরাতন সন্ধ্যা ভাষায়* রচিত এই হেঁয়ালীপূর্ণ গানগুলি অধ্যাপক শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন বসু এম.এ. মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত 'চর্য্যাপদ' কয়েক বৎসর আগে (১৯৪৩) প্রকাশিত হয়েছে। শুধু বাঙগলা সাহিত্যেরই নয় আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এই গীতগুলির মূল্য অপরিসীম। প্রাচীন কালে বৈষ্ণব-পদাবলীর মত বিভিন্ন পদকর্ত্তা রচিত চর্য্যাপদ জাতীয় বিরাট্ বৌদ্ধ গীতি-সাহিত্য ছিল। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে এই গীতি সাহিত্য থেকে মাত্র একান্নটি পদ সংগৃহীত হয়েছিল মনে হয়। এগুলি বাঙগলা কীর্ত্তন গানের প্রাচীনতম রূপ। চর্য্যাপদগুলিতে পয়ার-ত্রিপদী

---

* শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন—"সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার; খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।" (বৌদ্ধ গান ও দোহা, ভূমিকা।) অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় লিখেছেন, "সন্ধ্যা ভাষা অর্থে বিশেষ চিন্তা করিয়া যে ভাষার (প্রচ্ছন্ন) অর্থ স্থির করিতে হয়।"......"চর্য্যাগুলি এই ভাষায় রচিত হইয়াছে বলিয়া টীকা ব্যতীত ইহাদের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে।" (চর্য্যাপদ, ভূমিকা।)

মাত্রাবৃত্ত প্রভৃতি বাঙলা ছন্দের সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন মেলে। এই সংগ্রহ গ্রন্থে প্রত্যেকটি পদই অন্ত্যমিলে বাঁধা। এগুলি বাঙলা, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী ছন্দের আদিরূপ। পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের দেশে চতুর্দ্দশ পদে কবিতা রচনার ধারা প্রবর্ত্তিত হয়েছে বলে একটা ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্য্যার দুটি পদে দেখা যায়। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ অনেক চৌদ্দপদী কবিতা রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই প্রাচীন ধারা অনুসরণ করে চৌদ্দপদের অনেক কবিতা সৃষ্টি করেছেন। এই চর্য্যাগীতি-গুলিতে লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, আর্য্যদেব, কঙ্কণপাদ, কাহ্নুপাদ বা কৃষ্ণাচার্য্য, শবরপাদ, সরহপাদ প্রমুখ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের সহজযানী বৌদ্ধ ধর্ম্ম সাধনার গুহ্য আচার-আচরণ সম্বন্ধে পদ আছে। এই পদগুলি চব্বিশজন সিদ্ধাচার্য্যের রচিত এবং এঁদের অনেকেই তিব্বতে স্বীকৃত চুরাশীজন মহাসিদ্ধার তালিকা ভুক্ত। লুইপাদ আবার আদি সিদ্ধাচার্য্যরূপে কথিত হন। উক্ত তালিকায় তাঁর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে তাঁর একখানি পদ সর্ব্বপ্রথম সন্নিবেশিত দেখা যায়। তিনি বাঙলা দেশের লোক, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সম্ভবত তাঁকে একটি গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। তিনি দশম শতকের শেষে অথবা একাদশ শতকের প্রথমে সহজতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। ডক্টর শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় লুইপাদ ও মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ অথবা মৎস্যান্ত্রাদকে অভিন্ন বলে মনে করেন। নাথধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ*। সিদ্ধাচার্য্য ভুসুকু সম্ভবত খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয় মনে করেন, ভুসুকু দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশের পঞ্চ শিষ্যের অন্যতম এবং তিনি বাঙলা দেশেরই একজন প্রাচীন কবি। শবরপাদ ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের এক ব্যাধ বা শবর। অধ্যাপক শ্রীযুত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় মনে করেন, ইনি

---

* পাল আমলে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ (লুইপাদ ?)। প্রবর্ত্তিত শৈব নাথ ধর্ম্ম এবং নাথ সাহিত্য গোরক্ষ বিজয় (মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনী) গোবিন্দচন্দ্র ময়নাবতীর পাচালী সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালী ও ধীবর শ্রেণী সম্ভূত। পূর্ব বঙ্গ এবং কামরূপে হঠযোগ, যোগিনী কৌলধর্ম্ম এবং নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা মীননাথ ও লুইপাদকে অভিন্ন মনে করে এবং নিজ নিজ ধর্ম্মের আদিগুরু বলে স্বীকার করে। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য সিদ্ধ গোরক্ষনাথ ছিলেন বঙ্গাল দেশের রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ চন্দ্রের মাতা মদনাবতী বা ময়নাবতীর গুরু। ময়নাবতীর যোগশক্তি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী বাঙলা দেশে প্রচলিত আছে। একাহিনী প্রাচীন। কিন্তু একাহিনীর প্রাচীনতম পুঁথি অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়নি।

অষ্টম-নবম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন এবং রসায়নাচার্য্য নাগার্জুনের কাছে তন্ত্রধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সরহপাদ (সরহ-রাহুলভদ্র?) সম্ভবত একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং কিছুকাল নালন্দা মহাবিহারের মহাচার্য্যপদ অলঙ্কৃত করেন। চর্য্যাপদের ভাষার উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

লুইপাদের রচনার নমুনা হিসাবে এই পুঁথির প্রথম চর্য্যাটি ও তার ভাবানুবাদ দেওয়া হলঃ—

"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চিএ পইঠা কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনু পাখ ভিতি লেহুরে পাস॥
ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥"

**ভাবানুবাদ**

"কায়ারূপ তরুবর, পাঁচ তার ডাল।
চঞ্চল চিত-মাঝে পশে আসি কাল॥
দঢ় করি মহাসুখ কর পরিমাণ।
লুইভণে গুরুকে পুছিয়া ইহা জান॥
সকল সমাধি দ্বারা কিবা করা যায়।
সুখ দুখে নিশ্চিত মরিবেই হায়॥
ছন্দের বন্ধন এড় করণের (পারিপাট্য) আশ।
শূন্যতা পক্ষের দিকে লহ তুমি পাশ॥
লুইবলে ইহা আমি ধ্যানে দেখিয়াছি।
ধমণ চমণ দুই পীঁড়িতে বসেছি॥" (চর্য্যাপদ)

চর্য্যার সাহিত্য মূল্য ও কবি কল্পনার পরিচয় বলে শবরপাদের একটি চর্য্যার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :—

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবতগুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি!
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মোউলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহা সুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী॥"

## মর্ম্মার্থ

"উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বসতি করে শবরী বালিকা; শবরীর পরিধানে ময়ূরের পাখা, গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না, দোহাই তোমার—আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হইল, গগন স্পর্শ করিল ডাল, কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী একেলা শবর এ-বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন ধাতুর খাট পাতিল শবর, মহাসুখে বিছাইল শয্যা; শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্ত্রী—উভয়ে একত্র প্রেমরাত্রি পোহাইল।" (বাঙালীর ইতিহাস)।

এই চর্য্যাগুলি যাঁরা রচনা করে ছিলেন তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর লোক নন্। সমাজের নিম্নস্তরে এঁদের অধিকাংশেরই জন্ম এবং পদগুলি তাঁরা যাদের জন্য রচনা করেছিলেন, তারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক ও অশিক্ষিত। তাই এই গীতগুলির ভাষা উপমা প্রবাদ প্রভৃতিতে কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুন্সিয়ানা নেই। রূপক ও গুহ্য অর্থ যা আছে তা সাধন সঙ্কেত, গুরুর সাহায্যে সেটি বুঝতে হয়।

এই পর্ব্বের পরেও জনসাধারণের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের স্রোত অব্যাহত থেকেছে, কিন্তু নির্ভর যোগ্য কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। আদিযুগ থেকে মধ্যযুগের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান রয়ে গেছে। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্য পর্য্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে, মধ্যযুগের সাহিত্য অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ

করেনি। আদিযুগ ও মধ্যযুগের মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র ছিল এবং মধ্য যুগের সাহিত্য আদিযুগের উপর ক্রমবিকাশের একটি পূর্ণতর স্তর। বাঙগলা অক্ষরে লিখিত আজ পর্য্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ আবিস্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন পুঁথি হল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। বড়ু চণ্ডীদাসকে নিয়েই প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাঙগলা সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ বঙগাব্দে বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র বংশীয় শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরে এই খণ্ডিত পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঁরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুঁথির লিপি বিচার করে এর মধ্যে এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন ধরনের হস্তাক্ষর দেখতে পান এবং স্থির সিদ্ধান্ত করেন, এটি "......১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" ডক্টর ঁদীনেশচন্দ্র সেন এই মত সমর্থন করে লিখেছেন "ইহার হস্তলিপি ১৩৮৫ খৃঃ অব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ের, বরং তাহার পূর্ব্বের, কিছুতেই তৎপরবর্ত্তী নহে।" শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন এই পুঁথি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে লিখিত হয়েছিল। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলের খান কয়েক পুঁথির সঙেগ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথির লিপি মিলিয়ে এই পুঁথিতে তিনজন লিপিকারের হাতের ছাপ আছে মনে করেন। তাঁর অনুমান এই পুঁথি ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিখিত হয়েছিল। ডক্টর শ্রীযুত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, এই পুঁথির ভাষা হল প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষদিকে পশ্চিম বঙেগ প্রচলিত সাহিত্যিক ভাষার নিদর্শন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাল সঠিক জানা যায় না। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অপর নাম অনন্ত। যাই হোক, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ছন্দ ও গঠন ভঙগীতে বেশ একটা সুপরিণত ভাব দেখা যায়।

বাঙগলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ বল্‌তে মোটামুটি ভাবে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্য্যন্ত সময়কে বোঝায়।

মধ্যযুগের বাঙগলা সাহিত্য যদিও কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহমান ছিল তথাপি সেই যুগেই এই সাহিত্যের কুলপ্লাবনী বন্যা আসে। এই:সাহিত্য

স্রোত ত্রিবেণীধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এই যুগের সাহিত্যের তিনটি প্রধান শাখা—(১) অনুবাদ সাহিত্য (২) মঙ্গল কাব্য অথবা লৌকিক সাহিত্য এবং (৩) বৈষ্ণব সাহিত্য।

বৌদ্ধ পালরাজাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সমাজের সকল বর্ণ ও রাষ্ট্রের সকল শ্রেণী তাঁদের আমলে সমান মর্য্যাদা পেত। বণিক, শিল্পী ও কৃষকেরা মর্য্যাদা লাভ করত। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ভাষা ও সাহিত্য আদৃত হত। এইযুগে মহাযানী বজ্রযানী সহজযানী কালচক্রযানী সিদ্ধাচার্য্যেরা বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-সাহিত্য সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সংস্কৃত অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙলায়। মূল গ্রন্থগুলি কালপ্রবাহে নষ্ট হয়ে গেছে, তিব্বতী অনুবাদ কিছু কিছু পাওয়া যায়। পাল রাজারা একদিকে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘের সেবা করেছেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও আদর্শকে দেশে বিদেশে প্রচার করেছেন, বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ এবং বিক্রমশীল সোমপুর ত্রৈকূটক জগদ্দল ওদন্তপুরী নালন্দা প্রভৃতি মহাবিহারগুলি যথাক্রমে প্রতিষ্ঠা সমৃদ্ধি ও সংস্কার করেছেন। অপর দিকে তেমনি তাঁরা ব্রাহ্মণ মহা অমাত্য নিয়োগ করেছেন। শিব, একাদশ রুদ্র, নারায়ণ, সূর্য্য, স্কন্দ ও গণপতির মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি ও প্রভূত অর্থ দান করেছেন। পাল বংশের শেষ সম্রাট মদনপালদেবের মহিষী চিত্রমতিকা রাজ অন্তঃপুরে বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত শ্রবণ করতেন। পাল পর্ব্বেই (পাল সম্রাট প্রথম মহীপালের সময়) ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তন হয় এবং এই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে সমাজে যেমন নিম্নশ্রেণীর যোদ্ধৃজাতিগুলি একতাবদ্ধ হতে থাকে অপর দিকে তেমনি শূন্যপুরাণ ধর্ম্মমঙ্গল গান প্রভৃতি রচনা হতে থাকে জনগণের নিজস্ব ভাষায়। পালরাজত্বের গৌরবময় যুগেই সুসম্বদ্ধভাবে প্রকৃত বাঙলা সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। এই যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাহিত্য এবং আন্তর্দেশিক ব্যবসা বাণিজ্যকে আশ্রয় করে দেশ বিদেশের সঙ্গে এই দেশের যোগাযোগও ঘনিষ্ট হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বাঙালী পাল রাজ বংশের পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ হতে আগত সেন রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। সেন রাজারা বৌদ্ধযুগের বিকৃত হিন্দুসমাজকে ভেঙে রক্ষণশীল দক্ষিণী ছাঁচে নূতন করে গড়তে গিয়ে কঠিন অনুশাসনের ব্যবস্থা করলেন। এই সময় ভবদেব ভট্ট, অনিরুদ্ধ, হলায়ুধ মিশ্র, জীমূতবাহন প্রমুখ পণ্ডিতগণ হিন্দুর

ক্রিয়াকর্ম্ম পূজোপার্ব্বণ দায়ভাগ বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। বিজয় সেনের পুত্র অনিরুদ্ধ-শিষ্য রাজা বল্লাল সেন (আ ১১৫৮-১১৭৯) আচার সাগর, প্রতিষ্ঠা সাগর, দান সাগর, ও অদ্ভুত সাগর ইত্যাদি হিন্দুর আচার ব্যবহার বিষয়ে পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িত; তবে এ তথ্য সম্ভবত অনৈতিহাসিক। এই স্মৃতিশাসিত সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান হল রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমি এবং পরে পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর অঞ্চল। এই পর্ব্বে কোন গভীরতর জ্ঞানসাধনা বা উচ্চতর দর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এযুগে দেখা যায় কেবল ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি, সংস্কার ও পূজা-অর্চ্চনার জয়জয়াকার। রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি সংকীর্ণ। শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায় অবজ্ঞাত; কৃষকশ্রেণী বিস্মৃত। শুধু ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-জ্যোতিষের দল যে কোন অজুহাতে একের পর এক ভূমিদানপত্র লাভ করে চলেছেন। সমাজের স্তরে স্তরে, বর্ণে বর্ণে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদ, বিধিনিষেধের নিগড়। সংহত শক্তি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার একান্ত অভাব এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ক্ষীণায়ত ও পঙ্গু করে তুলেছে। হিন্দুধর্ম্মের আড়ম্বর ও নিষ্ঠা প্রচার করতে গিয়ে দেবদাসী প্রথা ও সতীদাহ প্রথা প্রসারলাভ করল ও হরেক রকম গোঁড়ামী দেখা দিল। উচ্চবর্ণের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, সংগীত ও শিল্প-কলা বিলাসলালসাময় ও যৌনাতিশয্য পীড়িত হয়ে ক্রমে জনসাধারণের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। বাংলা ভাষার সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়াদের সম্পর্ক থাকায় সেটিকে অপাংক্তেয় করে সংস্কৃত-চর্চ্চার সুবর্ণ যুগ আরম্ভ হল, রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও অভিজাত উচ্চকোটির লোকদের সহযোগিতায়। শরণদেব (২০টি শ্লোক শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সংকলন গ্রন্থে পাওয়া যায়), গোবর্দ্ধনাচার্য্য (আর্য্যা ছন্দে রচিত সপ্তশতী নামে বিখ্যাত শৃঙ্গার কাব্যের রচয়িতা), ধোয়ী (কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১০৪টি শ্লোকে পবনদূত কাব্যের রচক, এই কাব্যে সুকৌশলে রাজা লক্ষণ সেনের স্তুতিবাদ করা হয়েছে।), উমাপতি ধর (সদুক্তিকর্ণামৃতে এঁর ৯১টি শ্লোক সংগ্রহ করা হয়েছে। ইনি বিজয় সেন, বল্লাল সেন এবং লক্ষণ সেন তিন জনের রাজসভাতেই ছিলেন এবং লক্ষণ সেনের পলায়নের পর বিজয়ী তুর্কী রাজেরও স্তুতি শ্লোক রচনা করেছেন। চন্দ্রচূড় চরিত কাব্যটি ইনি রাজা চাণক্যচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন। জয়দেব এঁর কাব্যের প্রশংসা করে বলেছেন "বাচঃ পল্লবয়তি"। অনেকে অনুমান করেন যে এই উমাপতি ধরই প্রাকৃতজনের ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক

পদ রচনা করেছিলেন। একটি পদের ভণিতা এইরূপ—"সুমতি উমাপতি, সকল ত্রিপতি পতি, হিন্দুপতি রস জানে"॥ এটি কোন উমাপতি রচিত বলা কঠিন। মৈথিলীরা এই উমাপতিকে স্বদেশবাসী বলে দাবী করেন।), জয়দেব (সরস শৃঙ্গাররসাবেশময়, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য গীতগোবিন্দম্ রচয়িতা) প্রভৃতি প্রতিভাবান কবিগণ এই যুগে আবির্ভূত হয়ে রাজসভা-কবিরূপে সংস্কৃত ভাষায় অবাধ কল্পনাযুক্ত বীর রস এবং আদি রসাত্মক সরস কাব্য রচনা করেছেন এবং অন্নদাতা সেন রাজাদের স্তুতি-প্রশস্তিময় অজস্র শ্লোক রচনা করেছেন। পরবর্ত্তীকালে চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে রাধাকৃষ্ণের লাস্যলীলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যের মর্য্যাদা লাভ করেছে ও ধর্ম্মগ্রন্থের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাঁর কাব্যের প্রভাব সমগ্র উত্তর ভারতের সাহিত্যকে প্রেরণা দিয়েছে। এ সমস্তই সত্য, কিন্তু বিদেশী আক্রমণকারীরা যখন বাঙলার দরজায় হানা দিয়েছে তখনও বাররামাদের নৃত্যগীতে আবেশময় সেন-রাজসভায় অলঙ্কার বহুল, মদিরা মধুর কামলালসাপূর্ণ কাব্য রচনা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। আশ্চর্য্য এই যে, এই ঘনায়-মান দুর্য্যোগের কোন ছাপই এ যুগের সাহিত্যে নেই। বাঙলার ইতিহাসে এই কলঙ্ক-কালিমা-লিপ্ত অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে নবদ্বীপেই কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ-সভায়—পলাশীর বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ব্বাহ্নে। যাইহোক, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কিন্তু এই রাজসভাপুষ্ট সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ যোগ ছিল না। রাজার অবহেলা, রাজপুরুষের তাড়না ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অত্যাচারে জনসাধারণ ও বিশেষ করে সদ্ধর্ম্মীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধলামা তারনাথের বিবরণ থেকে মনে হয় তাদের এই অসন্তোষ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যের সুযোগ নিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে—ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমেই (শেক শুভোদয়া এবং তিব্বতী পাগ্-সাম-জোন্-জাং নামক গ্রন্থদ্বয়ের মতানুসারে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ) ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী আল্পায়াসে গৌড় বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৌলানা মিনহাজ উদ্‌দীন এর বিবরণ এবং ইস্‌মী লিখিত ফুতুহ্—উস্-সালাতিন্ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মগধ অধিকার করার পর বখ্‌তিয়ার আঠারজন তুর্কী সঙ্গীসহ বেলা দ্বিপ্রহরে অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে অতর্কিতে নবদ্বীপ আক্রমণ করেন, এবং তাঁর পশ্চাতে আগত বিরাট সৈন্যবাহিনী লুণ্ঠতরাজ আরম্ভ করে। সে যাই হোক, তবে তুর্কীদের নানা সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে সমস্ত বাঙলা দেশ অধিকার করতে প্রায় দেড়শ বছর লাগে। এই সময়ের অরাজকতা ও

অনিশ্চয়তার ছাপ সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলিতেই সুস্পষ্ট। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর বাঙ্গলায় স্বাধীন ইলিয়াস্ শাহী সুলতানদের আমলে দেশের অশান্তি কিছুটা দূর হয়। জ্ঞানচর্চ্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকুল আবহাওয়া ক্রমেই দেখা দিতে থাকে।

# অনুবাদ-সাহিত্য

## অনুবাদ-সাহিত্য

পাঠান সুলতানদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা বাঙলা দেশকেই স্বদেশ বলে মনে করলেন। রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য তাঁরা হিন্দু সচিব সৈন্যাধ্যক্ষ ও অমাত্য নিয়োগ করলেন। সেই সঙ্গে এদেশের জনসাধারণের ভাষাকে রাজ-দরবারে সমাদর করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা হিন্দুদের ধর্ম্মকর্ম্ম আচার ব্যবহার পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে জানার জন্য কুতূহলী হয়ে উঠলেন। এঁদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বাঙলাভাষায় সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদের প্রয়োজন হল। রাজদরবারের অনুকরণে ক্রমে ভদ্রসমাজে বাঙলার আদর হওয়ায় উচ্চবর্ণেরা এই ভাষায় অনুবাদ এবং মৌলিক সাহিত্য রচনায় উৎসাহী হলেন।

বড়ু চণ্ডীদাস গৌড়ের সুলতানের নিকট সমাদর লাভ করেছিলেন। চণ্ডীদাসের পর কৃত্তিবাস। তিনি গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের আশ্রয়লাভ করে তাঁর আদেশে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অনুবাদ করেন। কৃত্তিবাসের পর মালাধর বসু বা গুণরাজ খান্। তিনিও গৌড়ের কোন সুলতানের দ্বারা সম্মানিত হয়ে ভাগবতের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেন। কবীন্দ্র (পরমেশ্বর) শ্রীকর নন্দী পাঠান শাসন কর্ত্তাদের আদেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত অনুবাদ করতে আত্মনিয়োগ করেন। যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন, রূপ, সনাতন প্রভৃতি কবিগণ মুসলমান সুলতানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিদ্যাপতি বিদগ্ধ নসির শাহের মঙ্গল কামনা করেছেন। বিজয়গুপ্ত হুসেন শাহের (অলাউ-দ-দীন মুজফ্ফর হুসৈন শাহ) প্রশংসা করেছেন। সুলতান নুসরৎ শাহের পুত্র যুবরাজ ফীরূজ শাহের আদেশে দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। আরাকানে রোসাঙরাজের প্রধান মন্ত্রী মুসলমান মাগন ঠাকুরের আদেশে সৈয়দ আলাওল কবি জায়সী রচিত পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ করেন।

অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমেই গৌড়ের রাজদরবারে বাঙলা সাহিত্যের মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিদ্যোৎসাহী রাজা দনুজমর্দ্দনদেব বা রাজা গণেশ। তাঁর পুত্র 'গৌড়াবনীবাসব' যদু রাজনৈতিক বা অপর কোন কারণে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দীন নাম গ্রহণ করলেও তিনি পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতীয় ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন এবং কবি পণ্ডিতের

সম্বর্দ্ধনা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন 'রায় মুকুটমণি' উপাধিক বৃহস্পতি। পরবর্ত্তী গৌড়েশ্বরগণ সকলেই মুসলমান ছিলেন। তাঁরাও এই রীতি অনুসরণ করে গেছেন। এইভাবে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ—বিশেষ করে অনুবাদ শাখা—গৌড়ের রাজদরবার অন্যান্য হিন্দু বা মুসলমান শাসক এবং ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম ও বিকাশ লাভ করে। রামায়ণ ও মহাভারতের কোন কোন অংশ এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ অনেক কবিই রচনা করেছিলেন। এতে ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য বলতে বর্ত্তমানকালে আমরা যেমন প্রায় যথাযথ অনুবাদ বুঝি, সে যুগে সেরূপ ছিল না। অনুবাদ বল্‌তে গল্পাংশের সারানুবাদ মাত্র বোঝায়। অনুবাদকারিগণ মূল সংস্কৃত আলেখ্যকে আদর্শ বেখে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মৌলিক রচনার রূপ নিত। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। মহিলা কবি চন্দ্রাবতীও তাঁর রামায়ণে একটি নূতন চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন।

জনসাধারণের জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অমৃত মন্দাকিনী প্রবাহিত করার অপরাধে এঁরা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁরা এঁদের ভাষানুবাদ শ্রোতাদের জন্য রৌরব নরকের ব্যবস্থা করেছিলেন,—

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

এই শাস্ত্রানুবাদকারীদের প্রতি তাঁরা কটূক্তি করেছিলেন, "কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে, আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্ব্বনেশে।" সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই ধর্ম্মযাজক ও পুরোহিতের দল স্বীয় প্রতিষ্ঠা খর্ব্বের আশংকায় ধর্ম্মগ্রন্থের মর্য্যাদা সম্পন্ন সাহিত্যের ভাষানুবাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। লাতিন ভাষা থেকে বাইবেল সাধারণের বোধ্য ভাষায় অনুবাদকারী মার্টিন লুথার এবং তাঁর সহব্রতধারীদের দুর্ভাগ্য ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কৃত্তিবাস কাশীরামদাসের রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষা ও ভাবানুবাদ না থাকলে উক্ত দুই মহাকাব্য হয়তো চিরদিন আপামর সাধারণ লোকের অগোচরেই থেকে যেত। সমাজের সকলস্তরের লোকের উপর এঁদের অতুলনীয় প্রভাব লক্ষ্য করে মহাকবি মাইকেল বলেছেন "তেতলাও পড়ছে, বটতলাও পড়ছে'।" বাস্তবিক

আমাদের জাতীয় জীবনে কৃত্তিবাস ও কাশীরামের প্রভাব অপরিসীম। হিন্দি অবধি ভাষায় সন্ত তুলসীদাসের "রামচরিত মানস" বাল্মীকি রামায়ণ ও বহু পুরাণ বর্ণিত কাহিনীর মর্ম্মানুবাদ। তাঁর প্রসাদে রামায়ণের কাহিনী বহির্বাঙগলায় সর্ব্বত্র—বিশেষ করে উত্তর ভারতে—বহুল প্রচারিত হয়েছে। রামায়ণের পরে মহাভারত অন্য প্রদেশের তুলনায় বঙগদেশেই সর্মাধিক মর্য্যাদা লাভ করেছে। ভক্তের চক্ষে মহাভারত কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ভাবমণ্ডিত দ্বাপরীয় লীলার কাহিনী। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব ও কৃষ্ণভক্তির প্রাবল্য বাঙগলাদেশে মহাভারতের সর্মাধিক প্রচারের একটি প্রধান কারণ। কৃষ্ণায়ণ বা ভাগবতের অনুবাদ গ্রন্থ বৈষ্ণবযুগে বিশেষভাবে আদৃত হলেও রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় এত সর্ব্বজন-প্রিয় হতে পারে নি।

উপরোক্ত মহাকাব্যগুলির অনুবাদ ছাড়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থাদি প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের গ্রন্থ এবং অপর কয়েকটি সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ রচনা হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর আদেশে অনেক ভক্ত বৈষ্ণব অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হন।

সে যুগে হিন্দুরা দেব দেবীর মাহাত্ম্য নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন, বিশুদ্ধ মানবীয় প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে সাহিত্য রচনার কথা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁদের কাছে সাহিত্য মানেই ছিল ধর্ম্ম-সাহিত্য। কিন্তু মুসলমান কবিরা সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সব সময় ধর্ম্মকে জড়াতেন না। সে জন্য রোম্যাণ্টিক কাহিনী কাব্যে তাঁরাই অগ্রণী হয়ে পড়লেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার আশ্রয়ে মুসলমান কবিরা দেব দেবীর মাহাত্ম্য-নিরপেক্ষ নরনারীর প্রণয় কাহিনী ও নীতি কথাকে উপজীব্য করে যথার্থ লৌকিক উপাখ্যানমূলক কাব্য রচনা করতে থাকেন। এই কাব্যগুলি ফার্সী, আরবী ও হিন্দি পুস্তকাদি এবং দেশ প্রচলিত উপাখ্যানের উপব ভিত্তিকরে রচিত। অতএব এগুলির অধিকাংশই অনুবাদ পর্য্যায়ভুক্ত। দৌলৎ কাজী সর্ব্বপ্রথম এবং সৈয়দ আলাওল এই কাব্যধারার সর্ব্বাধিক পরিচিত কবি।

বাঙগলা দেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পর্ত্তুগীস্ পাদ্রী মানোএল্-দা-আস্সুম্পসাম্ পর্ত্তুগীস ভাষায় লিখিত খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থের অনুবাদ বাঙগলা গদ্যে করেন।

# রামায়ণ

**কৃত্তিবাস—**

> জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
> কৃত্তিবাস নাম তোমা!—কীর্ত্তির বসতি
> সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,"—মধুসূদন দত্ত

মধ্যযুগে যে ক'খানি কাব্যের অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় হয়েছিল তার মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকিকৃত সংস্কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ অনুবাদকারিগণের মধ্যে কৃত্তিবাসই শ্রেষ্ঠতম। জনপ্রিয়তা যদি কবি-প্রতিভা বিচারের মানদণ্ড হয় তবে কৃত্তিবাস বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত প্রিয় গ্রন্থ বোধকরি আর দ্বিতীয় নেই। কৃত্তিবাস মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম আদি কবি। ৺হারাধন দত্ত ভক্তনিধির কাছে ১৫০১ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি সুপ্রাচীন পুঁথি থেকে ৺দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অংশটি প্রকাশ করেন। পুঁথিটি অকস্মাৎ লুপ্ত হ'য়ে যায়। এই পুঁথিখানিকে অনেকে অর্ব্বাচীন অথবা জাল বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। উক্ত পুঁথিতে আত্মবিবরণের অংশটি এইরূপ ছিল :—

> "পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
> তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
> বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
> বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
> সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
> বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
> গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
> রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
> পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
> আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥

কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ খানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসার বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদরহিত ওঝা—সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥

বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বইন হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
আপনার জন্ম কথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈল নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জানিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার॥
মুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাহার আচার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভহৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার॥

তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দ নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথম হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয় ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উষ্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরুর স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাশে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তেঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥

ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব-অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাঁড়াইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্যগীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে॥
আঙিগনায় পড়িয়াছে রাঙগা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে॥
রাজা আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম চারিহাত অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুষি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥

পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্দেশ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥"

এই আত্মবিবরণ অংশটি থেকে জানা যায় যে, কৃত্তিবাসের পিতামহের নাম মুরারি ওঝা, পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মেনকা। কবির পূর্ব্ব পুরুষ নৃসিংহ ওঝা প্রমাদের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়ে (১৩১০ খৃষ্টাব্দে?) গঙ্গাতীরে ফুলিয়াগ্রামে এসে বাস করেন। কৃত্তিবাসের বংশ মুখটি বংশ নামে খ্যাত। কবির আরও ছয় সহোদর এবং এক ভগিনী ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে কবি বিদ্যার্জ্জন করতে বিদেশে যান এবং বিদ্যা-লাভের পরে গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হন। রাজসভার বর্ণনা থেকে মনে হয় এই গৌড়েশ্বর নিশ্চয় কোন প্রবল প্রতাপান্বিত হিন্দু রাজা। তাঁর

কবিত্বগুণে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁকে সম্মানিত করেন এবং নির্লোভ কবিকে রামায়ণ রচনা করতে অনুরোধ করেন।

কবি স্বীয় জন্মের তারিখ উল্লেখ করেছেন—"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস," কিন্তু এতে সনের কোন উল্লেখ নেই। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রথমে "পূর্ণ মাঘ মাস" অর্থে মাঘ সংক্রান্তি স্থির করে তিথি ও বার যোগে জ্যোতিষিক গণনায় ২৯শে মাঘ রবিবার ১৩৫৪ শকাব্দ (২৫শে জানুয়ারী ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) পান। 'পূর্ণ' শব্দটি 'পুণ্য' কথার লিপিকার প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। সেজন্য তিনি আবার গণনা করে ১৩২০ শকাব্দ (১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) কিংবা ১৩৩৭ শকাব্দ (১৪১৫—১৬ খ্রীষ্টাব্দ) পেয়েছেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন কৃত্তিবাস ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

নানা দিক দিয়ে বিচার করে কৃত্তিবাসের জন্মকাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধরে নিলে আমরা এই সময় গৌড়ের সিংহাসনে রাজা দনুজমর্দ্দনদেব (গণেশ) কে অধিষ্ঠিত দেখতে পাই। কৃত্তিবাস কোন গৌড়েশ্বরের রাজসভায় সম্মানিত হয়েছিলেন প্রমাণের অভাবে তা নিঃসন্দেহে জোর করে বলা যায় না। তবে খুব সম্ভব এই গৌড়েশ্বর চণ্ডী-চরণ-পরায়ণ রাজা দনুজমর্দ্দনদেব। মুসলমান বিজয়ের পর একমাত্র এই হিন্দু রাজাই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষদিকে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। ইনি দণ্ডপাণি সুশাসক ছিলেন এবং সাহিত্য সংস্কৃতির পোষকতা করেছিলেন।

কৃত্তিবাসের যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া যায় সে সমস্তই রামায়ণ গায়কের পুঁথি। এগুলি নানা সময়ে বহু লিপিকারের দ্বারা লিখিত। নানা যুগের ও ধর্ম্মের প্রভাব এবং যুগোপযোগী সংস্কার সাধনা এতে লক্ষ্য করা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ হওয়ায় অনতিকাল মধ্যেই নানা হস্তের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্ত কাহিনী সংযোগ ও পাঠ বিকৃতি আরম্ভ হয়। অন্যান্য বহু রামায়ণ রচকদের লেখাও এর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন মহাশয় লিখেছেন,—"কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে তাঁহার নাম ছাড়া আর কিছু অংশ অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়না।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণে, নানা হস্তের প্রক্ষেপে, বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণবেরা রাম ও লক্ষ্মণকে কিছুটা গৌরাঙ্গ প্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর ছাঁচে ঢালার চেষ্টা করেছেন—বৈষ্ণবী কোমলতায় ও ভক্তের জন্য করুণার

অবতার রূপে। বীরবাহু ও তরণীসেনকে হাস্যকরভাবে ভক্ত বৈষ্ণবের সাজে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়েছেন। রাবণের মুখে বৈষ্ণবোচিত বিনয় বাক্য সংযোগ করেছেন। শাক্তেরাও ছাড়বার পাত্র নন। তাঁরা রাবণ বিজয়ের জন্য রামচন্দ্রকে দিয়ে শাক্তের দেবী চণ্ডীর পূজা করিয়েছেন। একটি লুপ্ত নীলোৎপলের পরিবর্ত্তে কমল-আঁখি নিবেদনের বিচিত্র কাহিনী রচনা করেছেন।

ভষ্মলোচন বা মহীরাবণের বৃত্তান্তে একাদশ দ্বাদশ শতকে ইউরোপে প্রচলিত গ্যালিক উপাখ্যানের Balor দেবতা এবং রাজা Ludd এর রাজ্যের একটি তস্করের চরিত্রের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে ব'লে দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মূল বাল্মীকি রামায়ণে "হ্যামলেটের সঙ্গে অঙ্গদের অবস্থাগত ঈষৎ মিল দেখা যায়, দুজনেরই পিতৃব্যের উপর আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল, দু ক্ষেত্রেই যিনি পিতৃব্য তিনিই বিপিতা, দুজনেরই আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়েছিল (২৪৬ পৃঃ)।" (শ্রীযুত রাজশেখর বসু মহাশয়ের "বাল্মীকি রামায়ণ"এর ভূমিকা)।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ ও মূল বাল্মীকি রামায়ণ বহির্গত বিদ্রূপাত্মক অঙ্গদ-রায়বার, বীরবাহু-তরণীসেন বধ, রামচন্দ্রের অকাল বোধনে চণ্ডীপূজা, রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি বিষয় আছে যেগুলি পুরাণাদি ও দেশ প্রচলিত উপাখ্যান থেকে নেওয়া হয়েছিল। জৈন রামায়ণের প্রভাবে সীতার বনবাস অংশে সীতাচরিত্রে হীন সন্দেহ প্রভৃতি অনেক গল্প আছে। এগুলি বাদ দিলেও যা থাকে তাও মূল রামায়ণের যথার্থ অনুবাদ হতে বহুদূরে অবস্থিত। বাল্মীকি রচনা করেছিলেন মুখ্যত মহাকাব্য, কিন্তু কৃত্তিবাস সেটিকে পরিণত করেছেন পুরাণ বা ভক্তিশাস্ত্রে।

"ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য সল্পায়তনে অথচ যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কৃত্তিবাসী মুকুরে বাল্মীকির রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় নাই; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন,—দেবোপম; মানুষী শক্তি ও বীর্য্যবত্তার আতিশয্যে তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম ভক্তের আরাধ্য অবতার, তুলসীচন্দনে লিপ্ত বিগ্রহ। তিনি কোমল করপল্লবের ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে পারেন, তিনি বংশীধারীর ভ্রাতা, প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষু; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরটি তূণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

বাল্মীকির বহু পূর্ব্বেই যেমন উত্তর ভারতে রাম সম্বন্ধে জনশ্রুতি ও রামগীতি বা রামায়ণ গাথা প্রচলিত ছিল এবং সেই কাহিনীর সঙ্গে সম্ভবত রাবণের কোন সংশ্রব ছিল না। দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড়ভাষীদের মধ্যে বহু রাবণ গাথাও প্রচলিত ছিল। বাল্মীকির আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই দুই গাথার সংমিশ্রণ ঘটে এবং বাল্মীকির প্রসাদে বিরাট্ সংস্কৃত রামায়ণের আকার ধারণ করে। বাল্মীকি যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত ছয়কাণ্ডে মিলনান্ত রামায়ণ লিখেছিলেন,- তিনি বিয়োগান্ত উত্তর কাণ্ড রচনা করেননি; এটি পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন। "সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে মূল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার সঙ্গে অনেক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন উত্তর কাণ্ড। প্রক্ষিপ্ত যতই থাকুক তাও বহুকাল পূর্বে মূলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং সমগ্র রচনাই এখন বাল্মীকির নামে চলে।" (শ্রীযুত রাজশেখর বসু মহাশয়ের "বাল্মীকি রামায়ণ"-এর ভূমিকা)। ঠিক অনেকটা তেমনি ভাবেই নানা কাহিনীতে পল্লবিত বিচিত্র গল্প ও জাতীয় আদর্শে চিত্রিত চরিত্রের সমবায়ে গড়ে উঠেছে বাঙালীর একান্ত নিজস্ব অত্যন্ত আদরের বস্তু এই অভিনব কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

"বাঙালীর নিজ ভাবস্বারা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে 'রামায়ণ' বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে। মিতব্যয়ী বণিক্ ক্ষুদ্র দীপাধারটি অকাতরে তৈল পূর্ণ করিয়া যে গীতি অর্দ্ধরাত্র জাগিয়া পাঠ করে, তাহা এখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল করে, সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তাহার অপরিস্ফুট মাধুর্য্য শুধু শৈশবের কথা নহে, কত যুগ যুগান্তের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

রামায়ণ ছাড়া কৃত্তিবাস শিবরামের যুদ্ধ, যোগাদ্যার বন্দনা, রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

**চন্দ্রাবতী—**

কৃত্তিবাসের পর অনেকেই রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সম্পূর্ণ কোন পুঁথি অথবা বিস্তৃত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁদের অনেকের রচনা কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিশাল সমুদ্রে মিশে গেছে।

কৃত্তিবাসের পর একজন বঙ্গ-দুহিতা গীতি কাব্যের আকারে রামায়ণ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই বিদুষী মহিলার নাম চন্দ্রাবতী। শ্রীযুত

চন্দ্রকুমার দে মহাশয় এ'কে আবিষ্কার করেন। চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহ জেলার পাটওয়ারী গ্রামের অধিবাসী মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বংশীদাসের সুযোগ্যা কন্যা। বংশীদাস চন্দ্রাবতী ও তাঁর প্রণয়ী জয়চন্দ্রের সাহায্যে মনসার ভাসান গান রচনা করেছিলেন। ময়মনসিংহ গীতিকায় চন্দ্রাবতী-জয়চন্দ্রের বিয়োগান্ত জীবনের করুণ-মধুর কাহিনী প্রচলিত আছে। স্বরচিত রামায়ণের মুখবন্ধে চন্দ্রাবতী এই ভাবে বংশ ও গৃহ পরিচয় দিয়েছেন,—

"ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনি॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥

*　　　*　　　*

দ্বিজ বংশী পুত্র হৈল মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উছিলার পানি॥
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে॥
বাড়াতে দারিদ্র্যের জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম লৈল চন্দ্রা অভাগিনী॥
সদাই মনসাপদ পূজে ভক্তিভরে।
চাল কড়ি পান কিছু মনসার বরে॥

*　　　*　　　*

সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজ বংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥
মনসাদেবীরে বন্দি করি করযোড়।
যাহার প্রসাদে হল সর্ব্ব দুঃখ দূর॥

শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূরে যায় নিরবধি॥

*     *     *

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়॥"

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ-গীতি পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলে মহিলা সমাজে বিশেষ প্রচলিত। বিবাহ ও ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে এটি গীত হয়। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ তিন অংশে বিভক্ত কিন্তু অসম্পূর্ণ। তিনি তরুণ বয়সে শোকে দুঃখে অকালে ইহলোক ত্যাগ করায় পুস্তকখানি শেষ করতে পারেননি। এই রামায়ণে একটি নূতন চরিত্র আছে,—কৈকেয়ীকন্যা 'বিষলতার বিষফল বিষ-গাছের গোটা' কুকুয়ার। অবশ্য গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে কাশ্মীরি রামায়ণে নাকি এই চরিত্রটি আছে। জৈন-রামায়ণে সীতার সতিনীর চরিত্রের সঙ্গে এই কুকুয়া ননদিনীর চরিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়।

চন্দ্রাবতী রামায়ণ ছাড়া 'মলুয়া' ও 'কেনারাম' নামে দু'খানি ক্ষুদ্র গাথা কাব্যও রচনা করেছিলেন। মলুয়া কাব্যগীতিতে নারীর উপর সামাজিক শাসন ও নির্য্যাতনের কাহিনী সকরুণ ভাষায় বর্ণিত হ'য়েছে। দস্যু কেনারামের কাহিনীটি আবেগ প্রধান ও মর্ম্মস্পর্শী। চন্দ্রাবতীর সকল রচনাই অপূর্ব্ব কবিত্ব, সহজ সরল ভাষা, করুণ ও ভক্তিরসের সুধাসিক্ত।

চন্দ্রাবতীর নিজের জীবনও একখানি করুণ রসাত্মক বিয়োগান্ত কাব্য। নয়ানচাঁদ ঘোষ নামে পূর্ব্ববঙ্গের একজন গ্রাম্যকবি পুষ্পের ন্যায় শুচি ও কোমল চন্দ্রাবতীর অপূর্ব্ব জীবন আলেখ্য অবলম্বন করে গান রচনা করেছেন।

## অপরাপর রামায়ণ রচকগণ

১। অনন্ত-রামায়ণ। অনন্ত আসাম নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং স্বদেশে 'অনন্ত-কন্দলী' নামে পরিচিত। তাঁর অপর নাম রাম-সরস্বতী। কবি আসামবাসী হ'লেও বঙ্গ ভাষাভাষী। সে যুগে আসামী ভাষা বাঙলা ভাষারই প্রাদেশিক স্তর ভেদ মাত্র ছিল। অনন্ত-রামায়ণ সংক্ষিপ্ত আকারে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ।

২। দ্বিজ হরিচরণের (মধুকণ্ঠ) রামায়ণ। কবি বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

৩. ৪। ষষ্ঠীবর সেন (গুণরাজ) এবং তাঁর পুত্র গঙ্গাদাস এঁরা উভয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ মহাভারত ও পদ্মাপুরাণ রচনাকার্য্যে ব্রতী হ'য়েছিলেন।

৫। ভবানীদাসের লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়। ইনি জয়চন্দ্র নামে কোন রাজার আদেশে, প্রায় পাঁচ হাজার শ্লোকে, রামায়ণ অবলম্বনে এই কাব্যখানি রচনা করেন।

৬। দ্বিজ দুর্গারামের রামায়ণ।

৭। রঘুনন্দন গোস্বামি-রচিত রামরসায়ন। ইনি নিত্যানন্দবংশীয়।

৮। জগৎরাম রায় প্রণীত রামায়ণ। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ সিংহ ভূপের অনুমতিক্রমে রামায়ণ অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থ ১৭১২ শকাব্দে বা ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

৯। শিবচন্দ্র সেনের সারদামঙ্গল। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দুর্গাপূজা অবলম্বনে রচিত কাব্য। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল যশোরের সেনহাটি গ্রামে, পরে এঁরা বিক্রমপুরের কাঁটাদিয়া গ্রামে বসবাস করেন।

১০। নিত্যানন্দ (অদ্ভুত আচার্য্য) বিরচিত রামায়ণ। ইনি সম্পূর্ণ রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কবি লেখাপড়া না জেনেও স্বপ্নাদেশে এবং দৈব শক্তিবলে রামায়ণ রচনা করেছিলেন বলে অদ্ভুত আচার্য্য নামে খ্যাত হ'য়েছিলেন। অদ্ভুত আচার্য্য সীতাকে কালীর অবতাররূপে কল্পনা করেছেন।

১১। রামানন্দ ঘোষ (বুদ্ধদেব) ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ রচনা করেন। কবি নিজেকে বুদ্ধের অবতার মনে করতেন।

১২। 'দ্বিজ' সীতাসুত রচিত রামায়ণ। কবি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে মল্লরাজ গোপালসিংহ দেবের অনুমতিক্রমে কাব্য রচনা করেছিলেন।

১৩। লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণ। এটি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত।

১৪। রামমোহন রচিত রামায়ণ। কবির নিবাস নদীয়া জেলার মেটেরী গ্রামে। কাব্যটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত।

১৫। কবিচন্দ্রের (শঙ্কর চক্রবর্ত্তী) রামায়ণ। এই রামায়ণটি 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে খ্যাত। কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল। কবি ছিলেন বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের অধিবাসী এবং মল্লরাজদের আশ্রিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবিচন্দ্রের রামায়ণের অনেক রচনা মিশে গেছে। ডক্টর ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখেছেন,—"প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটি খুবসম্ভব কৃত্তিবাস লেখেন নাই; অন্ততঃ কৃত্তিবাসের বর্ণনার সহিত কবিচন্দ্রের রচনা তাহাতে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা অতি প্রাচীন পুঁথিতে 'অঙ্গদের রায়বার' শীর্ষক কবিতাটিতে কবিচন্দ্রের ভণিতা পাইয়াছি; তরণীসেনের যুদ্ধের পালাটিও কবিচন্দ্রের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে।" ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ও লিখেছেন,—"কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি বিশিষ্ট অংশ (যেমন অঙ্গদ রায়বার ও তরণীসেন বধ ইত্যাদি) কবিচন্দ্রেরই রচনা।"

# মহাভারত

## (পাণ্ডব-বিজয় বা ভারত-পাঁচালী)

**কবীন্দ্র (পরমেশ্বর)-শ্রীকর নন্দী—**

মহাভারত অনুবাদকারিগণের মধ্যে কবীন্দ্র প্রাচীনতম কবি। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের একজন সেনাপতি চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তা লস্কর পরাগল খান সংক্ষেপে মহাভারত কাহিনী শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ইনি তাঁর আদেশে মহাভারতের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ কাব্যের নাম বিজয়-পাণ্ডব (পাণ্ডব-বিজয়) অথবা ভারত-পাঁচালী। যেমন,

"বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥"

অন্যত্র, "ভারতের পুণ্যকথা অমৃতলহরী।
কবীন্দ্রে রচিল গাথা ভারত-পাঁচালী॥"

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বলতে গিয়ে সম্রাট হুসেন শাহ ও লস্কর পরাগল খান সম্বন্ধে কবীন্দ্র লিখেছেন,—

"কলিযুগ অবতার গুণের আধার।
পৃথিবী ভরিয়া যার যশের বিস্তার॥
সুলতান আলাপদীন প্রভু গৌড়েশ্বর।
এ তিন ভুবনে যার যশের প্রসার॥
রাঙ্গা টোপর দিল সুবর্ণের তোড়া।
শয়ানে পালঙ্ক দিল একশত ঘোড়া॥
শ্রীযুত লস্কর খাজা অতি সে সুমতি।
এ তিন ভুবনে তেঁহ অনাথের গতি॥
লস্কর পরাগল শুনন্ত কাহিনী।
যেন-মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥

বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কেন-মতে ধর্ম্ম রইল বনের ভিতর॥
বৎসরেক আছিলন্ত অজ্ঞাত—বসতি॥
কেন-মতে তারা সবে পাইল বসুমতী॥
এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া॥
তাঁহার আদেশমাল্য মস্তকে করিয়া।
কবীন্দ্র পরমযত্নে পাঁচালী রচিয়া॥"

সুলতান হুসেন শাহ (রাজ্যকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খৃষ্টাব্দ)* এর রাজত্বের শেষ দিকে এই অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ হয়। অতএব এই কাব্য রচনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদেই হ'য়েছিল অনুমান করা যেতে পারে। কবি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন বলেই মনে হয়।

কবীন্দ্রের বিশেষ কোন পরিচয় জানা যায় না। কবীন্দ্রের পাণ্ডব বিজয়ের পুঁথি চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কোচবিহার, রঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেছে। কোন কোন পুঁথিতে "কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার" এই রকম ভণিতা দেখা যায়। এথেকে অনেকে মনে করেন যে, কবির নাম ছিল পরমেশ্বর এবং তাঁর উপাধি ছিল কবীন্দ্র। পরমেশ্বর কবীন্দ্রের রচনার কোন লিপিকার অথবা গায়কের নাম হওয়াও বিচিত্র নয়।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" উল্লেখ করেছেন যে, কবীন্দ্র-পরমেশ্বর হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের আদেশে বাঙ্গলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন এবং পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীকরণ নন্দী অশ্বমেধ পর্ব্ব অনুবাদ করেছিলেন।

শ্রীকরণ নামটি ভুল। প্রকৃত নাম হবে শ্রীকর নন্দী।

ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে" মনে করেন যে, পরাগলের আদেশে কবীন্দ্র 'জৈমিনি-ভারত' অবলম্বনে সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেছিলেন এবং পরাগলের পুত্র ছুটিখানের আদেশে শ্রীকর নন্দীও 'সঞ্জয় (বা বৈশম্পায়ন) ভারত' অবলম্বনে সম্ভবত পুরা মহাভারত রচনা করেছিলেন।

শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং আরও অনেকে মনে করেন, 'পরাগলী মহাভারত' পাণ্ডব-বিজয়ের কবির প্রকৃত নাম শ্রীকর নন্দী এবং তাঁর উপাধি কবীন্দ্র অথবা কবীন্দ্র-পরমেশ্বর; এঁরা

অভিন্ন ব্যক্তি। কবীন্দ্রের পুঁথিতেই শ্রীকর নন্দী ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়। (যদিও কোথাও কবীন্দ্র শ্রীকর নন্দী এরূপ যুক্ত ভণিতা দেখা যায় না।) কবীন্দ্র-পরমেশ্বর উপাধিক শ্রীকর নন্দী নাকি পরাগল খানের আদেশে প্রথমে মহাভারতের সপ্তদশপর্ব্ব রচনা সম্পূর্ণ করে পরে অশ্বমেধপর্ব্ব রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং এটি শেষ হবার আগেই পরাগল খানের মৃত্যু হয়; গ্রন্থ-রচনা কিছুকাল বন্ধ থাকে। এর পর পরাগল খানের সুযোগ্য পুত্র লস্কর ছুটি খানের অনুমতিক্রমে কবি অশ্বমেধপর্ব্ব সমাপ্ত করেন। এই সময় গৌড়াধিপ ছিলেন হুসেন শাহের পুত্র নসীরু-দ্-দীন নুসরৎ শাহ--(রাজ্যকাল ১৫১৯-৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। অশ্বমেধ পর্ব্বের ভূমিকায় কবি নুসরৎ শাহ ও ছুটি খানের যশোগান করেছেন।

"নসরৎ শাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা॥
নৃপতি হুসেন শাহা তনয় সুমতি।
সাম দণ্ড ভেদে পালে সর্ব্ব বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি নামে ছুটি খান।
ত্রিপুরা গড়েতে গিয়া হৈল সন্নিধান॥

* * *

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয়॥
আজানুলম্বিতবাহু কমললোচন।
বিশালহৃদয় মত্তগজেন্দ্রগমন॥
চতুঃষষ্ঠি কলায় বসতি গুণনিধি।
পৃথিবীর কল্পতরু সৃজিলেক বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য বীর্য্যের নাহি সীমা॥
কপটের লেশ নাহি প্রসন্ন হৃদয়।
রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয়॥

* * *

দেশ-ভাষে এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগৎ-সংসার॥
তাহান আদেশমাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥"

নিঃসংশয়ে জোর করে বলার মত উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দী দুজন কবি অথবা একই ব্যক্তি ছিলেন বলা কঠিন।

**কাশীরাম—**

"মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥"—মধুসূদন দত্ত

বাঙলা দেশে জনপ্রিয় কবি হিসাবে কৃত্তিবাসের পরেই কাশীরামের নাম করতে হয়। মহাভারত কাব্যের অনুবাদকারিগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম। কাব্য মধ্যে কবি এইভাবে বংশ-পরিচয় দিয়েছেন,—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়ংকর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস—পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥"

অতএব জানা যায় কবির বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন ইন্দ্রাণী পরগনাভুক্ত সিঙ্গিগ্রাম। কাশীরাম দাসের প্রপিতামহের নাম প্রিয়ংকর পিতামহের নাম সুধাকর এবং পিতার নাম কমলাকান্ত। কবির অগ্রজের নাম শ্রীকৃষ্ণ দাস, অনুজের নাম গদাধর। এই দুই ভ্রাতাও কবি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস (শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর) এবং গদাধর যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস ও জগন্নাথ-মঙ্গল কাব্য দুটি রচনা করেছিলেন।

আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে কায়স্থকুলে কাশীরামের জন্ম হয়। তাঁর কুলধর্ম্ম ছিল বৈষ্ণব এবং তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী। গ্রন্থ মধ্যে তিনি সকল দেবদেবীকেই ভক্তিভাবে বন্দনা করেছেন।

কাশীরাম খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমেই মহাভারত রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

"চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥" (পরিষৎ পত্রিকা)

অর্থাৎ ১৫২৬ শকাব্দে (১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে) বিরাট-পর্ব্ব রচনা শেষ হয়।

তিনি খুব সম্ভব সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেছিলেন। বাঙগলাদেশে প্রচলিত একটি কথা আছে,—

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥"

তাছাড়া, বনপর্ব্বের শেষে লেখা আছে,—

"ধন্য হইল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥"

এগুলির উপর নির্ভর করে কেহ কেহ মনে করেন, মহাভারতের প্রথম তিন পর্ব্ব শেষ করার পর যখন তিনি চতুর্থ (বিরাট) পর্ব্ব রচনা করছিলেন সেই সময় তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস ও ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামদাস বাকী অংশ রচনা করেন। এই কথা কতদূর সত্য বলা কঠিন। আবার এই জনশ্রুতির অন্যরূপ অর্থও হতে পারে। স্বর্গপুর অর্থে 'কাশীধাম' অথবা 'নীলাচল' তীর্থকেও বোঝাতে পারে। হয়ত বিরাট-পর্ব্ব রচনার সময় কবি তীর্থযাত্রা করেছিলেন। কবির পিতা শেষ জীবনে জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে সেদেশেই বাস করেন। কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় কাব্য সেখানেই রচনা করেন। কাশীরামদাসও সম্ভবত মহাভারতের শেষাংশ নীলাচলেই অনুবাদ করেছিলেন। ভারত-পাঁচালীতে বিরাট-পর্ব্বের পর থেকেই মাঝে মাঝে জগন্নাথ দেবের বন্দনা দেখা যায়। যেমন,—

"কাশীরামদাসের প্রভু নীলশৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়॥"
"দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
তাঁহার চরণ চিন্তি কহে কাশীদাস॥" ইত্যাদি।

কাশীরাম দাসের গ্রন্থ অত্যধিক জনপ্রিয় হওয়ার জন্য অনিবার্য্যভাবে তাঁর কাব্যেও নানা কবির রচনা কিছু কিছু আত্মগোপন করে আছে। মহাভারত ছাড়া কাশীরাম স্বপ্নপর্ব্ব, জলপর্ব্ব ও নলোপাখ্যান এই তিন খানি কাব্য রচনা করেছিলেন।

## অপরাপর মহাভারত রচকগণ

১। হরিনারায়ণ দেব (সঞ্জয়)।

২। রামচন্দ্রখানের অশ্বমেধ-পর্ব্ব। এটি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত।

৩। 'দ্বিজ' রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়েছিল। কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বের সঙ্গে এই রচনার খুব বেশী রকম সাদৃশ্য আছে।

৪। বিশারদ রচিত বন ও বিরাট পর্ব্ব। এটি সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।

৫। নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত।

৬। দ্বিজ হরিদাসের অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

৭। কৃষ্ণানন্দ রচিত শান্তি-পর্ব্ব।

৮। রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত। এটি সম্ভবত কাশীরাম দাসের পরে রচিত।

৯। ভৃগুরাম দাসের ভারত পাঁচালী।

১০। অনন্ত মিশ্র রচিত অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

১১। গোপীনাথ দত্তের দ্রোণ-পর্ব্ব।

১২। ষষ্ঠীবর সেন—গঙ্গাদাস সেন রচিত মহাভারত। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত।

১৩। রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্ব্ব।

১৪। ঘনশ্যামদাস রচিত ভারত-পাঁচালী।

১৫। কোচবিহারের শ্রীনাথ "ব্রাহ্মণ" রচিত ভারত-পাঁচালী। এই গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত হয়েছিল।

১৬। কবিচন্দ্র (শঙ্করচক্রবর্ত্তী) বিরচিত মহাভারত-পাঁচালী। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত।

১৭। লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ভারত-পাঁচালী। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়েছিল।

১৮। নন্দরাম দাস রচিত দ্রোণ-পর্ব্ব। দেড় হাজার শ্লোকে এই কাব্য রচনা হয়েছে। কবি কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। কাশীরামের দ্রোণ-পর্ব্বের সঙ্গে এই রচনার যথেষ্ট মিল আছে।

## ভাগবত

**মালাধর বসু—**

ভাগবত অনুবাদকারিগণের মধ্যে মালাধর বসুই প্রথম। কৃত্তিবাসের পরই তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাগবত পুরাণ পণ্ডিতের মুখে শ্রবণ করে দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাংগলা অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়। এটি অনুবাদ পদবাচ্য হলেও গ্রন্থকার অনেক জায়গাতেই স্বাধীনভাবে মৌলিক রচনা করেছেন। এই পুস্তকের কোন কোন পুঁথিতে দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি অপৌরাণিক লীলা, রাস বর্ণনায় রাধাতত্ত্বের কথা, উদ্ধবসংবাদে কালভেদে গুরুনির্ণয়, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি মূল বহির্ভূত অনেক প্রসংগ দেখা যায়। এগুলি কি প্রক্ষিপ্ত রচনা? তিনি কৃষ্ণভক্ত, উদার স্বভাব ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লিখেছেন,—

"ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিক কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে॥
ভাগবত-অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণ ভাগবত গীত-ছন্দে গাহি॥
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর।
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর॥
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥
সাদরে শুনিহ নর—না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই হৈল ভেলা॥"

বাংগলা দেশের কুলশাস্ত্র বা কুলজীগ্রন্থমালায় আদিশূরের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইতিহাসে অবশ্য আদিশূরের নাম পাওয়া যায় না। সেন রাজ-

বংশের সমসাময়িক কালে—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে—দক্ষিণ রাঢ়ে এক শূর বংশের রাজত্ব ছিল। রণশূর নামে এই বংশের একজন রাজার কথা জানা যায় মাত্র। কিন্তু কুলজীগ্রন্থে দেখা যায়, এই রাজবংশের আদিশূর নাকি বহির্বাঙগলা থেকে (কোলাঞ্চ-কনৌজ, অন্যমতে কাশী) পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ এনেছিলেন। দশরথ বসু এই পাঁচজন কায়স্থের অন্যতম। এই দশরথ বসুর ত্রয়োদশ পুরুষে বর্দ্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে কবি মালাধর বসুর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম ইন্দুমতী।

"বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি॥"

কবির জন্মের সময় জানা যায় না। তবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কাব্যটির রচনাকাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে,—

"তের শ' প'চানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥"

অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪৭৩ শতকে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৪৮১ শতকে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,—

"কায়স্থ-কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্ব্বজন॥

* * *

স্ত্রী পুরুষ শিশু সব শুন একমনে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজ খান ভণে॥"

স্বপ্নাদেশে গ্রন্থ রচনার কথা মধ্যযুগের অধিকাংশ কবিই বলেছেন।

গৌড়েশ্বর তাঁর কবিত্বশক্তিতে প্রীত হ'য়ে তাঁকে "গুণরাজ খান" উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি সবিনয়ে লিখেছেন,—

"গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥"

কবির পুত্র লক্ষ্মীকান্ত বসুরও উপাধি ছিল 'সত্যরাজ খান'। কে এই গৌড়েশ্বর সঠিক জানা যায় না। তবে 'খান্' যুক্ত উপাধি বিতরণ করার জন্য তাঁকে গৌড়ের কোন মুসলমান সুলতান বলেই মনে হয়। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ও ডক্টর মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেন, সাম্সুদ্দীন ইউসুফ সাহ এই উপাধি দিয়েছিলেন। ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন মনে করেন, "...সুলতান রুক্নুদ্-দীন বারবক শাহ কবিকে ঐ উপাধি দিয়াছিলেন।" কিন্তু কবি ও কবির পুত্রকে কোন সুলতান উপাধি দিয়েছিলেন এই নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্কের অবসান হয় নি।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় বৈষ্ণবদের বড় আদরের গ্রন্থ। স্বয়ং মহাপ্রভু এটি পাঠ করে অপার আনন্দ লাভ করেছিলেন। তিনি পর্য্যটনের সময় কুলীনগ্রাম-বাসীগণের কাছে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের চতুর্থ চরণটি উদ্ধৃত করে কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন,—

"কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া॥
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

**অপরাপর ভাগবত রচকগণ**

১। রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী কাব্য। এটি শ্রীমদ্ভাগবতের সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদ। এই কাব্যের প্রথম নয়টি স্কন্ধ সংক্ষেপে ভাগবতের সারানুবাদ এবং শেষ তিনটি স্কন্ধ প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। এই গ্রন্থটি আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে গান করার উপযোগী করে রচিত হয়েছিল। কবির নিবাস ছিল বরাহনগরে। শ্রীচৈতন্য

গৌড় থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রঘুনাথ পণ্ডিতের আলয়ে রাত্রি যাপন করেছিলেন। রঘুনাথের ভাগবতে অনন্যসাধারণ দক্ষতা দেখে তিনি তাঁকে ভাগবতাচার্য্য উপাধি দেন। গ্রন্থ মধ্যে কবি অনেকস্থলে তাঁর গুরু গদাধর পণ্ডিতের বন্দনা করেছেন।

২। দ্বিজ মাধব আচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। ভাগবতাচার্য্যের গ্রন্থের সমসাময়িক কালেই এটি রচিত হয়েছিল। ভাগবতের শেষ তিন স্কন্ধের আধারে এবং অন্যান্য পুরাণের ছায়াপাতে শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণনাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইনি মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন এবং গ্রন্থমধ্যে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে ভক্তি নিবেদন করেছেন।

৩। কৃষ্ণদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। এটি একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কবির পিতার নাম যাদবানন্দ এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। কবির গুরুর নাম মাধব আচার্য্য (?), কৃষ্ণদাস তাঁর গুরুপ্রদত্ত নাম। ইনি সম্ভবত নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্যশাখাভুক্ত ছিলেন। কাব্য মধ্যে রূপ ও রঘুনাথ গোস্বামীর বন্দনা দেখে মনে হয় এই কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থকার মূলত ভাগবত অবলম্বন করলেও মহাভারতের ও হরিবংশের কাহিনী এবং পুরাণ বহির্ভূত অনেক কাহিনী এই কাব্যটিতে সংযোগ করেছেন।

৪। কবিশেখর (দৈবকীনন্দন) রচিত গোপালবিজয়। ভাগবত বর্ণিত ব্রজলীলার কাহিনীর সঙ্গে দানলীলা, নৌকাবিলাস প্রভৃতি দেশ-প্রচলিত উপাখ্যানগুলিও এই কাব্যে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের খণ্ডিত যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গেছে তা থেকে এবং কাব্যের নাম থেকে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে অক্রূরের সঙ্গে মথুরা যাত্রা পর্য্যন্ত বর্ণিত হয়েছিল। অবশ্য সম্পূর্ণ পুঁথি না পাওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উপাখ্যানের সঙ্গে গোপালবিজয়ের বেশ সাদৃশ্য আছে। গ্রন্থমধ্যে কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন,—

"সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্ব্বজন॥
বাপ চতুর্ভুজ মা হরাবতী।
কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীলজাতি॥"

এই কাব্যটি রচনার পূর্ব্বে কবি গোপালচরিত মহাকাব্য (সংস্কৃত ? ), গোপালের কীর্ত্তনামৃত (পদাবলী ?) এবং গোপীনাথবিজয় নাটক (সংস্কৃত ?) রচনা

করেছিলেন বলে কাব্যমধ্যে উল্লেখ করেছেন। কাব্যের রচনাকাল জানা যায় না। শ্রদ্ধেয় সুকুমার বাবু মনে করেন, বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা রায়শেখর (কবিশেখর রায়) এবং গোপালবিজয়ের কবি অভিন্ন ব্যক্তি।

৫। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের (শ্রীকৃষ্ণদাস) শ্রীকৃষ্ণবিলাস ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণের লীলা বর্ণনাময় গ্রন্থ। এতে পুরাণ বহির্ভূত কোন লীলা নেই। কবি মহাভারতের অনুবাদকারী কাশীরামদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

৬। পরমানন্দ বিরচিত ভাগবত। কাব্যটি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।

৭। "দুঃখী" শ্যামদাস বচিত গোবিন্দমঙ্গল। কবির পিতার নাম শ্রীমুখ, মাতার নাম ভবানী। জাতিতে কায়স্থ। কবি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্ত্তমান ছিলেন। ভাগবতের কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী সংযোগ করে এই কাব্য রচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে এই কাব্যেরও অপৌরাণিক কাহিনী অংশের মিল আছে।

৮। ভবানন্দের হরিবংশ। নাম যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে এটি শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলকাব্যের সমগোত্রীয় এবং ভাগবতের অনুবাদ পর্য্যায়ভুক্ত। কবি সম্ভবত উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসী এবং সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

৯। অভিরামদাসের গোবিন্দবিজয়। এই কাব্য অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে রচিত হয়েছিল।

১০। 'বিপ্র' পরশুরাম (চক্রবর্ত্তী?) রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। ভাগবত কাহিনীর সঙ্গে এই কাব্যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড বর্ণিত হয়েছে।

১১। 'দ্বিজ' বংশীদাসের ভাগবত। কেহ কেহ মনে করেন ইনি মনসা-মঙ্গলের কবি বংশীদাস।

১২। বলরামদাসের কৃষ্ণলীলামৃত। এই কাব্যটি শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭০২ খৃীষ্টাব্দ।

১৩। দ্বিজ রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মূলত ভাগবত অবলম্বন করে রচিত কৃষ্ণায়ণ কাব্য। এতে দানখণ্ড এবং নৌকাবিলাসও বর্ণিত হয়েছে।

১৪। কবিচন্দ্র উপাধিক শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ভাগবতামৃত অথবা গোবিন্দ-মঙ্গল একখানি প্রসিদ্ধ কাব্য। কবি বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর নিবাসী ছিলেন। পুস্তকটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই

রচিত হয়েছিল। কাব্যে মদনমোহনের উল্লেখ এই মতই সমর্থন করে। বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের মন্দির ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মল্লরাজ তৃতীয় দুর্জ্জন-সিংহদেবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কবিচন্দ্র গোবিন্দমঙ্গল ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য পাঁচালীর আকারে রচনা করেছিলেন। কবিচন্দ্রের রামায়ণ "বিষ্ণুপুরী-রামায়ণ" নামে পরিচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এঁর অনেক রচনা মিশে গেছে।

১৫। দ্বিজ মাধবেন্দ্র রচিত ভাগবতসার অথবা ভাগবতামৃত। কবি বীরভূম জেলার পাড়ুই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

উপরোক্ত কাব্যগুলি ছাড়া আরো ছোটখাট খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে। এ সমস্তগুলিই ভাগবত অবলম্বন করে রচিত।

## অপরাপর অনুবাদ গ্রন্থাদি

**বৈষ্ণব দর্শন, অলঙ্কার ও কাব্য**

শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর শিষ্য মালিহাটি নিবাসী বৈদ্যবংশীয় যদুনন্দন দাস একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা ছিলেন। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ইনি চারখানি অনুবাদ কাব্য রচনা করেন। (১) শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটক অবলম্বন করে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব, (২) শ্রীরূপগোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী নাটক অবলম্বনে দানলীলাচন্দ্রামৃত, (৩)শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সাবঙ্গরঙ্গদা টীকা অবলম্বনে কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং (৪) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতের ভাবানুবাদ রচনা করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর কোন সময়ে কবি কর্ণপুর (পরমানন্দ সেন) বিরচিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকা নামে সংস্কৃত গ্রন্থের কয়েকটি বাঙলা অনুবাদ হয়েছিল। 'দ্বিজ' শ্রীরূপচরণ, দেবনাথ দাস ও হৃদয়ানন্দ দাস এই ক'জনের রচনা পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভ্রমর-গীতা নামে দশটি শ্লোক আছে। রূপগোস্বামী বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের বেদ স্বরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে এই শ্লোক-গুলির ব্যাখ্যা করেছেন। এই উভয় গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে হেমলতাদেবীর অপর এক শিষ্য যদুনাথ দাস কর্ত্তৃক পাঁচ অধ্যায়ে রচিত ভ্রমর-গীতা একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য।

রূপগোস্বামীর নিকুঞ্জরহস্যস্তবের অনুবাদ ব্রজবুলী ভাষা ছন্দে করেছেন বংশীদাস নামে জনৈক কবি।

কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে রচিত রূপগোস্বামীর হংসদূত এবং উদ্ধবসন্দেশ নামে দূত-কাব্য দুটির অনেকগুলি অনুবাদ হয়েছিল। দ্বিজ নরসিংহ ও দ্বিজ মাধব গুণাকর যথাক্রমে উদ্ধবসংবাদ এবং উদ্ধবদূত কাব্য রচনা করেছিলেন। নরসিংহদাস নামে একজন কবির হংসদূতের অনুবাদ পাওয়া যায়।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিলাপকুসুমাঞ্জলির অনুবাদ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রাধাবল্লভ দাস, আর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দাস। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুক্তাচরিত্র অবলম্বন করে নারায়ণ দাস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রায় দুই হাজার শ্লোকে কাব্য রচনা করেছিলেন।

## লৌকিক কাহিনীমূলক গ্রন্থাদি

পাঠান রাজত্বের অবসানের পর গৌড় দরবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাঙলার সীমান্তে ও সামন্ত রাজসভাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। চট্টগ্রামে তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি মহাভারত অনুবাদের মধ্যে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙের (অর্থাৎ আরাকানের) রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদ পর্য্যায়ভুক্ত কাব্য রচনা হ'তে থাকে। এই কাব্যের প্রায় সবগুলিই হল মর্ত্ত্যবাসী মানবের কাহিনী এবং দেবদেবীর সংস্পর্শহীন। এরকম নূতন ধারা বাঙলা সাহিত্যে এর আগে দেখা যায় নি। এই রোম্যাণ্টিক ধারার কবিরা সকলেই মুসলমান। এই নূতন ধারার প্রবর্ত্তক হলেন বিখ্যাত কবি দৌলতকাজী। বাঙলা সাহিত্যে তিনিই সম্ভবত প্রাচীনতম মুসলমান কবি এবং বাঙলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম। রোসাঙের রাজা শ্রীসুধর্ম্মার মন্ত্রী আশরফ খানের আদেশে তিনি ভোজপুরী কাব্য অনুসরণ করে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সতী ময়নাবতী (লোর-চন্দ্রানী) নামে তিন খণ্ডে বিভক্ত এক কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হবার আগেই দৌলতকাজীর মৃত্যু হয়। রোসাঙরাজ থিরি সান্দ থুধম্মার (শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা) মন্ত্রী সুলেমানের আদেশে কবি সৈয়দ আলাওল ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যের শেষাংশ রচনা করেছিলেন।

আলাওলের জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার জালালপুর গ্রাম। নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর ইনি আরাকান রাজের অশ্বারোহী সৈনিকের পদ লাভ করেন। রোসাঙরাজ সাদ উমংদার অথবা থদো মিন্তার (১৬৪৫-৫২ খ্রীষ্টাব্দ) এর মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল মালেক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দিভাষায় রচিত পদুমাবৎ কাব্যটির ভাবানুবাদের সঙ্গে অন্যান্য কাহিনী যোগ করে পদ্মাবতী পাঁচালী রচনা করেন। দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীন ও চিতোরের রাণী পদ্মাবতীর কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। এই কাব্য রচনায় আলাওল গভীর পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে

*আলাওল আরব্য উপন্যাসের একটি কাহিনীর মর্ম্মানুবাদ—সয়ফুল মুলুক বাদউজ্জমাল কাব্য রচনা সুরু করেন। কিন্তু ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মাগন ঠাকুর* দেহত্যাগ করায় কাব্য রচনা স্থগিত থাকে। এই সময় দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা শুজা আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে কবির সখ্যতা হয়। রোসাঙ্গরাজের কোপে শুজা নিহত হন এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য কবিও অবিচারে কারারুদ্ধ হন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মসুদ শাহার অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন এবং খুব সম্ভব তাঁরই অনুরোধে অনেককাল পরে উপরোক্ত কাব্যটি সমাপ্ত করেন। তারপর কবি রোসাঙ্গের প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে ফারসী ভাষায় নিজামী রচিত হপ্তপৈকর কাব্যের বাঙলা অনুবাদ করেন। এই কাব্যটি সাতটি গল্পের সমষ্টি। আলাওল ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রী সুলেমানের আদেশে ইউসুফ কর্ত্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত তোহ্ফা নামে ধর্ম্মকাব্যের অনুবাদ করেন। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে আলাওল রাজা থিরি সান্দ থুধম্মার আজ্ঞাক্রমে নিজামী রচিত ফারসী কাব্য ইসকন্দর নামার অনুবাদ করেন। এতে ম্যাসিডনাধিপতি আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় বর্ণিত হয়েছে।

আরাকান রাজসভার এই রোম্যাণ্টিক লৌকিক কাহিনী-কাব্য রচনার অভিনব ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে ভারতচন্দ্রের প্রভাবযুক্ত হ'য়ে প্রায় এক শ' বছর ধরে সমস্ত বাঙলা দেশে প্রচলিত হয়। এই লোকপ্রিয় কাব্যগুলির প্রায় সবকটিই শৃঙ্গাররসাত্মক।

**খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি**

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে পর্ত্তুগীস্রা বাঙলা দেশে আসে। ক্রমে বাণিজ্য গৌণ হয়ে পড়ে, মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় জলদস্যুতা করা। তাদের অত্যাচারে বাঙলার সমুদ্র উপকূলশায়ী ও নদনদী প্লাবিত স্থানগুলি পর্য্যুদস্ত ছিল। পর্ত্তুগীস্ দস্যুদের উৎপাতের আভাস কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও দিয়েছেন,—

"ফিরাঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বহে যায় হারমাদের ডরে॥"

*বাঙগলার স্বাধীন ভূঁইয়া রাজা যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য এবং শ্রীপুরাধিপতি কেদার রায় পর্ত্তুগীস্ নৌসৈন্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সময় থেকে পর্ত্তুগীস্ ধর্ম্মযাজকেরা বাঙগলাদেশে এসে* খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। এদেশে ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধার জন্য তাঁরা বাঙগলা ভাষা শিখে বাঙগলায় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা ও অনুবাদ সুরু করেন। তাঁরা বাঙগলা শব্দকোষ ও ব্যাকরণ প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত চলে। বাঙগলা সাহিত্যে প্রকৃত গদ্য এঁদের চেষ্টাতেই জন্ম নেয়। ভূষণার এক রাজার পুত্রকে মগ দস্যুদের কাছ থেকে কোন পর্ত্তুগীস্ পাদ্রী অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে তাঁকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁর নাম দেন দোম আন্তনিও (Dom Antonio), ইনি খৃষ্ট ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিষয়ে একটি বই লেখেন। বাঙগলা ভাষায় এটিই প্রাচীনতম গদ্য পুস্তক। পর্ত্তুগীস্ ধর্ম্মযাজক মানোএল-দা-আস্সুম্পসাম্ (Manoel Da Assumpcan) কৃপার-শাস্ত্রের-অর্থভেদ (Crepar Xaxtrer Orthbhed) নামে একখানি পর্ত্তুগীস্ ধর্ম্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। বইটি খৃষ্টীয় ১৭৪৩ শতকে লিসবন্ সহরে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। এটিই বাঙগলা ভাষার প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, বিদেশীদের চেষ্টায়, বাঙগলা অক্ষরযুক্ত মুদ্রাঙ্কনের সৃষ্টি হ'য়ে বাঙগলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করে।

# মঙ্গলকাব্য

## মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য হ'ল মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের বৃহত্তম শাখা। খ্রীষ্টোত্তর দ্বাদশ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক বিশেষ এক রকম সাম্প্রদায়িক সাহিত্য প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক দেশেই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের জন্ম হয়েছে এবং এ ধরণের সাহিত্যে প্রথম দিকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামী থাকেই। এ দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্মৃতি-শাসিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দুর্লঙ্ঘ্য বর্ণ-বিন্যাস, বৈদেশিক মুসলমান শাসনের পীড়ন এবং সামাজিক নানা বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে দেশের জনসাধারণ নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে উচ্চতর সমাজে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে এবং এক সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের দেবতাকে অপর সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর চেয়ে বড় করে দেখাতে যত্নবান হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত হয়। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচারিত হবার আগে এবং রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়া মঙ্গলকাব্যই ছিল এদেশের প্রধান সাহিত্য। জনসাধারণের মধ্যে পাঁচালী আকারে লিখিত এই কাব্যগুলি পুরাণ ও শাস্ত্রের মর্য্যাদা লাভ করলেও প্রকৃত-পক্ষে এগুলি লৌকিক-সাহিত্য। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার ছলে কবিরা মানুষের সুখদুঃখের কথাই বলেছেন। সে যুগে কবি-প্রতিভা বিকাশের অন্য ক্ষেত্র না থাকায় তাঁদের এই পথই অবলম্বন করতে হয়েছে। এগুলিকে সে যুগের রূপকথা, কথাকাব্য, উপন্যাস অথবা জাতীয় মহাকাব্য বলা যায়।

পাল-রাজবংশের সমকালেই খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ হ'তে আগত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাশ্রয়ী সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সেনরাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রাজবলে বলীয়ান হ'য়ে দেশের সামাজিক জীবনে বিরাট্ পরিবর্ত্তন আনতে থাকে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে আবহমানকাল ধরে যে সুপ্রাচীন ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত ছিল আর্য্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংঘাতে তার মূল শিথিল হলেও সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হ'লনা। এই প্রাচীন ঐতিহ্য প্রচ্ছন্নভাবে অধিষ্ঠিত র'য়ে গেল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নব আদর্শ এবং দেশীয় পূর্ব্বতন সংস্কারের মধ্যে বিচিত্র রূপে

বিরোধ-মিলনের আবর্ত্তচক্রে, লোকমুখে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে, মঙলকাব্যগুলির জন্ম হয়।

বাঙলাদেশে পাল রাজত্বের সময়েই ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, বিভিন্ন ধর্ম্মের নানা দেব-দেবীর মধ্যে—এক কথায় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই—'সমন্বয়-স্বাঙগীকরণ'এর অভূতপূর্ব্ব প্রচেষ্টা প্রবলভাবে আরম্ভ হয়। এরই সুস্পষ্ট চিহ্ন মঙগলকাব্যগুলিতেও বিদ্যমান। লৌকিক দেব-দেবীর সঙেগ পৌরাণিক দেব-দেবীর, আর্য্য-কল্পনার সঙেগ অনার্য্য-কল্পনার, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সঙেগ জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত এমনকি মুসলমানের সংস্কারের 'সমন্বয়-সমীকরণের' অভিনব চেষ্টা দেখা যায় এই কাব্যে। পরবর্ত্তীকালে এই ধরনের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছিল লৌকিক ধর্ম্মের উপর পৌরাণিক প্রলেপ দেওয়া। এই লৌকিক ধর্ম্মগুলি হ'চ্ছে এদেশের নিজস্ব ধর্ম্মমত। এগুলির অন্তত কোন কোনটির উদ্ভব হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে।

মঙগলকাব্যগুলি দেব-দেবীকে উপলক্ষ্য করে রচিত হলেও সে যুগের বাঙলার রাষ্ট্রিক সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নিখুঁত ছবি এতে সুস্পষ্ট। তাই আমাদের জাতীয় লুপ্ত ইতিহাসের যে তথ্য এতে পাওয়া যায় তার মূল্য বড় কম নয়। কালক্রমে মঙগলকাব্য রচনার একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সব মঙগলকাব্যের বিষয়বস্তু এবং রচনারীতি প্রায় এক-রকম। সকল কবিই দেবতাদের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁদের মহিমা প্রচারে ব্রতী হ'য়ে লেখনী ধারণ করেন। সব নায়ক নায়িকাই শাপভ্রষ্ট অমর্ত্ত্যলোকবাসী। নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে সকলেরই দুর্গতি মোচন হয় দেবতার অনুগ্রহে। পূজা প্রচার করার পর ইহ জীবনের অবসানে সকলেই আবার দেবলোকে ফিরে যান। সেই সঙেগ সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক পুরী নির্ম্মাণ, হনুমান কর্ত্তৃক বিক্রম প্রদর্শন ও মল্লযুদ্ধ শিক্ষাদান; ভীম কর্ত্তৃক দুরূহ কার্য্য সম্পাদন, নায়ক নায়িকার অলঙকার শাস্ত্রানুমোদিত রূপবর্ণনা, কাঁচুলি নির্ম্মাণ প্রসঙগ, কুল-কামিনীর পতিনিন্দা, বিরহিণীর বারমাস্যা, রন্ধন বিবরণ, দেবমহিমা সূচক চৌত্রিশা স্তব......সর্ব্বত্রই রচনা পদ্ধতি প্রায় এই রকম বৈচিত্র্যহীন।

রূপকথা, আরব্যোপন্যাস, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথায় যেমন বিচিত্র অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও বর্ণনার অসঙগতি দেখা যায় এবং তা স্বীকার করে নিয়েই আমরা রসগ্রহণ করার চেষ্টা করি, মঙগলকাব্যের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই কথা

খাটে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অলৌকিক ঘটনা ছাড়া কতকগুলি বাঁধাধরা অসামঞ্জস্যও চোখে পড়ে। যেমন, শিবঠাকুর হয়তো বৃষভ-বাহনে আরূঢ় হয়ে অবলীলাক্রমে শূন্যমার্গে সমস্ত পথ অতিক্রম করে এসে অকস্মাৎ এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পার হওয়ার জন্য পাটনীর শরণাপন্ন হলেন। এই পাটনী আবার ডোমিনী বেশিনী স্বয়ং চণ্ডী। আবার মনসা বা অপর কোন কন্যার জন্ম হওয়ার পরমুহূর্তেই কবি তাঁর যে রূপ বর্ণনা করেছেন তা কোন সদ্য-জাতা শিশু, বালিকা বা কিশোরীর নয়—সে বর্ণনা যৌবন-ভার-পীড়িতা কোন তরুণীর। এই রকম যুক্তিহীন অবাধ কল্পনাময় বর্ণনা প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই অল্পবিস্তর চোখে পড়ে। তা সত্ত্বেও এরই মধ্যে কোন কোন প্রতিভাবান কবি যথেষ্ট মৌলিকতা ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

মঙ্গলকাব্য সর্ব্বপ্রথম ঠিক কোন সময় রচিত হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত বাঙলার সমাজের উপর যখন হিন্দু সেনরাজত্বের প্রতিক্রিয়া চলছিল এবং তার কিছুকাল পরেই যখন তুর্কীদের দ্বারা গৌড়বিজয়ের সূচনা হয় তখন বা তার কিছু আগেই জন্ম হয় এই শ্রেণীর সাহিত্যের। প্রাক্-চৈতন্য যুগের—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের—নবদ্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস বলেছেন,—

> "ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
> দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে।
> পুত্তলি পূজয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥" (চৈতন্য ভাগবত, আদি)

পঞ্চদশ শতকে সমাজে যে সাহিত্যের বহুল প্রচার ও আদর ছিল তার জন্ম অন্তত আরো দু'তিন শ'বছর আগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতকে হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমেই বাঙলা দেশে মুসলমান রাজত্বের প্রথম সূচনা হলেও সমস্ত দেশ তাদের শাসনাধীন হ'তে আরো প্রায় দেড়শ' বছর লেগেছিল। হিন্দু প্রজারা বিদেশী মুসলমান শাসককে বহুদিন পর্য্যন্ত ভয় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেছে। দেশব্যাপী নৈরাজ্যের অনিশ্চয়তা ও পীড়ন উপদ্রবের সঙ্গে অনিবার্য্যভাবে বর্ত্তমান ছিল অশিক্ষা ও কুসংস্কার। দেশ তখন শৌর্য্য, কর্ম্মপ্রচেষ্টা, আবিষ্কার-অভিযান, ধ্যান-মনন প্রভৃতি থেকে নিরস্ত হ'য়ে সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য, অপমান, নির্য্যাতন এবং ভাগ্য-বিপর্য্যয়কেই ক্রূর দেবতার ইচ্ছা মনে করে কিছু সান্ত্বনা লাভ

করবার চেষ্টা করছিল। এরই মাঝে ভয়ে-ভাবনায় অসংখ্য দেব-দেবী কল্পনা করে তাঁদের চাল-কলা-চিনির নৈবেদ্যের উৎকোচে বশীভূত করে কোন রকমে টিঁকে থাকার চেষ্টাতেই মানুষের সমস্ত উদ্যম নিঃশেষিত হয়েছে। জাতীয় জীবনের এই অধোগতির ছাপ মঙ্গলকাব্যে পড়েছে। এই কাব্যে তাই শৌর্য্য ও গৌরবের চেয়ে কাপুরুষতা ও অপরিসীম দৈন্য, প্রেম ও ভক্তির চেয়ে ভয় ও ভিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং দৈবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পুরুষকারের পরাজয়ের কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মনসা মঙ্গলের চাঁদসদাগরই পুরুষকারের একমাত্র নিদর্শন। আত্মবিশ্বাসী পরম শৈব চাঁদ মনসা সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও দম্ভভরে বলেছিলেন,—

"যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পূজিব পুনি চেংমুড়ি কানী॥" (বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ)

অথবা,

"যা করেন শিব শূল, এবার পাইলে কূল,
মনসায় বধিব পরাণে।" (কেতকাদাসের মনসামঙ্গল)

কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হ'য়েছে ক্রীড়নক হ'তে হ'য়েছে দৈবী লীলার। চাঁদসদাগরের চরিত্রের আদর্শ নিয়েই পরবর্তী মঙ্গল কাব্যের প্রায় সব দেবী-দ্রোহী নায়কদের চরিত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি বলেন,—

"যদি বন্দিশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥

* * *

মাইয়া দেবতা আমি পূজা নাহি করি।
শিব না ছাড়িব আমি প্রাণে যদি মরি॥"

(মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

শীতলামঙ্গলের শৈব রাজা চন্দ্রকেতু বলেন,—

"জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।
শুনরে অজ্ঞান বুড়ি এথা হৈতে দূর॥"

*　　*　　*

"রাজা বলে শীতলা ়রেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার লব না প্রসাদ॥"

(দৈবকীনন্দনের শীতলামঙ্গল)

লৌকিক দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন হলেন শিব। পরবর্ত্তীকালে শিবের পৌরাণিক উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলেও বাঙগালী তাঁকে নিজস্ব লৌকিক শিবের সংগে অভিন্ন করে দেখেছে। আর্য্যানার্য্য মিশ্র কল্পনায় 'সঙ্কর' এক নূতন শংকরের আবির্ভাব একদিন এই দেশে হয়েছিল যার স্মৃতি আজও মুছে যায় নি। শুধু শিবই নয় তাঁর মত বহু অনার্য্য দেব-দেবীকে পৌরাণিক আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করে নূতন ভাবে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনার্য শব্দটি শুনলেই অনেকেই এখনও নাসিকা কুঞ্চিত করেন কিন্তু ভারতের ধর্ম্ম শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুনিন্দিত অনার্য্যদের দান তথাকথিত সুসভ্য আর্য্যদের চেয়ে কমতো নয়ই বোধকরি বেশীই। "আর্য এবং পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা, মন্দির, পশুবলি, অনেক দেব-দেবী, যথা, শিব ও উমা, শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি যে-স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার মূলে দ্রাবিড়ভাষী লোকদের প্রভাব অনস্বীকার্য।" (অধ্যাপক শ্রীযুত নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস)। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি-লিট; এফ. আর. এ. এস. বি. মহাশয়ের "ভারত সংস্কৃতি" থেকে উদ্ধৃত করছি, —"অনার্যভাষীদের দ্বারা আর্যভাষা গৃহীত হবার সঙ্গে-সঙ্গে এদের ধর্ম্ম, দেবতা, আচার অনুষ্ঠানও আর্য্যীকৃত হ'য়ে গেল, সেগুলি সর্ব্বজন গৃহীত হ'য়ে প'ড়ল—পৌরাণিক দেবতাবাদ, ভক্তিবাদ ইত্যাদি এল—বৈদিক ধর্ম্মের চেয়ে গভীরতর উন্নততর ধর্ম্মজীবন ভারতীয় সমাজে এল। অনার্য্যদের বড়ো বড়ো দেবতা—শিব, উমা, বিষ্ণু—অনুরূপ আর্য্যদের দেবতাদের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেলেন, তাঁদের আরও মহনীয় ক'রে তুল্‌লেন। অনার্য্যদের বৃক্ষ দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, নাগ, আর দৈবী শক্তির বিকাশ রূপে, দেবতারূপে কল্পিত নানা পশু পক্ষীর

প্রতীকের মাধ্যমে পূজা—এ-সবও এসে গেল।" শিল্পাচার্য্য শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি-লিট, সি-আই-ই মহাশয় তাঁর "বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী"তে বলেছেন,—"......আর্য-শিল্পের ভিত্তি অনার্য যুগের উপরে। পাকা ফলের বুকের মাঝে যেমন শক্ত কষি, তেমনি আর্য-শিল্পের অন্তরে অনার্য-শিল্পের প্রাণ বীজের মতো লুকিয়ে রয়েছে—তাকে ফেলে' হয়তো রস পেতে পারি, কিন্তু সে যদি বাদ যেতো আরম্ভেই একেবারে তবে নিষ্ফলা হ'ত আর্যসভ্যতা এটা নিশ্চয়।"... (আর্য ও অনার্য শিল্প)। "........রামায়ণ থেকে পাওয়া যায় স্বর্ণ-সীতার কথা। সেই যদি ধরা যায় প্রথম প্রতিমা গড়ার আরম্ভ আর্যজাতির, তবে বলতে হবে সেটাও রাক্ষসদের কাছ থেকে এসেছিল, কেননা লঙ্কায় মায়াসীতার খবর রামের অশ্বমেধের আগের ঘটনা। রাবণের পুষ্পক রথ এবং রাবণের পুরীর যা বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে বুঝি যে, আর্যেতর সমস্ত জাতি তারা কলা কৌশলে ভারতবাসী আর্যদের অপেক্ষা অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

মহাভারতের যুগে ভারতীয় আর্যেরা সভ্যতার প্রায় চরম শিখরে উপনীত দেখা যায়। কিন্তু তখনও দেখি যুধিষ্ঠিরের সভা প্রস্তুত করতে এল শিল্পকার ময়দানব, কিরাতের ঘর থেকে এল গাণ্ডীব অর্জুনের। এমনি সব খুটিনাটি কথা থেকে ধরা যায় আর্যেতর তারাই ছিল আর্টিষ্ট এবং কারিগর, রূপ দিতো তারা কল্পনাকে। এরা বিশ্বের তাবৎ রূপকে দখল করতে পারতো বিদ্যার দ্বারা—সেইজন্য অনেক সময় এদের যাদুকর ভাবা হত। মায়াবী আর শিল্পী এ দুয়ের মধ্যে পরিস্কার ভেদ অনেক দিন করেনি মানুষ।" (আর্য শিল্পের ক্রম)

দেবাদিদেব মহাদেব ঠিক কবে থেকে এই বঙ্গভূমিতে এসে খাদ্য-সমস্যা সমাধানের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে পাল-রাজত্বের সমকালে বাঙলা দেশে জীবন্মুক্তির সাধক রসসিদ্ধ যোগী সম্প্রদায়ের রূপান্তরে উদ্ভূত নাথসিদ্ধ যোগী সম্প্রদায়ের অলৌকিক কাহিনী সম্বলিত নাথ-সাহিত্য নামে যে বিরাট্ সাহিত্য ছিল তাতে এবং তার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় সমাজে ও সাহিত্যে কৃষকরূপী লৌকিক শিবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ক্রমে এই শিব এসে মঙ্গলকাব্যে আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁর উপর পৌরাণিক প্রভাব পড়তে আরম্ভ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মঙ্গলকাব্য রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' পৌরাণিক শিবকেই কিছুটা প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে শিব-শ্রীকণ্ঠ ও তাঁর শিষ্য লাকুলীশ প্রবর্ত্তিত পাশুপত ধর্ম্মই নাকি আর্য্যাবর্ত্তের আদি শৈব-ধর্ম্ম। গুপ্ত আমলে (আনুমানিক ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ ও তার পরবর্ত্তী সময়ে) এই পাশুপত ধর্ম্ম বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়েছিল। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে (আ ৩৫০-৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ) বাঙলা দেশে সর্ব্বতোভাবে আর্য্যীকরণ সুরু হয়ে যায়। বৈদিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বহির্বাঙলা থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এসে স্থায়ীভাবে বাস করেন। খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর-বঙ্গে লিঙ্গরূপী শিবের পূজা প্রচলিত হয় এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই মহারাজ বৈণ্য-গুপ্তের চেষ্টায় পূর্ব্ব-বঙ্গে শৈবধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে। সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়-রাজ শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় শিব ও নন্দীবৃষের লাঞ্ছন দেখা যায়। এই শতকে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মাও ছিলেন শিব উপাসক। এই সময়ে শিবের নানা রূপ-কল্পনার প্রতিকৃতি ধাতব ও প্রস্তর ভাস্কর্য্যে উৎকীর্ণ হয়েছিল। বৌদ্ধ পাল-রাজারাও, অন্তত পাল-পর্ব্বের শেষের দিকে, শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেনরাজারা ব্যক্তিগতভাবে এক এক দেবতার উপাসক হলেও তাঁদের কুলদেবতা ছিলেন সদাশিব। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙলা দেশে শিবের অপ্রতিহত প্রভাব। 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবচনেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বৈদেশিক আক্রমণ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও সামাজিক কারণে শিবের প্রাধান্য হ্রাস হ'তে থাকে। এর কারণও পাওয়া যাবে তৎকালীন জীবনের দুঃখ দুর্গতির মধ্যে। চাঁদ ও ধনপতিসদাগর শিবের উপর নির্ভর করে থাকতে পারলেন না,--ভাগ্যবিপর্য্যয়ে শিবকে পরিত্যাগ করে শক্তি উপাসক হ'তে হ'ল। শৈব ধর্ম্মের শেষ কথা,—'শিবোহহং'। জীব মায়াপাশ থেকে মুক্তি লাভ করলে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সংসারী মানুষ মুক্তি চায়না, চায় ধন জন মান। অথচ সুখদুঃখ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার ভক্তের ঐহিক বিষয়ে উদাসীন নিশ্চেষ্ট দেবতা ভোলানাথ সব ভুলে বসে থাকেন। অপরদিকে শক্তিকে আরাধনা করলে সকল দুঃখকষ্ট এড়াতে না পারলেও নিজেকে সান্ত্বনা দেবার উপায় থাকে। দেবীর রোষ হ'লে 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' ডুববে, অকাল-বৈধব্য ও নানা বিপত্তি ঘটবে। আবার তাঁদের কৃপা হ'লে নৌকা ভেসে উঠবে, বন্ধ্যা নারী পুত্র পাবে, নির্ধনের ধন হবে, সপত্নী পীড়ন হেতু দুঃখের অবসান হবে, গলিত শবদেহ নব জীবন লাভ করবে, ইহলোকে সব

বিঘ্ন বিপদ দূর হ'য়ে ইহ জীবনের অবসানে স্বর্গলাভ হবে। এসব প্রলোভনের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়।

মঙ্গলকাব্যে দেবের চেয়ে দেবীদের সংখ্যা প্রতাপ এবং আধিপত্য অনেক বেশী। সেই সঙ্গে যে কোন উপায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের চেষ্টা ও চক্রান্তের বিরাম নেই। আদিম মাতৃতান্ত্রিক কৌম-সমাজের মধ্যেই হয়তো এই মাতৃকাতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে আর্য্যকল্পনায় সাংখ্যোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি শক্তি ধর্ম্মের শিব-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং এই শক্তির সঙ্গে কৌমজনদের মাতৃকাদেবীরা মিশে গিয়ে তাঁকে আরো শক্তিশালিনী করে তুলেছেন।

এই সমস্ত অধিকাংশ দেব-দেবীর চরিত্র সম্ভবত সেকালের প্রতিষ্ঠাবান ক্ষমতালোভী নরনারীর আধারে চিত্রিত। শ্রীযুত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এম, এ মহাশয় 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা'তে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন,—"এইসব চরিত্রের পরিকল্পনায় নিজ নিজ গ্রামের জুলুমবাজ জমিদার, ঘুষখোর রাজকর্ম্মচারী, হীনচরিত্রা গ্রাম্য ডাইনি প্রভৃতির আদর্শ লুকানো আছে কিনা সে কথাও অনুমান করা যেতে পারে। লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব সম্বন্ধে স্পেনসারের মত এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'তে পারে বলেই আমার বিশ্বাস।"

এইসব দেবতাদের মধ্যে শিব, ধর্ম্মরাজ, দক্ষিণরায়, কালুরায় ও সত্যনারায়ণ ছাড়া প্রায় সকলেই স্ত্রী-দেবতা। স্ত্রী সমাজের মধ্যে এঁদের প্রতিষ্ঠা এত বেশী হওয়ার এও এক প্রধান কারণ। নদীমাতৃক অরণ্যাকীর্ণ বাঙলায় ব্যাঘ্র, কুম্ভীর ও সর্পভীতি থেকে দক্ষিণরায়, কালুরায় ও মনসা প্রভৃতি দেব দেবীর কল্পনা প্রাক্-আর্য্য আদিবাসীদের মধ্যে করা হয়েছিল। গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশে বসন্ত ওলাওঠা প্রভৃতি মহামারীর আতংক থেকে শীতলা (বৌদ্ধধর্ম্মের হারীতীদেবী), ওলাঝোলা (মুসলমানী প্রভাবে ওলাবিবি) প্রভৃতির কল্পনা করা প্রয়োজন হ'য়েছে। সমাজের নিম্নস্তরের লোকেদের মধ্যেই এঁদের জন্ম এবং আজও প্রধানত তারাই এঁদের পুরোহিত। সে যুগে, বাণিজ্য প্রধান বাঙলায়, বণিক সম্প্রদায় ছিল ধনে-জনে সমৃদ্ধ এবং সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। সেজন্য এই লৌকিক দেব-দেবীদের সমাজে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আসন পেতে হলে এই বণিক্ সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃতির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। তাই এই বণিক সমাজের শীর্ষ স্থানীয় শৈব চাঁদসদাগর, ধনপতি সদাগর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অভিজাতগণের সাহায্যে পূজা প্রচারের জন্য-মনসা ও চণ্ডীর এত ব্যাকুলতা—এত চক্রান্ত।

মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অধিকাংশই এদেশের আদিম অধিবাসীর দেবতা। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'Discoveries of living Buddhism in Bengal' এ সর্ব্ব প্রথম প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, রাঢ়দেশে হিন্দুর দ্বারা ধর্ম্মঠাকুর রূপে পূজিত বিগ্রহ হচ্ছেন প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ-দেবতা। ইনি বৌদ্ধ ত্রিশরণের 'ধম্ম' বা 'ধর্ম্ম' দেবতা। এছাড়া মনসা, চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, শীতলা, ওলাবিবি, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণরায়, কালুরায় সকলেরই প্রথমে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মধ্য থেকে পরে উচ্চস্তরের গৃহস্থ বধূগণের মধ্যে পূজা প্রচলন হয়। কল্পতরু সদৃশ এই সমস্ত দেব-দেবীরা ক্রমে বহু আয়াসে উচ্চসমাজের পুরুষগণের কাছে পূজা আদায় করে বর্ণহিন্দুর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন।

শাক্তধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও পুরাণগুলির মধ্যে দেখা যায়, সকল স্ত্রী-দেবতারই শিবের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সকলেই শিবের বিভিন্নরূপিনী শক্তি। এর কারণ অনুসন্ধান করলে মনে হয়, সমাজে তখনও শিবের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান ছিল। সেজন্য সকল দেবদেবীরই শিবের সঙ্গে আত্মীয়তার পরিচয়পত্র নিয়ে বর্ণহিন্দুর কাছে পূজা আদায় করতে হয়েছে। এই মনসা শিবের মানস-কন্যা, চণ্ডী শিবের স্ত্রী, ধর্ম্মঠাকুর বিষ্ণু, বরুণ, যম বা স্বয়ং শিব রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। লৌকিক দেবতাদের বর্ণহিন্দুর সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল সে যুগে বাঙলা মঙ্গল-কাব্য এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে রাঢ় দেশে রচিত হয়েছিল) প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত পুরাণ ও আরো কয়েকটি উপপুরাণ। জনসাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় এঁদের পূজার কাহিনী ও মন্ত্র রচিত হওয়ায় সমাজে লৌকিক দেবতাদের মহিমা শতগুণ বেড়ে যায়। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে বহুতর আদর্শে উচ্চবর্ণের পুরুষেরা এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ করলেও অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত জনসাধারণ এবং রক্ষণশীল স্ত্রী-সমাজের মধ্যে এঁদের সাড়ম্বর পূজা আজও প্রচলিত রয়েছে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে লৌকিক দেবতাদের নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনার যে জোয়ার আসে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে তাতে ভাটা পড়তে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, পৌরাণিক দেবতারা এসে লৌকিক দেবতাদের বিতাড়িত করে তাঁদের আসন দখল করতে থাকেন। তাছাড়া যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের দেবোপম চরিত্রের প্রভাব এবং বৈষ্ণব রস-সাহিত্যের ও

দর্শনের সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া এই শতাব্দীতে সাংখ্যায়ন-ভাষ্যকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতির নব আদর্শ নূতন সমাজ নির্দ্দেশ দান করে। এই সময় থেকেই মঙগলকাব্য সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য বর্জ্জন করে পঞ্চলক্ষণযুক্ত পুরাণ রচনার আদর্শে সাহিত্য-সৃষ্টির এবং কবি-প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র হ'য়ে দাঁড়ায়। এই ষোড়শ শতাব্দী থেকেই মঙগল-কাব্যগুলি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গ্রাম্য কবির হাতে জাতীয় কথাকাব্যের আকারে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং তার জের চলে অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বহু কবিই মঙগলকাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল হয়েও কেবলমাত্র শাক্তের দেবতা চণ্ডীর মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করেননি--সমাজে পতিত ব্যাধ-তনয়কে করেছেন তাঁর কাব্যের নায়ক। সামাজিক নিগ্রহের আশংকা সত্ত্বেও দ্বিজ ময়ূরভট্ট, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, মাণিকরাম গাঙগুলী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ অস্পৃশ্য সমাজের দ্বারা পূজিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্মরাজের মহিমা প্রচার করেছেন অকুণ্ঠভাবে। অষ্টাদশ শতকে শাক্তের চণ্ডী বৈষ্ণবের শ্রীরাধার প্রভাবে কমনীয়রূপে আবির্ভূতা হ'লেন। তাঁকে ঘিরে জন্ম নিল আগমনী-বিজয়া গান। শ্মশানবাসিনী, সর্ব্ববসন-বিবর্জ্জিতা কপালকুণ্ডলা সাধক রামপ্রসাদের কাছে ঘরের মানুষ হ'য়ে কল্যাণী মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। ভারতচন্দ্র মঙগলকাব্যের পারলৌকিক শাসনকে ব্যঙগ করে এর স্বল্প-পরিসর আবেষ্টনী ও বিধি-নিষেধের শৃঙখল ভেঙে এই পুরাতন ধারার মধ্যেই সুকৌশলে বাঙগলা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোম্যাণ্টিক কাব্য সৃষ্টি করেন। মঙগলকাব্যের মধ্যেই আমরা বাঙগলার গৃহাঙগনের কয়েকটি অপরূপ আলেখ্যের সঙেগও পরিচিত হই।

মধ্যযুগে 'মঙগল' নামে তিন রকম সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর প্রাচীন মঙগলকাব্যগুলি লৌকিক দেবতাদের নিয়ে লেখা। যেমন, মনসা-মঙগল, চণ্ডীমঙগল, ধর্ম্মমঙগল, কালিকামঙগল (বিদ্যাসুন্দর), শীতলামঙগল, বাসুলিমঙগল, রায়মঙগল প্রভৃতি। অনেক কাল পরে এগুলিরই প্রভাবে শিবমঙগল, সূর্য্যমঙগল, দুর্গামঙগল, অন্নদামঙগল প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত মঙগলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে। শাক্তদের এই মঙগল নামে কাব্যগুলি সমাজে এত বেশী প্রচলিত হ'য়েছিল যে বৈষ্ণবেরাও তাঁদের কতকগুলি সাহিত্যকে মঙগল নামে চিহ্নিত করে নিয়েছিলেন সম্ভবত শুধু নামের মোহে ও সমাজে বহুল প্রচারের আশায়। বৈষ্ণবদের চৈতন্য-মঙগল, অদ্বৈত-মঙগল প্রভৃতি গ্রন্থ-

গুলি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর। এগুলি বৈষ্ণব জীবন-চরিত সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত—বর্ত্তমানে আলোচ্য মঙ্গলকাব্যরূপ কথাকাব্যের অন্তর্গত নয়।

বাঙ্গালীর মঙ্গলকাব্যগুলি, বিশেষ করে মনসামঙ্গল, বহির্বাঙ্গলাতেও প্রচারিত হয় এবং অনেক অ-বাঙ্গালী কবি এদের প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ কয়েকটি কাব্য রচনার চেষ্টাও করেছিলেন। বিহারে পাটনা, ছাপরা ও ভাগলপুরের কাছে চম্পানগরে এবং অসমীয়া সাহিত্যে বেহুলা-লক্ষীন্দরের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। মিথিলায় কবি বিদ্যাপতি এ বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় একখানি পুস্তক রচনা করেন। মঙ্গলকাব্যকে এক হিসাবে বর্ত্তমান বাঙ্গলা নাটক, উপন্যাস ও Satire এর জননী বলা চলে। যদিও বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাবধারায় আধুনিক বাঙ্গলা নাটকের সৃষ্টি হ'য়েছে তবু একথা অনস্বীকার্য্য যে, আবৃত্তি ও গানে পূর্ণ এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই অলক্ষিতে বর্ত্তমান যাত্রা ও নাটকের বীজ নিহিত ছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বর্ত্তমান যুগের উপন্যাস-সাহিত্যের সুস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যায়। আর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে পাওয়া যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রোমান্স ও Satire এর অপূর্ব্ব সমন্বয়।

মঙ্গলকাব্য কথাটির সৃষ্টি আধুনিক কালে হলেও এক মনসার ভাসান ছাড়া এই শ্রেণীর রচনা 'মঙ্গল' নামে সে যুগেও অভিহিত হত। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র সকলেই এই কাব্যকে 'মঙ্গল' বলে প্রচার করেছেন। যে গান রচকের, গায়কের, শ্রোতার ও গৃহস্থের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় দেবতার কৃপা ভিক্ষা করে রচিত, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করা হ'য়েছে এবং যে গান এক মঙ্গলবার আরম্ভ হ'য়ে অপর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত আটদিন গীত হয় তাকেই মঙ্গলকাব্য বা মঙ্গলগান বলা হয়। এই মঙ্গলগান আট দিন ধরে প্রত্যহ দু'বেলা গীত হয় এজন্য একে অষ্টাহগীত বা অষ্ট-মঙ্গলাও বলা হয়। তবে ধর্ম্মমঙ্গল এবং মনসামঙ্গল সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হ'য়েছে। ধর্ম্মমঙ্গল গান দ্বাদশ দিনে ও মনসার ভাসান গান বা রয়ানী সমস্ত শ্রাবণ মাস ধরে চলে এক মাসে শেষ হয়।

মঙ্গলকাব্যের প্রথম সৃষ্টির ও বিকাশের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়, লোকমুখে ছড়ার আকারে প্রচলিত সুপ্রাচীন কাহিনীকে অবলম্বন করে খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচালীর আকারে এগুলি লেখা হ'তে থাকে। তারপর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠ শক্তিমান গ্রাম্য-কবিরা বিভিন্ন

মঙ্গলকাব্যকে একটা পরিপূর্ণ রূপ দান করেন। কিন্তু তখনও কবিরা মঙ্গলকাব্যের উপাদানের সাহিত্যিক সদ্ব্যবহার আশানুরূপ করতে পারেন নি এবং এই কাব্যকে গ্রাম্যতা দোষ থেকেও মুক্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়'নি। ক্রমশ এই কাব্য নাগরিকদের কাছে আদরণীয় হ'য়ে অষ্টাদশ শতকে' মুসলমানী উপকথার আওতায় অভিজাত-উচ্চকোটি সমাজে চিত্তবিনোদনের জন্য, রাজ-দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায়, রোমান্স ও শ্লেষ প্রিয় কবি-পণ্ডিতের দ্বারা অভিনব ভাব, অবাধ কল্পনা, নূতন চরিত্র, মার্জ্জিত তীক্ষ্ণ ভাষা ও নৃত্যশীল সুললিত ছন্দে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করেন গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে নূতন সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং আধুনিক যুগের সাহিত্যের পূর্ব্বধ্বনি শোনা যায়। এই নূতন কাব্যধারার প্রবর্ত্তক হ'লেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁর প্রদর্শিত আদর্শের অনুশীলন ব্যাপকভাবে হওয়ার আগেই মঙ্গলকাব্য রচনার উপর যবনিকা নামে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে ক্রমবর্দ্ধিত ভাবে যে বর্ণনা-প্রধান মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা অব্যাহত থেকেছে, অষ্টাদশ শতকে কাল পূর্ণ হওয়ায়, তার সমাপ্তি ঘটল'। মঙ্গলকাব্যের আত্মা যুগধর্ম্মে নূতন রূপ পরিগ্রহ করল আবেগপ্রধান খণ্ড গীতিকাব্যের মধ্যে। এই শাক্তপদাবলীরূপ মন্দাকিনী ধারার ভগীরথ হ'লেন সাধক রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই—সতের শ' সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে বাঙলার স্বাধীনতার সূর্য্য অস্তমিত হ'ল। বিদেশী শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারে বাঙালীর রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সামাজিক জীবনে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিপুল ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের যুগ আসে। পুরাতন জীর্ণ বনিয়াদ ধ্বংস হ'তে থাকে, নবযুগের অভ্যুদয় হয়। সাময়িক নানা বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলার অবসান হ'লে পুরাতনের মোহ ছেড়ে 'বৈতসী-বৃত্তি' বাঙালী সর্ব্বতোভাবে নূতনকে বরণ করে নিতে তৎপর হ'য়ে ওঠে।

## শিবমঙ্গল

### (শিবায়ন বা শিবসঙ্কীর্ত্তন)

শিব-মাহাত্ম্য গীতির অস্তিত্ব প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে থাকলেও এই শিবের গীত আজ পর্য্যন্ত খুব কমই পাওয়া গেছে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব-কাহিনী থাকলেও স্বতন্ত্রভাবে যথার্থ শিবমঙ্গল কাব্য যা পাওয়া গেছে সেগুলি সপ্তদশ শতকের আগের নয়। কবি বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে জানা যায়, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও শিবের গান গেয়ে এক শ্রেণীর ভিক্ষুক ভিক্ষা করত। এই গান তখন সমাজের নিম্নস্তরেই প্রচলিত ছিল।

বাঙ্গলায় পাল-সাম্রাজ্যের শেষ দিকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিতাড়িত হ'য়ে প্রথমে বিক্রমপুর তারপর চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। ক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুদয় ও তার দিগন্তব্যাপী প্লাবনের আলোড়ন এই সুদূর পূর্ব্ব সীমান্তেও পৌঁছায়। নবোদিত হিন্দুধর্ম্মের গতিরোধ করা বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় ঐ অঞ্চলের বুদ্ধদেবতা শিব পরিচয়ে আত্মগোপন করে এই ধর্ম্মের মধ্যে আশ্রয় লাভ করলেন। শৈব-ধর্ম্মের প্রভাবে এই অঞ্চলে সাহিত্যক্ষেত্রেও যুগান্তর আসে। ক্রমে সংস্কৃত পুরাণ অবলম্বনে বাঙ্গলা ভাষায় শিব মাহাত্ম্য কাহিনী রচনা হ'তে থাকে। 'মঙ্গলবুধ' নামে এই ধরনের কয়েকখানি পুঁথির সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে। মুমূর্ষু বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিন্ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় নি। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে চৈত্র মাসে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে 'মহামুনি মেলা' নামে বৌদ্ধদের একটি প্রসিদ্ধ মেলায় এখনও প্রচুর জনসমাগম হ'য়ে থাকে। পশ্চিম বঙ্গে অনেক বৌদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের সমাজে 'ছত্রিশ জাতের' সঙ্গে খাওয়া ছোঁওয়া ইত্যাদি 'অনাচার' প্রচলিত থাকায় উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছে তারা হ'য়ে রইল অস্পৃশ্য অন্ত্যজ অনাচারণীয় এবং নগরের বাইরে ডোম কাপালী ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে। এরা এখনও প্রচ্ছন্ন বুদ্ধদেবতা 'ধর্ম্ম' বা 'শূন্যের' পূজা করে থাকে। বৌদ্ধদের

'ধর্ম্মের' বা 'আদ্যের' গাজন উৎসব শিবের গাজন বা গম্ভীরা উৎসবে রূপান্তরিত হ'য়েছে। এটি নীল বা চড়ক পূজারই রূপভেদ।

একাদশ শতাব্দীতে ( ? ) বৌদ্ধপ্রভাবে ধর্ম্মপূজার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রবর্ত্তক, বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুরের অধিবাসী, ডোম জাতীয় রামাই পণ্ডিত বিরচিত 'শূন্যপুরাণ'এ (সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সঙ্কলিত) প্রাচীনতম শৈবসাহিত্যের শিব-কাহিনী সম্বন্ধীয় কয়েকটি ছড়া পাওয়া গেছে। যেমন,—

"জখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ বুলেন ঈসর॥
রজনী পরভাতে ভিকখার লাগি জাই।
কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই॥
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরস গোসাঞি ভিকখাএ ভাত॥
আহ্মর বচনে গোসাঞি তুহ্মি চসবাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
পুখরী কাঁদাএ লইব ভূম খানি।
আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি॥
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ॥
ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
কাপাস চসহ পভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘর ছড়॥
তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাএ॥
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হরেক গোঁসাই পঞ্চামৃতর আস॥
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধর্ম্ম পূজার বেলা॥

এতেক সুবিধা হর মনেতে ভাবিল।
মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল॥
সুনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল।
আগে পিছু লাঙ্গলেত এ তিন গোজাল॥
আস জোতি পাস জোতি আঙদর বড় চিন্তা।
দুদিকে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিন্ধা॥
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।
গটা দশ কুআ দিআ সাজাইল মই॥
তাবর দুভিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।
চাস চসিতে চাই সুনার পাচন বাড়ি॥
মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিব মঙ্গলিল।
জতগুলি ভুম পরভু সকলি চসিল॥"

(শূন্যপুরাণ, চাষ অধ্যায়)

অষ্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে যে সমস্ত গোষ্ঠী সভ্য ছিল তাদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তভাবে গ্রাম কেন্দ্রিক। এই সভ্যতা মূলত কৃষিসভ্যতা। এদের প্রভাব বাঙ্গলা দেশে বিস্তার লাভ করায় এ দেশেরও সভ্যতা তদনুরূপ হ'য়ে উঠেছিল এবং তার জের চলেছে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। উত্তর ও মধ্য ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিস্তৃত হবার আগে কৃষিপ্রধান বাঙ্গলায় আর্য্যেতর জাতির সমাজে কৃষকের সহায়ক রূপে শ্মশানচারী লম্পট ভাঙড় শিবের কল্পনা করা হ'য়েছিল। শিবের বাহন বলদও কৃষকের সংস্পর্শের কথা সমর্থন করে। প্রাচীন শিবায়নগুলিতে শিবের সঙ্গে কোচ নারীর ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিবায়নগুলিতে বাগ্দিনীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানা যায়।

"ভাঙ খাইবে ধুত্রা খাইবে খাইবে ভাঙ্গের গুড়া।
পিরথিমি মজলে শিব না হইবে বুড়া॥
ভাঙ খাইবে ধুতরা খাইবে খাইবে শতারি ( ? )।
দিবারাত্রি থাকবে তুইন কুচনীরার বাড়ী॥
ষোলশ কুচনীর মধ্যে একলা ভুলানাথ।
আপেক্ষা না মিট্‌বে তব কামিণীর সাঁত॥

শ্মশানে মশানে থাকবে মাখবে ভষ্ম ছালি।
সগলে ডাকবে তবে পাগলা শিব বুলি॥
ভূত পেরেতের লগে একত্রে কর্‌বে বাস।
অঘোর সাগরে পইড়া থাকবে বারমাস॥
বলদের কান্ধে উঠবে পিন্‌বে বাঘের ছাল।
কুচণীর পাড়াতে থাক্যা কাটাইও কাল॥"
('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' থেকে উদ্ধৃত একটি
সুপ্রাচীন শিবের গান)

কৃষকের কল্পিত এই কামিনীলুব্ধ অথচ বিষয় আসক্তিহীন নির্ব্বিকার দেবতার সঙ্গে বৈদিক রুদ্র এবং পৌরাণিক নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপশিখার ন্যায় সমাহিত দেবাদিদেব মহেশ্বরের চরিত্রগত অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা উভয়েই উদাসীন ও সদানন্দময়। এই মিলটুকু নিয়েই পরবর্ত্তী শৈব-সাহিত্যে এই দুই বিপরীত চরিত্রের মধ্যে একটা অভিনব সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা হয়েছে। "শ্মশান-প্রান্তর-পর্বতের রক্ত-দেবতা একান্তই দ্রবিড়ভাষীদের শিবন্‌ যাহার অর্থ লাল বা রক্ত এবং শেম্বু যাহার অর্থ তাম্র; ইনিই ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আর্য দেবতা রুদ্রের সঙ্গে এক হইয়া যান। পরে শিবন্‌ শিব, শেম্বু শম্ভু রুদ্র-শিব এবং মহাদেবে রূপান্তর লাভ করেন।" (বাঙালীর ইতিহাস)। অনেক পণ্ডিতের অনুমান ভগবান তথাগতের ধ্যানমূর্ত্তির আদর্শেই পৌরাণিক ধ্যানী ধূর্জ্জটির কল্পনা করা হয়েছে।

শিবের গানের আদি কবির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। শূন্য-পুরাণে বর্ণিত যে শিবের ছড়ার উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে লোকমুখে প্রচলিত গান। স্বতন্ত্রভাবে শুধু শিবেরই কাহিনী-মূলক কাব্য সামান্য কয়েকটিমাত্র পাওয়া গেছে। সপ্তদশ শতকে (১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত চট্টগ্রামের পটীয়ায় নিকটবর্ত্তী সুচক্রদণ্ডীগ্রাম নিবাসী দ্বিজ রতিদেবের মৃগলুব্ধ শিব-চতুর্দ্দশী মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক কাব্য। এই শতকেই রচিত চট্টগ্রামের বড়ুয়া মগবংশীয় (?) কবি রামরাজের মৃগলুব্ধ-সংবাদ পাওয়া গেছে। উভয় কাব্যের বিষয়বস্তু প্রায় এক। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর-সিংহের আশ্রিত 'কবিচন্দ্র' বিরচিত শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্য পাওয়া গেছে। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে রচিত রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর (ভট্টাচার্য্য) 'শিব-সঙ্কীর্ত্তন' অথবা রামায়ণের

নামের প্রভাবে 'শিবায়ন' এই শ্রেণীর কাব্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অবশ্য চণ্ডীমঙ্গলে প্রায় এক তৃতীয়াংশ এবং মনসামঙ্গলে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অধিকার করে আছে শিবেরই কাহিনী। এছাড়া সব মঙ্গলকাব্যেই শিবের গল্প অল্প-বিস্তর আছেই। এর কারণ হ'চ্ছে উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন দেবতা শিবের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে এই সমস্ত দেব-দেবীকে প্রবেশ করতে হ'য়েছে, একথা আগেই বলা হ'য়েছে। সাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির জন্যও কবিরা অনেক জায়গায় শিবকে কাজে লাগিয়েছেন। তাছাড়া শিবহীন যজ্ঞ যেমন অসম্পূর্ণ, শিবকে বাদ দিয়ে মঙ্গলকাব্যও তেমনি সম্পূর্ণ হয়না।

## শিবসঙ্কীর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

দেব-সভায় প্রজাপতি দক্ষ জামাতা দেবাদিদেব শিবের দ্বারা সম্মানিত না হওয়ায় অপমানের প্রতিশোধ কল্পে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। স্বামীর নিষেধ উপেক্ষা করে অনাহূতা সতী পিতৃগৃহে গমন করলেন। সেখানে পতিনিন্দায় সতী দেহত্যাগ করলেন। শিব ভয়াল রুদ্ররূপ ধারণ করে দক্ষ-যজ্ঞ নাশ করলেন ও প্রজাপতিকে ছাগমুণ্ড ধারণ করতে হ'ল। এরপর গিরিরাজ ও মেনকার কন্যারূপে সতী গৌরী নামে জন্মগ্রহণ করলেন। গৌরীর বাল্যলীলার পর বিবাহ সম্বন্ধ আরম্ভ হ'ল। তিনি মহাদেবকে পতিরূপে কামনা করলেন। মদনের চেষ্টায় শিবের ধ্যান ভঙ্গ হ'ল ও তাঁর ক্রোধে মদন ভস্ম হ'লেন। এরপর বর্ণিত হ'য়েছে রতিবিলাপ, ভগবতীর তপস্যা, শিবের বরসজ্জা, হরগৌরীর বিবাহ। শিব শ্বশুরালয়েই বাস করতে লাগ্‌লেন। তারপর শিবের কোঁচনী পাড়ায় প্রবেশ, ভিক্ষাযাত্রা, ভগবতীর রন্ধন, কৈলাসের শোভা, হরপার্ব্বতীর কোন্দল, হরগৌরীর রহস্যালাপ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হ'য়েছে। অতঃপর কৈলাসে শিব পার্ব্বতীর কাছে কথাপ্রসঙ্গে হরিনাম মাহাত্ম্য, দিলীপ উপাখ্যান, রুক্মিণীহরণ বৃত্তান্ত, বাণরাজার কাহিনী এবং শিবরাত্রি-ব্রত-মাহাত্ম্য বর্ণনা উপলক্ষ্যে শবর ও ব্যাধের উপাখ্যান বল্‌লেন। এরপর অশেষ দারিদ্র্যের মাঝে তরুণী ভার্য্যা পার্ব্বতীর মন্ত্রণায় দরিদ্র বৃদ্ধ শিব ভূস্বামী ইন্দ্রের কাছে চাষভূমির পাট্টা গ্রহণ করে ধনী মহাজন কুবেরের কাছে কিছু বীজধান কর্জ্জ ক'রে বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়ে ত্রিশূলের লৌহে কোদাল ফাল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে সঙ্গী ভীম ভৃত্যের সাহায্যে চাষ আরম্ভ ক'রলেন।

ক্ষেত্রে প্রচুর শস্যোৎপত্তি হ'ল। চাষে সাফল্যের আনন্দে ভোলানাথের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটল'। উদাসীন শিবকে কৈলাসে আনার জন্য বিরহিণী শিবানী ক্ষেত্রে মাছি ডাঁশ ও উঙানি মশা প্রেরণ করলেন এবং তাদের দংশনে শূলী শম্ভু অস্থির হ'য়ে মশা মাছি জোঁক প্রভৃতি ধ্বংসের জন্য ভৃত্য ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করে বিবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করলেন ও কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করলেন। এমন সময় মহামায়া বাগ্দিনীবেশে রূপমুগ্ধ মহেশকে ছলনা করে অঙ্গুরী উপহার গ্রহণ করলেন। শিব কৈলাসে ফিরে গেলে ভগবতীর সঙ্গে এই নিয়ে কলহ হ'ল। তারপর হরগৌরীর মিলন হ'ল কিন্তু ভিখারী দিগম্বর স্ত্রীর শাঁখা পরার সামান্য বাসনা পূর্ণ করতে না পারায় আবার দাম্পত্যকলহ হ'ল ও অভিমানিনী পার্ব্বতী কার্ত্তিক গণেশকে নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। শঙ্কর শাঁখারীর বেশে হিমালয়ে গমন করে হৈমবতীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা জুড়ে দিলেন তারপর দেবী দক্ষিণহস্তে শঙ্খ পরিধান করলেন ও শাঁখারীকে পুরস্কার দিলেন। এরপর শঙ্করী করালবদনা কালীমূর্ত্তি ধারণ করে রুদ্র ভৈরবকে জয় করলেন। দেবীর বাসর সজ্জার জন্য বিশ্বকর্ম্মা কৃষ্ণলীলাচিত্র সম্বলিত কাঁচুলি নির্ম্মাণ করে দিলেন। শিবদুর্গার বাসর হ'ল ও বাসরে দেবী বাগ্দিনী-বেশ ধারণ করলেন। দীর্ঘ বিরহের পর হরগৌরীর মিলনে বাসর সম্পূর্ণ হ'ল ও তাঁরা কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। ভিক্ষায় শিবের মাত্র আড়াই হালা ধান লাভ ও শিবের আদেশে তাতে অগ্নি সংযোগ করা হ'ল। দগ্ধ শস্য থেকে দেবীর কৃপায় ধরণীতে শস্য বাহুল্য হ'ল।

## রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর

## শিবসঙ্কীর্ত্তন, শিবায়ন বা শিবমঙ্গল

রামেশ্বর খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভূত কেশরকোণীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কবির প্রপিতামহের নাম নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, পিতামহ গোবর্দ্ধন, পিতা লক্ষ্মণ, মাতা রূপবতী ও ভ্রাতা শম্ভুরাম। কবির দুই পত্নী—সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। তাঁর আদি নিবাস মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রাম। পরে তিনি মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের কাছে অযোধ্যানগরে গিয়ে বসবাস ক'রেছিলেন। রামেশ্বর শিবায়ন রচনার আগে সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী রচনা ক'রেছিলেন। প্রাচীন

রীতি অনুসারে স্বরচিত শিবায়ন কাব্য মধ্যে স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন,—

"ভট্টনারায়ণ মুনি- সন্তান কেসরকনি
যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি গোবর্ধন চক্রবর্ত্তী,
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর,
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী,
অযোধ্যানগর নিকেতন॥
পূর্ব্ববাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে,
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত॥"

রামেশ্বর হেমৎসিংহ নামে কোন ভূস্বামীর দ্বারা উৎপীড়িত হ'য়ে গৃহত্যাগ ক'রে মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের সভাকবি নিযুক্ত হন। রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শিব ও শক্তি উপাসক রাজা যশোবন্তসিংহের ইচ্ছাতেই কবি 'শিব-সঙ্কীর্ত্তন' কাব্য রচনা করেন।

"রঘুবীর মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর॥
তস্য সুত যশোমন্ত- সিংহ সর্ব্বগুণযুত
শ্রীযুত অজিত সিংহের তাত।
মেদিনীপুর অধিপতি, কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥
রাজা রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ রূপে কাম,
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা জ্বলন্ত পাবকপ্রভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎকবি॥

দেবীপুত্র নৃপবরে স্মরণে পাতক হরে,
দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রয়ে করি ঘর
বিরচিল শিবসংকীর্ত্তন॥"

গ্রন্থমধ্যে মাঝে মাঝে তিনি আশ্রয়দাতার জন্য দেবতার কৃপাভিক্ষা করে লিখেছেন, "যশোবন্তসিংহে দয়া কর হর বধু। রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥" এই কাব্যের প্রকৃত নাম শিবসংকীর্ত্তন, তবে এটি মঙ্গলকাব্যের মতই আট দিনের ষোল পালায় বিভক্ত। গ্রন্থে রচনা কাল নির্দ্দেশক যে পদ আছে তা থেকে জানা যায় এই কাব্যটি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৩২ শকাব্দে) রচিত হ'য়েছিল। এই কাব্যের শিবের সঙ্গে শূন্যপুরাণে বর্ণিত শিব চরিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়। শিবসংকীর্ত্তনে কাহিনী অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি বিশেষ নেই। প্রচলিত নানা লৌকিক উপাখ্যানের সঙ্গে পুরাণোক্ত কাহিনীর সংমিশ্রণেই এরকম অদ্ভুত আখ্যায়িকার সৃষ্টি হ'য়েছে।

রামেশ্বরের কাব্য একান্তভাবে চাষীর কাব্য। রামেশ্বরের সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ছিল। বহুস্থানেই তিনি সংস্কৃত পুরাণ ও কালিদাসের কুমারসম্ভবম-এর ভাষানুবাদ করেছেন এই কাব্যে। তবে এই সমস্ত অনুবাদ অযথা সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দ এবং অনুপ্রাসে আড়ষ্ট হ'য়ে শ্রুতিকটু হ'য়েছে,—

"ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বান।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডী পানে চান॥
পদ্মাবতী পার্ব্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেইখানে॥
জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।
ভনে রামেশ্বর ভবে ভাবি রাত্রিদিবা॥"

কিন্তু এই কৃষকের কবি যেখানে সংস্কৃত আদর্শকে পরিত্যাগ করে নিজের সহজ কল্পনা ও মৌলিক সরল রচনাশক্তির উপর নির্ভর করেছেন সেই সমস্ত স্থানেই তাঁর অনাড়ম্বর সরস কবিত্বের এবং সহানুভূতিপূর্ণ মানবিক আবেদনের পরিচয় দিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের অল্প কয়েকজনের মধ্যেই দেখা যায়। এই কাব্যে বর্ণিত বিষয় দেবাদিদেব ও জগন্মাতার কৈলাস জীবন নয়— তখনকার বাঙ্গালী পরিবারের নিখুঁত আলেখ্য। দরিদ্রের সংসারে নিত্য অভাবের মাঝে একটু সুদিন আসায় পার্ব্বতী শাঁখা

পরার আকাঙ্খা প্রকাশ ক'রলেন। তাই নিয়ে দাম্পত্যকলহ যখন চরমে পৌঁছেচে গৌরী তখন পুত্রদুটিকে সঙ্গে নিয়ে পিত্রালয়ে যাত্রা করলেন,—

"দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়॥
কোলে করি কার্ত্তিকেরে হস্তে গজানন।
চঞ্চল চরণে হইল চণ্ডীর গমন॥
গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু।
শিব ডাকে শশীমুখী নাহি শুনে কিছু॥
নিদান দারুণ দিব্য দিল দেবরায়।
আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খায়॥
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী।
ভাষিল ভাই-এর কিরা ভবানীর প্রতি॥
ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে।
আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥
'যাও যাও যত ভাব জানা গেল' বলি।
ঠাকুরে ঠেলিয়া ঠাকুরানী গেল চলি॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে যায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায়॥
রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি।
পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি॥"

অন্নপূর্ণার কৌতুকপূর্ণ গৃহস্থালী বর্ণনায় একটি লোভী চিরদরিদ্র বাঙালী পরিবারের প্রশান্ত বাস্তব ছবি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। বৈরাগী শিবের ভিক্ষান্নে ধনীকন্যা পার্ব্বতী রন্ধন ক'রে উপবাসী স্বামী পুত্রদের পরিবেশন করছেন,—

"তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিনজনে একুনে বদন হল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিনজনে বারমুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥

দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি একপাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
সুক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য ধরে খা॥
মূষিকী মায়ের বোলে মৌন হ'য়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে॥
শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
দড়বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ॥
সিদ্ধিফল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥
উল্বণ চর্ব্বণে ফের ফুরাল ব্যঞ্জন।
এক কালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন॥
চটপট পিশিত মিশ্রিত কবি যূষে।
বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে॥
চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর।
রণরণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝণৎকার॥
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হইল সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দুমুখে মন্দমন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পঙ্‌ক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥"

সহৃদয় পাঠকের কাছে এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

# মনসামঙ্গল

## পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর সে মীমাংসা এখনও হয়নি। তবে রচনা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে মনসামঙ্গলই প্রাচীনতম বলে মনে হয়। এই কাহিনী যখন জন্ম নেয় সমাজপতি তখন ব্রাহ্মণেরা হ'লেও ধনী বৈশ্য বণিক্ সম্প্রদায় তখন দেশের কর্ণধার। তাঁরা কেউবা ছিলেন শৈব, কেউবা ছিলেন বৌদ্ধ। বাঙলা তখন বাণিজ্যে সমৃদ্ধ। বাঙালী বণিকেরা তখনও দেশে-বিদেশে পণ্যসম্ভার নিয়ে যেতেন। বাঙালীর তখনও 'ঘর-কুনো' অপবাদ রটেনি। দেশে তখন স্বাধীনতা ছিল, সাহস ছিল, শৌর্য্য ছিল আর ছিল ধন-সম্পদ। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে রচিত মনসামঙ্গল বা অপরাপর মঙ্গলকাব্যগুলি সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। কারণ সেগুলিতে পণ্য-বিনিময়ের হাস্যকর বর্ণনা, ঘর ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার ও সমুদ্রযাত্রার যে ভয়াবহ চিত্র দেওয়া হয়েছে, তা নিঃসন্দেহ অতিরঞ্জিত। সেন-বর্ম্মণ আমলে হিন্দুর সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্য রহিত হ'য়ে যাওয়াতেই বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে কিম্বদন্তী ও কল্পনার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তাই এ চিত্র-গুলিতে দেখা যায়, সুপ্রাচীন কালের দূরাগত স্মৃতি এবং তারই উপর সম-সাময়িক যুগের প্রলেপ।

মনসামঙ্গল জনসাধারণের জন্য রচিত সাহিত্য। সর্পপূজাকে উপলক্ষ্য করে এই সাহিত্যের জন্ম। তাই সমাজে সর্পপূজার ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক দেশের অরণ্য ও পর্ব্বতগুহাবাসী আদিম মানব ভয় ও বিস্ময়ের বস্তুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে দেবতারূপে পূজিত অনেক পশুপক্ষী সভ্যতার বিবর্ত্তনে দেবদেবীর বাহনরূপে কল্পিত হ'য়েছে।

সর্পপূজার উদ্ভব কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে হ'য়েছিল সে নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বিতর্কের অবসান হয়নি। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এবং এদেশে বিভিন্ন জাতীয় সর্পের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এই ভীষণ জীবের সঙ্গে ভারতবাসীরা আদিম যুগ থেকে সংগ্রাম ক'রেও এদের

উচ্ছেদ ক'রতে পারেনি। মহাভারতে বর্ণিত পরীক্ষিতের সর্পযজ্ঞ এমনিই এক যুদ্ধের মার্জ্জিত রূপ। ভয়ে-ভক্তিতে এই সর্পের পূজার প্রচলন এদেশের নিজস্ব হওয়া অসম্ভব নয়। আবার দক্ষিণ ভারতেই সর্প পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশী। "India is the only country in the world inhabited by all the known families of living snake . . . . on the whole, the wide distribution and loss of life caused by the snake in India warrant the conclusion that the cult is probably local . . . . . In no part of India is the cult more general than in Southern India." (W. Crooke—Serpent Worship, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. II).

এদেশের প্রাচীন বিশ্বাস যে পাতালবাসী চির-অমর সাপ পৃথিবীকে মাথায় ধরে রেখেছে। সাপ গর্ত্তে থাকে সেজন্য তাকে পাতালপুরীর অধিবাসী এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকতে পারে আর বার বার খোলস ছেড়ে নব কলেবর ধারণ করে বলে এদের অমর এবং পুনর্জ্জন্মবাদের প্রতীক মনে করা হয়ে থাকবে। আর্যভাষীদের প্রাচীনতম সাহিত্য সৃষ্টি হ'য়েছে ঋগ্বেদে। "ঋগ্বেদের প্রাচীনতম কবিতাগুলির রচনা কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ অব্দের পরে নহে। এই গুলিই হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাবর্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন।" (ভাষার ইতিবৃত্ত, ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন)। এই ঋগ্বেদের কোন কোন শ্লোকে 'সর্প' 'অহি' 'অহিবুধ্ন্য' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। এর অনেক কাল পরে রচিত যজু ও অথর্ব্ববেদের যুগে সমাজে সর্প-পূজা প্রচলিত হওয়ায় সাপের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি মন্ত্র রচিত হ'য়েছিল। অথর্ব্ববেদে দেখা যায় বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী সর্পবিষমোচয়িত্রী এবং শবর-কন্যা বলে উল্লিখিতা হ'য়েছেন। মহাভারতে (আদিগ্রন্থের রচনাকাল খৃী-পূ চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দ) নাগ* অথবা সর্প একটি সম্প্রদায় রূপে বর্ণিত হ'য়েছে।

---

* ফার্গুসন সাহেবের সিদ্ধান্ত এই যে, খৃীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতক থেকে আরম্ভ করে অন্তত খৃীষ্টোত্তর চতুর্থ শতক পর্য্যন্ত মধ্যভাবতের বিভিন্ন স্থানে ও রাজপুতানায় নাগ বংশের রাজত্ব ছিল। এদের জাতীয়-চিহ্ন বা ধ্বজ-চিহ্ন ছিল সর্প।

খৃীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক থেকে খৃীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের মধ্যভাগের মধ্যে উৎকীর্ণ অজন্তার ঊনিশ সংখ্যক চৈত্যের প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ-পার্শ্বে সপ্তফণা সর্প-ছত্রেব নীচে নাগরাজ এবং একটি ফণা সর্প-ছত্রের নীচে নাগরাণীর অপরূপ সুন্দর প্রস্তব মূর্ত্তি আছে। কলিকাতা সরকারী শিল্প শিক্ষায়তনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব (E. B. Havell) তাঁর The Ideals of Indian Art পুস্তকে মনে করেন, যে ভারতের আদিম সর্প

সম্ভবত অনার্য্য দ্রবিড়ভাষীদের কোন কোমের জাতীয়-চিহ্ন (Totem) ছিল সর্প। মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায় আর্য্য(?) ঋষি কশ্যপের ঔরসে অনার্য্যা(?) কদ্রুর গর্ভে নাগরাজ বাসুকি প্রভৃতির জন্ম হয়। জরৎকারু (মনসা) এই বাসুকির ভগ্নি। "মহাভারতের পাত্র পাত্রী সম্বন্ধে এ কথাও বলা যেতে পারে, যে তাঁরা আর্য্যপূর্ব্বযুগের মানুষ—মহাভারতের মূল আখ্যান অনার্য্য রাজাদের নিয়ে, পরে অনার্য্যজাতির নবাগত আর্য্যজাতির সঙ্গে মিশ্রণের আর ভাষায় তাদের আর্য্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই উপাখ্যানও পরিবর্ত্তিত হ'ল, পল্লবিত হ'ল, শেষে আমাদের সংস্কৃত মহাভারতে দাঁড়িয়ে গেল, খ্রীষ্ট-জন্মের কাছাকাছি কোনও সময়ে—আর আর্য্যানার্য্যমিশ্র হিন্দু জাতির এক সাধারণ জাতীয় সম্পত্তি হ'য়ে গেল।" (ভারত সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতার পত্তন,—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)।

মিশরের সভ্যতার পত্তন হ'য়েছিল প্রায় ছ'হাজার বছরেরও আগে। মিশরে সর্পপূজা বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিশরের রাজকীয় শিরস্ত্রাণ ছিল সর্প-লাঞ্ছিত। কোন কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুমান করেন, খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে সর্পপূজা সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হয় মিশরদেশে। সেখান থেকেই নাকি এই সর্পপূজা ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিখ্যাত পণ্ডিত ফার্গুসন্ (J. Ferguoson) তাঁর "Tree and Serpent Worship" গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন, যে ইউফ্রেটিস্ নদীতীর বাসী প্রাচীন তুরাণী জাতির মধ্যে অন্যান্য জীবজন্তুর পূজার সঙ্গে সাপের পূজাও সর্ব্বপ্রথম উদ্ভূত হয়। এরা বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করায় এদের সর্পপূজাও নানা দেশে বিস্তৃত হয়।

এই তুরাণী জাতির একটি শাখাই আর্য্যভাষীদের আগে ভারতবর্ষে আসে এবং কালক্রমে দ্রাবিড় নামে পরিচিত হয়। দ্রবিড়ভাষীদের সম্বন্ধে পণ্ডিত-গণের অনুমান যে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসার কয়েক হাজার বছর আগে পশ্চিম

---

উপাসক কিছু লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পরও প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী এই মূর্ত্তিগুলি সৃষ্টি ক'রেছিল।

দাক্ষিণাত্যের মামল্লপুরমের বিখ্যাত মন্দিরে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আছে। কাঞ্চীর পল্লববংশীয় রাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্ম্মণের (৬০০-৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ) সময়ে উৎকীর্ণ অর্জ্জুনের তপস্যা নামে বিখ্যাত মূর্ত্তির চাল-চিত্রে পাতাল থেকে উত্থিত (নিম্নার্দ্ধ সর্প এবং উপরার্দ্ধ নর-নারী) নাগ-নাগিনীর সুন্দর মূর্ত্তি আছে। খ্রী-পূ দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে, সাতবাহন রাজাদের সময়ে, উৎকীর্ণ মধ্যপ্রদেশের অমরাবতীর ভাস্কর্য্যেও এই ধরনের মূর্ত্তি দেখা যায়। এগুলি প্রাচীন পৌরাণিক কথাকে অবলম্বন করে খোদিত।

সীমান্ত পথে এরা দলে দলে ভারতবর্ষে এসেছিল। এরা প্রথমে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বসবাস আরম্ভ করে এবং পরে উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে।

'বৈদিক আর্য্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের'। যাযাবর আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে বসবাস করার পর অষ্ট্রিকভাষী ও দ্রবিড়ভাষী অনার্য্যদের সংস্পর্শে আসে এবং ক্রমশ উক্ত দুই সভ্যতাকে গ্রহণ করে নূতন রূপে প্রকাশ করে। অষ্ট্রিকভাষীরা কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল এবং এদের সভ্যতা ছিল একান্তভাবে গ্রামীণ। ভারতবর্ষের নাগর-সভ্যতা সর্ব্ব প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল দ্রবিড়ভাষীদের মধ্যে।—"হিন্দু সভ্যতার বাহ্য অনেক উপকরণ এই দ্রাবিড়দেরই কাছ থেকে আহৃত; শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনা ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগ-সাধনার মূল-তত্ত্বও দ্রাবিড়দের মধ্যেই উদ্ভূত হয় ব'লে মনে হয়। মোহেন-জো-দড়ো আর হড়প্পার বিরাট্ সভ্যতা দ্রাবিড় জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক ব'লে বোধ হয়।... ভারতের সভ্যতায় দ্রাবিড়ের আহৃত উপাদান আর্য্যের দানের চেয়ে অনেক বেশী বলিয়াই মনে হয়।" (ভারত সংস্কৃতি)

আর্য্যদের দেব কল্পনায় জীবজন্তু, লিঙ্গপূজা এবং স্ত্রীদেবতার পূজার কোন স্থান ছিল না। এগুলি তাঁদের কাছে ঘৃণার বস্তু ছিল। সিন্ধু-উপত্যকায় মোহেন-জো-দড়ো আর হড়প্পার প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দ্রবিড়ভাষাভাষীদের বিরাট্ সভ্যতার যে নিদর্শন মিলেছে তাতে জানা যায়, যে সেদেশে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সর্প (জীবজন্তু) পূজা, লিঙ্গ (পুরুষ-প্রকৃতি অথবা শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনি) পূজা, এবং মাতৃকা (স্ত্রীদেবতা, পরবর্ত্তীকালে শক্তি) পূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল। এখন আমাদের ধারণা করা অনুচিত হবে না যে দ্রবিড়ভাষীদের ধর্ম্ম বিশ্বাস থেকেই সর্পদেবী মনসার পূজা ভারতবর্ষে—বিশেষ করে অনার্য্য প্রধান দাক্ষিণাত্যে ও বাংগলা-দেশে—প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল।

"সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব, এ তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোনো না কোনো রূপে সর্প পূজার প্রচলন ছিলই। বাংলা দেশে যে-সব মনসাদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানব-শিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের

প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক।...প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, পাল-আমলের প্রথম পর্বেই মনসাদেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পূজিতা ও স্বীকৃতা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।...ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাংলাদেশে মনসা-পূজার বহুল প্রচলন হয় দক্ষিণী সেন-বর্মণ রাজাদের আমলেই।" (বাঙালীর ইতিহাস)

তান্ত্রিক বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের সাধনমালায় জাঙ্গুলী অথবা জাঙ্গুলী-তারা নামে সর্পবিষমোচয়িত্রী এক দেবীর সাধন পদ্ধতি বর্ণিত আছে। মনসা-মঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিপ্রদাসের মতে মনসার এক নাম 'জাগুলি'। অথর্ব্ব বেদে যাদুমন্ত্র, যাদুপ্রক্রিয়া, সাধনমন্ত্র প্রভৃতি রহস্য-মূলক বিষয় ও বিধিবিধান নিবদ্ধ আছে। এই বেদে অলৌকিক শক্তিসম্পন্না সর্পবিষনাশিনী অরণ্যবাসিনী এক শবর কুমারীর কথা আছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন, গুণসাম্যের জন্য এই শবর কন্যাই কালক্রমে বৈদিক সিতসরোজবাসিনী বীণাপাণি সর্ব্বশুক্লা দেবী সরস্বতী, তৎপরে বৌদ্ধ তন্ত্রে সর্ব্বশুক্লা সিতরত্নালঙ্কার মণ্ডিতা শুক্লসর্প-বিভূষিতা বীণাবাদিনী জাঙ্গুলী দেবী এবং আরও পরে বাঙ্গলাদেশে সর্পদেবী মনসা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একটি ধ্যানে মনসা ও সরস্বতী এই দুই দেবীকে অভিন্না বলে কল্পনা করা হয়েছে। মরালবাহনা সরস্বতীদেবীর ন্যায় মনসাদেবীকেও পঞ্জিকার ধ্যানমন্ত্রে হংসারূঢ়া দেখা যায়।

মনসাদেবীর নামটি কোন ভাষা থেকে এসেছে তা সঠিক বলা যায় না। তবে দাক্ষিণাত্যের তেলেগু ও কানাড়ী ভাষী লোকেদের 'মঞ্চী' বা 'মঞ্চাম্মা' নামে সর্পদেবীর নাম লোকমুখে বিকৃত হ'য়ে বাঙ্গলাদেশে মনসা নামের উৎপত্তি হ'য়েছে বলে অনেকেই অনুমান করেন। মঙ্গলকাব্যে মনসা শিবের মানস-কন্যা রূপে কল্পিতা সেজন্য তাঁর নাম মনসা বলা হ'য়েছে; আর পদ্মবনে তাঁর জন্ম তাই তাঁর আর এক নাম পদ্মাবতী।

বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে এবং সমীপবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ থেকে অনেক-গুলি মনসামূর্ত্তি পাওয়া গেছে। প্রাচীনতম মূর্ত্তিগুলি খৃষ্টীয় দশম শতকে অথবা তৎপূর্ব্বেই নির্ম্মিত হ'য়েছিল ব'লে অনুমিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত এমনি একটি প্রাচীন মনসা মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি কোটালীপাড়ায় প্রাপ্ত এবং আনুমানিক দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। আলোচ্য মূর্ত্তিটি ত্রিনয়না এবং দ্বিভুজা। মধুর-স্মিতহাসিনী দেবী প্রফুল্ল কমলাসনে আসীনা। শিরে রত্নমুকুট। মস্তকোপরি সর্পের সাতটি ফণা বিস্তারিত; তারও উপরে একটি পদ্ম। বামহস্তের

মুষ্টিতে ধৃত একটি ফণা যুক্ত সর্প। দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা। দক্ষিণচরণ সমৃণাল পদ্মের উপর স্থাপিত। অঙ্গে বহুবিধ সর্পের অলঙ্কার। আসনের নিম্নভাগে দেবীর বাম পার্শ্বে মঙ্গলঘট। দেবীর দুই পার্শ্বে দু'টি মূর্ত্তি—দক্ষিণ পার্শ্বের পুরুষ মূর্ত্তিটি সম্ভবত জরৎকারু মুনির; বামপার্শ্বেরটি স্ত্রীমূর্ত্তি, নেতার হওয়া অসম্ভব নয়।

রাজসাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির' প্রত্নশালায় অনেকগুলি মনসা মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। এই মূর্ত্তিগুলির কয়েকটির বামপার্শ্বে উপর দিকে ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই পাল ও সেন পর্ব্বের বাঙলার। কলিকাতা ও ঢাকার প্রদর্শশালায় এই যুগের অনেকগুলি মনসা মূর্ত্তি আছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত পদ্মাপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে মনসার নাম আছে। কিন্তু বাঙলা দেশের মনসামঙ্গলে বর্ণিত বেহুলার কাহিনী কোন পুরাণে পাওয়া যায় না। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষার্দ্ধে মনসার গান ছড়ার আকারে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে গীত হ'ত। দ্বাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে এই লোকমুখে প্রচলিত গানগুলিকে সুসংবদ্ধ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হ'য়ে থাকবে। তারপর থেকে পরবর্ত্তী কবিরা ঐ কাহিনীর উপর নানা রঙের তুলি বুলিয়েছেন। কোন কোন ক্ষমতাবান কবি মৌলিক কাহিনী ও ভাবের সংযোজন করে পুঁথির আকার বৃদ্ধি করেছেন। পরবর্ত্তীকালে উন্নততর সমাজে রামায়ণ মহাভারত ও বিবিধ সংস্কৃত পুরাণের কাহিনী ও ভাব এর গল্পে সংযোগ করে মনসামঙ্গলে কৌলিন্য আরোপের চেষ্টাও হ'য়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি হ'য়েছে রাঢ়দেশে। পশ্চিমবঙ্গের কবিদের কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা উপলক্ষ্যে ভৌগলিক বিবরণে যথাযথ বর্ণনা মেলে। পূর্ব্ববঙ্গের কবিদের রচনায় এই বিবরণে সঙ্গতি বিশেষ নেই; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা কল্পনা ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেছেন। তবে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলই—বিশেষ করে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে—সর্ব্বাধিক প্রচারিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল। এর কারণ অনেকগুলি। নদনদী প্লাবিত পূর্ব্ববঙ্গ অসংখ্য সর্পের আবাস ভূমি; আর সর্পভীতি থেকেই হ'য়েছে এ কাব্যের উৎপত্তি ও প্রচার। মনসার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ভাসান রচক পূর্ব্ববঙ্গের লোক। পশ্চিম বঙ্গে সর্পভীতি সে তুলনায় কিছু কম। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য মনসামঙ্গলের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা করত; আর সে অঞ্চলে ষোড়শ শতাব্দীর পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নত আদর্শ এবং বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থের মত অনেক উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্ট হওয়ায় মনসামঙ্গল ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় নিছক গ্রাম্য-সাহিত্যের আদর কমে যায়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে উন্নততর সাহিত্যের অভাবে, সর্পভীতির জন্য এবং কিছুটা সংস্কৃতি-হীনতার জন্যও মনসামঙ্গলই সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্য হ'য়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও মনসামঙ্গলের অনুরূপ গল্প প্রচলিত আছে। তবে বাঙলাদেশেই এই কাব্যের সমাদর সবচেয়ে বেশী। বাঙলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি এই কাহিনী রচনায় লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁদের হাতে মনসামঙ্গলের চরিত্রগুলি প্রত্যেকটি বাস্তব ও আদর্শের মিশ্রণে অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠেছে। সনকা বাঙালী মায়ের রূপ। সতী শিরোমণি, বেহুলার চরিত্রে বাঙালী বধূর অপরিসীম দুঃখ সহনশীলতা ও মৃদুতার সঙ্গে নির্ভীক তেজস্বিতা মিশেছে। আর এ কাহিনীর প্রধান চরিত্র, বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি মৃদু, দৈব-লাঞ্ছিত চাঁদ সদাগর যেন দৈবের কাছে পদে পদে দলিত অবমানিত অসহায় মানবের একমাত্র বিদ্রোহী প্রতিনিধি। সমগ্র বাঙলা সাহিত্যেও এই চরিত্রের সমকক্ষ চরিত্র আর দ্বিতীয় নেই। মনসার চরিত্রে বিন্দুমাত্রও দেবত্ব প্রকাশ পায়নি। স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য তিনি হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্তা। আর আর যে সমস্ত দেবদেবীরা পদ্মাপুরাণে ভীড় ক'রে আছেন তাঁরা যন্ত্র-চালিত কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ। মনসামঙ্গল প্রকৃত পক্ষে কোন দেব-দেবীর কাহিনী নয়—অলৌকিক ঘটনা ও ঐশীশক্তির কুহেলিকার আবরণে অসহায় মানুষেরই চিরন্তন কথা। এমন মানবীয় আবেদন আর কোন মঙ্গল-কাব্যেই বিরল। সর্ব্বোপরি মনসামঙ্গল করুণ রসের আকর। এই গানে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। করুণরস বাঙালীর প্রিয়, তাই মনসামঙ্গল সহজেই তাদের হৃদয় হরণ করে।

অনেকে মনে করেন মনসামঙ্গলের কাহিনী ঐতিহাসিক। বাঙলা, আসাম ও বিহার প্রদেশের বহু জেলার অনেকেরই নিশ্চিত বিশ্বাস যে চাঁদ বেণে তাঁদের অঞ্চলের লোক। বাঙলা দেশে প্রাচীন ভগ্নস্তূপের অভাব নেই। নেতা ধোপানীর ঘাট, চাঁদ সদাগরের ভিটা ও লখীন্দরের বাসরের ভগ্নস্তূপও বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি নির্দ্ধারিত হ'য়ে থাকে। চণ্ডীমঙ্গলেও চাঁদ সদাগর সম্ভ্রান্ত বণিক রূপে উল্লিখিত হয়েছেন, অনেক পালা গানে তাঁর উল্লেখ আছে, তাঁর প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও ত্রিবেণীর পারে প্রাসাদোপম অট্টালিকার বর্ণনাও

দুর্লভ নয়। এ সমস্ত থেকে অনেকের বিশ্বাস যে বেহুলার উপাখ্যান সত্য-ঘটনা। অনেকেই অনুসন্ধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর "বেহুলা" পুস্তক রচনাকালেও বোধহয় এই কাহিনীকে সত্যঘটনামূলক বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখেছেন,—"আমাদের বিশ্বাস চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনামূলক।......কিন্তু চাঁদসদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্যমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই যে, যাঁহারা শৈবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্ম্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদসদাগর তাঁহাদের এক দলের নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনসার সেবকের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চাঁদসদাগর ও বেহুলার প্রতিবিম্ব গাঢ়তর হইয়া সজীব চিত্রের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে দাঁড়াইল।......চাঁদসদাগর নামে কোন প্রথিতনামা বণিক বঙ্গদেশে এক সময় বৈশ্যকুলের অগ্রণী ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রবধূ বেহুলা সতী-শিরোমণি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই উজানী নগর, গাঙ্গুর ও চম্পানগর কোথায় ছিল, কে বলিবে? বঙ্গদেশের বহুস্থান হইতে তাঁহাদের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলির উপর দাবী পড়িয়াছে—এই দাবী কোন্ ঐতিহাসিক বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিবেন?"

দীনেশবাবুর এই মত অনেকটা নির্ভরযোগ্য।

বাঙগলা পদ্মাপুরাণের গল্প কোন প্রদেশে প্রথম উদ্ভূত হ'য়েছিল তা বলা কঠিন। অনেকের মতে বাঙগলাদেশেই এ কাহিনীর জন্ম। আবার কারও কারও মতে এ কাহিনী দাক্ষিণাত্য থেকে আমদানি। এবং সেদেশে প্রচলিত সর্পদেবী অম্বাবরুর আখ্যানের রূপান্তরে মনসামঙ্গলের কাহিনীর উদ্ভব হ'য়েছে। কিন্তু আশুতোষবাবু তাঁর "বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস"এ নানা জটিল সমস্যা আলোচনা ক'রে লিখেছেন,—"বিহারে প্রচলিত 'বিহুলা-বিষহরী'র গল্পের প্রকৃতি ও প্রাচীন বাংলা পদ্মাপুরাণের কবিদিগের নানা প্রসঙ্গে বিহারের উল্লেখ ইত্যাদি হইতে এই গল্প যে বিহারেই সর্ব্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল এমন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।" ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ও "প্রাচীন বাংলা লেখকগণ" প্রবন্ধে লিখেছেন,—"গল্পটি বিহার থেকে এ দেশে এসেছিল। কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃতে এই বিষয়ে একখানি বই লিখেছেন। এখনও বিহারী ভাষায় এই উপাখ্যান প্রচলিত আছে।"

## মনসামঙ্গলের আখ্যান ভাগ

গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে যথাবিধি শিবদুর্গার কাহিনী। শিবের নেত্রের ঘর্ম্মে নেতার জন্ম। পদ্মবনে শিবের মানসকন্যা মনসার জন্ম বিবরণ। মহাভারতের নাগ কাহিনীর সঙ্গে সংযোগস্থাপন, জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ, আস্তীকের জন্ম। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিষহরীর পূজা। হালিক, জালিক ও মুসলমানদের মধ্যে মনসার পূজা। এরপর তৃতীয় ভাগে মূল কাহিনীর আরম্ভ।

মর্ত্ত্যে মনসাদেবীর পূজা প্রচারের জন্য দেবীর অভিশাপে পরম শৈব চন্দ্রদেব চম্পকনগরে জন্মগ্রহণ ক'রে চাঁদসদাগর রূপে খ্যাত হ'লেন। তাঁর স্ত্রী সনকা গোপনে ঘট পেতে মনসার পূজা করেন। চাঁদ সে কথা জানতে পেরে পদাঘাতে মনসার ঘট ভেঙ্গে দিলেন,—শিব ছাড়া অন্য দেবতাকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না। মনসার রোষবহ্নিতে চাঁদের ছয় পুত্র প্রাণ-ত্যাগ ক'রল। পদ্মার প্রতি ঘৃণায় তিনি তাদের অবিলম্বে জলে ভাসিয়ে দেবার আদেশ দিলেন,—"কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র শীঘ্র কর পার।" (দ্বিজ বংশী-দাস)। অসংখ্য নরনারী সাপের বিষে প্রাণ হারাল, গুয়াবাড়ী ধ্বংস হ'ল, চাঁদের 'মহাজ্ঞান' হৃত হ'ল, সপ্তডিঙ্গা মধুকর জলমগ্ন হ'ল, পুত্রশোকাতুরা সনকা, ছয় বিধবা পুত্রবধূ ও প্রজাবর্গের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে নগর শ্মশানে পরিণত হ'ল। এইরূপ শত দুঃখ বিপর্য্যয়েও চাঁদ অবিচলিত,— আদর্শে অটল,—পুরুষকারে বিশ্বাসী। তিনি বল্লেন,—

> "যে কাঁদে আমার হেথা মুড়াইব তার মাথা
> দেশেতে রাখিয়া নাহি কাজ।
> কাতর করুণা-ধ্বনি, শুনিয়া হাসিবে কাণী,
> তাহাতে হইবে মোর লাজ॥"—(দ্বিজ বংশীদাস)

স্বপ্নাদেশে সনকা মনসার পূজা ক'রে পুত্রবর লাভ ক'রলেন। স্বর্গের অনিরুদ্ধ সনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রলেন,—তাঁর নাম হ'ল লক্ষীন্দর। অনিরুদ্ধের পত্নী ঊষা সায় বেণের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ ক'রলেন। অনুপম রূপ ও গুণবতী এই কন্যার নাম বেহুলা।

এদিকে চাঁদ সদাগর পুত্রশোক ভোলার জন্য, সকলের অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে, পথের বিপদকে অগ্রাহ্য ক'রে চৌদ্দডিঙ্গা সজ্জিত ক'রে বাণিজ্যে

গিয়েছিলেন। পাটনে সামান্য বস্তু বহুমূল্য দ্রব্যে বিনিময় ক'রে দেশে ফিরছেন। দেবীর ইচ্ছায় অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রে ঝড় উঠল'। উত্তালতরঙ্গময় সাগরে চাঁদের সমস্ত নৌকাগুলি জলমগ্ন হ'তে উদ্যত। মনসা মেঘের আড়াল থেকে সদাগরকে জানালেন যে শুধু একমুঠো ফুল তাঁর চরণে অর্ঘ্য দিলেই চাঁদের মৃত পুত্রেরা পুনরুজ্জীবিত হবে, তিনি সমস্ত সম্পদ ফিরে পাবেন এবং বর্ত্তমান বিপদ হ'তেও ত্রাণ লাভ ক'রবেন।

> "এত যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর।
> হেঁতালের বাড়ি স্কন্ধে কাঁপে থর থর॥
> মনেতে ভাবিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া।
> সাহস যদ্যপি থাকে কহ আগু হৈয়া॥
> মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার।
> তবে কেন কাণা আঁখির ঔষধ না কর॥"—(বিজয় গুপ্ত)।

এই কটূক্তি পদ্মার অসহ্য হ'ল। তাঁর ক্রোধে নিমেষে প্রবল ঝটিকা ও তুফানে নৌকাগুলিসহ চাঁদ জলমগ্ন হ'লেন। অর্দ্ধ-অচৈতন্য চাঁদ সমুদ্রের জলে ভাসছেন। তাঁর মৃত্যু হ'লে দেবীর পূজার প্রচার হয়না, তাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার গরজ মনসার। দেবী সমুদ্রে মজ্জমান চাঁদকে সাহায্য করার জন্য কতকগুলি পদ্মফুল নিক্ষেপ ক'রলেন। বিদ্যুতের আলো-আঁধারীতে মজ্জমান চাঁদ কিছু একটা আশ্রয়ের আশায় এই ফুলগুলির দিকে হাত বাড়ালেন। হস্তস্পর্শে পদ্মফুল ব'লে জানতে পারায়—এই ফুলের সঙ্গে পদ্মাবতী নামের সংস্পর্শ হেতু—মুহূর্ত্তে ঘৃণায় হাত সরিয়ে নিলেন।

কোনমতে নিজের চেষ্টায় চাঁদ তীরে এসে পেঁছিলেন। তিন দিনের উপবাসী, হৃতসর্ব্বস্ব চাঁদ এক বন্ধুগৃহে আশ্রয় পেলেন। উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত—আসনে উপবেশন করে ক্ষুধার্ত্ত চাঁদ গণ্ডূষ ক'রতে যাবেন এমন সময় বন্ধুটি মনসার সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত ক'রতে উপদেশ দিলেন। ক্রুদ্ধ চাঁদ তৎক্ষণাৎ ভোজ্যদ্রব্যে পদাঘাত ক'রে ব'লে উঠলেন,—"বর্ব্বর ভাড়ায়ে খাও কাণি"—পরমুহূর্ত্তেই তিনি সে গৃহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন।......কলার কটি খোসা পথে কুড়িয়ে পেয়ে, তাই আহার ক'রে চাঁদ ক্ষুধা নিবৃত্তি ক'রলেন। চাঁদ এইভাবে বারে বারে মনসার অনুগ্রহের দানকে ঘৃণায় পরিত্যাগ ক'রে গেছেন।

বহু দুর্দ্দশা ভোগ ক'রে দীর্ঘকাল পরে চাঁদ দেশে ফিরলেন। শেষ ও সপ্তম পুত্র লখীন্দর বড় আদরের। কালক্রমে চাঁদ মহা সমারোহে তার বিবাহের উদ্যোগ ক'রলেন। বিবাহ রাত্রেই লোহার বাসরে মনসার প্রেরিত সর্পের দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু হ'ল। দুঃখে শোকে সনকা উন্মত্তা হ'লেন। কিন্তু চাঁদের চোখে অশ্রুবিন্দু নেই। তাঁর ভ্রুকুটিকুটিল ললাটে পরিতাপের চিহ্নটুকুও দেখা যায়না। ক্রোধোন্মত্ত চাঁদ মনসাকে বধ করার জন্য শুধু হেন্তালের লাঠিটি তুলে প্রস্তুত হ'লেন।

আত্মীয় স্বজনের সহস্র অনুরোধ অশ্রুজল উপেক্ষা ক'রে লক্ষীন্দরের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী বেহুলা সামান্য ভেলায় স্বামীর শবদেহ নিয়ে গাঙ্গুরের জলে অজানা পথে ভেসে পড়লেন। পতিকে পুনর্জ্জীবিত ক'রে ফিরবেন এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।......দুর্গম পথে কত প্রলোভন, কত বিপদ। ছ'মাস লখীন্দরের গলিত শব বক্ষে ক'রে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে, বহু ভয় ও প্রলোভনে অবিচলিত থেকে বেহুলা নেতা ধোপানীর সাহায্যে দেবলোকে পেঁছিলেন। বেহুলার অপরূপ নৃত্যে তুষ্ট হ'য়ে মহাদেব বর দিতে চাইলেন। বেহুলার একমাত্র প্রার্থনা স্বামীর পুনর্জ্জীবন। শিবের আদেশে মনসা লখীন্দর, চাঁদের আর ছয় পুত্র ও অপরাপর লোক জনের জীবন দান ক'রলেন। ডিঙ্গাগুলিও ভেসে উঠল। বিনিময়ে মনসা চাইলেন চাঁদের দ্বারা তাঁর পূজার স্বীকৃতি। বেহুলা প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সতী বেহুলা সমস্ত হৃত স্বজন-সম্পদ পুনরুদ্ধার ক'রে দেশে ফিরলেন। চাঁদ তবু অটল। তিনি অবজ্ঞাভরে বল্লেন,—

"যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পূজিব পুণি চেংমুড়ি কাণী॥" (বিজয় গুপ্ত)

সর্ব্বস্ব যায় যাক, তবু যে হাতে তিনি আজীবন 'দেব শূলপাণি'র পূজা ক'রেছেন সেই হাতে 'চেংমুড়ি কাণী' মনসার পূজা তিনি ক'রবেন না।

শেষ পর্য্যন্ত চাঁদকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। কিন্তু এ পরাভবেও চাঁদের চরিত্র অম্লান অক্ষুণ্ণ রইল। কারণ এ পরাজয় লোভের কাছে নয়, দুঃখ শোকের কাছে নয়,—দুর্ব্বার নিয়তির কাছেও নয়। এ পরাজয় স্নেহের কাছে,—বেহুলার সাধনার কাছে। যে বিরাট্ বনস্পতি শত ঝঞ্ঝা বজ্রপাত নীরবে সহ্য ক'রেছে,—শত বিপদে নিঃসঙ্গ সংগ্রামে একটি কেশাগ্রও যাঁর বিচলিত হয়নি, সেই চাঁদ নত হ'লেন পতিব্রতা সাধ্বী পুত্রবধূ বেহুলার সাধনা ও স্নেহের

কাছে। তিনি বেহুলার অনুরোধে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বামহস্তে বিষহরীর পায়ে একমুঠো ফুল ফেলে দিতে রাজী হলেন। মনসা এতটাও প্রত্যাশা করতে পারেননি। তিনি সানন্দে পূজা গ্রহণ করতে এলেন, কিন্তু চন্দ্রধরের হাতে হেমতালের কঠিন লাঠিগাছটি দেখে ভয়ে মণ্ডপে নামতে সাহসী হ'লেন না। সভয়ে বল্লেন,—

"যদি মোর পূজা করিবে চাঁদ বেণে।
হেংতালের বাড়িগাছি আগে ফেল টেনে॥" (ক্ষেমানন্দ)

এ কথা শুনে চাঁদ সহাস্যে অভয় প্রদান ক'রলেন। তবু দেবীর শঙ্কা যায়না। বেহুলা তখন সবিনয়ে শ্বশুরের হাত থেকে লাঠিটি নিয়ে দূরে ফেলে দেবার পর দেবী পূজামণ্ডপে নেমে চাঁদের বাম হস্তের পূজা গ্রহণ ক'রলেন।

মনসাদেবীর পূজা মর্ত্ত্যে প্রচারিত হ'ল। চন্দ্রধর চন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন। বেহুলা-লখীন্দর ঊষা-অনিরুদ্ধ রূপে স্বর্গে গেলেন।

## মনসামঙ্গলের কবিগণ

এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক মনসার ভাসান রচকের নাম পাওয়া গেছে। এ ছাড়া গায়কের সংখ্যা আরো অনেক বেশী। হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রমুখ কবিগণের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

## হরিদত্ত

মনসামঙ্গলের প্রথম কবি 'কাণা হরিদত্ত' নামে পরিচিত। তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক। অনেকের অনুমান তিনি ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন এবং সেন-রাজত্বের শেষ সময়ে ও তুর্কীগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের ঠিক আগেই মনসামঙ্গল রচনা ক'রেছিলেন। দীনেশবাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখেছেন, "সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন।" আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, হরিদত্ত খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথমার্দ্ধে কাব্য রচনা করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে

কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর পদ্মাপুরাণের স্বপ্নাধ্যায় পালায় কাণা হরিদত্তকে এই কাব্যের আদি কবি বলে উল্লেখ করেছেন,—

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥" (বিজয়গুপ্ত)

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী এই কবির নামোল্লেখ তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে করেননি। হরিদত্তের রচনার অত্যন্ত অশিষ্ট ও বিরুদ্ধ সমালোচনা করে দেবী বিষহরীর জবানীতে বলেছেন,—

"হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥"
(বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, স্বপ্নাধ্যায় পালা)

ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলা থেকে হরিদত্তের রচনার সামান্য নিদর্শন যা আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে তা কিন্তু বিজয়গুপ্তের অভিমতের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় ময়মনসিংহ জেলার দিঘপাইৎ গ্রামে মনসামঙ্গলের একখানি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেন। তাতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা পাওয়া গেছে। কবিতাটিতে 'পদ্মার সর্প সজ্জা' বর্ণিত হয়েছে,—

"দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিঁথের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥

পদ্মনাগে কৈল দেবির সুন্দর কিংকিণী।
বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালি কাঁচুলী॥
কণক নাগে কৈল কর্ণের চাকি বলি।
বিঘতিয়া নাগে দেবির পায়ের পাশুলি॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে জার অগ্নি কণা কণা॥
অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়।
চন্দ্রসূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥"

পরবর্ত্তী অনেক কবি হরিদত্তের রচনার অনেক অংশে নিজেদের ভণিতা যোগ করে দিয়েছেন। প্রাচীন পুঁথির লিপিকার, আখ্যায়ক ও গায়েনদের কারসাজিতেও এই প্রমাদ ঘটেছে।

### নারায়ণ দেব

ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামের অধিবাসী নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বাঙালী ছিলেন। প্রায় দেড়শ' বছর আগে কবির জন্মভূমি বোরগ্রাম শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। সেজন্য বাঙলা ও আসাম উভয় প্রদেশের লোকই কবির উপর দাবী করে থাকেন। আসামে পদ্মাপুরাণের নাম সুকনান্নি। শব্দটি আসলে নাকি সুকবি নারায়ণী। এ থেকেও অসমীয়া সাহিত্যে নারায়ণ দেবের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অনুমান করা যায়।

নারায়ণ দেবের কাব্য বাঙলা ও আসাম প্রদেশে বহুল প্রচলিত হয়েছিল। অসমীয়া ভাষাতেও নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। সেজন্য অসমীয়া সাহিত্যের প্রাচীন কবিগণের মধ্যে নারায়ণ দেবেরও নাম উল্লিখিত হয়। আজ পর্য্যন্ত আগাগোড়া নারায়ণ দেবের ভণিতাযুক্ত কোন সম্পূর্ণ মনসামঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায়নি। বিভিন্নকালে বহুহস্তের বর্ণক্ষেপ—বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা—তাঁর কাব্যে আত্মগোপন করে আছে। এর মধ্য থেকে শুধু নারায়ণ দেবের রচনাটুকু বেছে নেওয়া দুরূহ। এই জন্য এবং আরও নানা অসুবিধায় নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলের কোন নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত পুঁথির একান্ত অভাব। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ্-ডি, মহাশয়ের সম্পাদনায় 'সুকবি

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ' প্রকাশিত হ'য়ে এই অভাব অনেকটা দূর হয়েছে। এ পর্য্যন্ত নারায়ণ দেবের যতগুলি অমুদ্রিত ও মুদ্রিত পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে এইটিই সবচেয়ে প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ।

নারায়ণ দেবের যথার্থ কাল নির্ণয় করা যায়নি। অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ ক'রেছেন। কারও অনুমান নারায়ণ দেব শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী,—আসামে প্রচলিত নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলের বাঙ্গলা ও আসামী সংস্করণে চৈতন্যদেবের একটি বন্দনা পাওয়া যায়। এ থেকে অধ্যাপক ডক্টর মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ও অনুমান করেন যে, "তিনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন"। কিন্তু এই সামান্য বন্দনা অংশটির উপর নির্ভর ক'রে নারায়ণ দেবকে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে এটি গায়ক বা পুঁথি-নকলকারিগণের দ্বারা সংযোজিত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কারও কারও মতে নারায়ণ দেব বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক কবি। স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখেছেন,—"সম্ভবতঃ বিজয়গুপ্তের সমকালেই নারায়ণদেব তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করেন।.....বিজয়গুপ্তের লেখা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত দেখিয়া নারায়ণদেবকে অগ্রবর্ত্তী কবি মনে করা সঙ্গত হইবে না।" কিন্তু অন্যত্র "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ে" দীনেশবাবু মন্তব্য ক'রেছেন,—"নারায়ণ দেব অনুমান ১২৪৬ খৃঃ তাঁহার মনসা মঙ্গল রচনা করেন। ময়মনসিংহের বুড়গ্রামে নারায়ণ দেবের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। তাঁহারা নারায়ণ দেব হইতে অধস্তন বিংশ পর্য্যায়ে অবস্থিত।" অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, মহাশয় তাঁর "বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস"এ 'নারায়ণ দেবের বংশধরদের গৃহে রক্ষিত বংশ-লতিকা'র সাহায্যে অনুমান করেছেন,—"নারায়ণ দেব আনুমানিক সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্তের সামান্য কিছু অগ্রবর্ত্তী।" ডক্টর শ্রীযুত তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত "সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ"এর ভূমিকায় অভিমত প্রকাশ করেছেন,—"যাঁহারা নারায়ণ দেবকে বিজয় গুপ্তের সম-সাময়িক মনে করেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। আমরা নারায়ণ দেবকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য কি শেষভাগের কবি বলিয়া মনে করি। কাণা হরিদত্তের সময় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ

ধরিয়া লইলেই যেন ঠিক হয়। উভয় কবির ব্যবধান ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া লইলে কোন ক্ষতি হয়না।......কবি বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বর্ত্তমান থাকিলে কবি নারায়ণ দেব সম্ভবতঃ তাঁহার অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।”

নারায়ণ দেবের পিতার নাম নরসিংহ এবং মাতার নাম রুক্মিণী অথবা রত্নাবতী। কবির কায়স্থকুলে জন্ম। মৌদ্‌গোল্য বা মধুকুল্য গোত্র; গুণাকর গাঁই। কারও কারও মতে কবির আর এক নাম বল্লভ। ‘সুকবি বল্লভ’ ভণিতা-দৃষ্টে এই অনুমান অসঙ্গত নয়। দীনেশবাবুর অনুমান কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বল্লভ। অগ্রজের মুখে মনসার ভাসানগীত শ্রবণ করে ইনি লিপি-বন্ধ ক'রে যেতেন। কবির পূর্ব্বপুরুষের বাস রাঢ় দেশে ছিল। পরে তাঁর পিতামহ উদ্ধব বা উদ্ধরণ সে দেশ ত্যাগ ক'রে পূর্ব্ববঙ্গে চলে যান।

নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অনুভূতিশীল হৃদয় হতে সতঃউৎসারিত কবিত্ব এবং সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। মনসামঙ্গল করুণরস প্রধান কাব্য। এই করুণরস সৃষ্টিতে মনসার ভাসান রচকদের মধ্যে নারায়ণ দেব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অভিনব চরিত্র সৃষ্টিতে—বিশেষ করে বেহুলার চরিত্র চিত্রণে—নারায়ণ দেব যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি শেষ অঙ্কে চাঁদের চরিত্রকে খর্ব্ব করেছেন। চাঁদ ভক্তিভরে পদ্মার নব লক্ষ পূজা সমাপন করার পর,—

“হরসিতে বোলে পদ্মা চান্দ বিদ্যমান।
বিদায় দেঅ আমি জাই আপনার স্তান॥
পদ্মার চরণ ধরি বোলে অধিকারি।
এথাতে রহ মাও নির্ম্মাইয়া দেয়ম পুরি॥
নিত্য ২ সেবা পূজা করিমু তোমার।
তবে সে মনের দুঃখ খণ্ডিব আমার॥

* * *

করজোড় করি বোলে চম্পক অধিকারি।
আমার দুস খেমিবা জঅ বিসহরি॥

* * *

হেমতাল দিয়া মোরে পাটাইল গৌরি।
তান বোলে আমি গিয়া ভাঙ্গিল ঘটবারি॥
তোমার সনে বাদ করিতে মোর সক্তি নাই।
আপনার দুসে পাইলুম আপনে সাজাই॥
বারে ২ জথ মন্দ বোলিছি তোমারে।
সকল ক্ষেমিলানি কহও আমারে॥"

(সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ,
চন্দ্রধরের পদ্মাপূজা)

আর সকলে যেখানে তৃণদলের ন্যায় পূর্ব্বাহ্নেই নতশির সেখানে একমাত্র উন্নত-শির মহীরুহ চাঁদের এরূপ পরাজয়ের জন্য আমরা আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। নারায়ণ দেবের মত একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাছ থেকে এরকম চিত্র সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

প্রাচীন বাঙ্গলার পল্লীজীবন, সলজ্জ বধূ, সতী নারীর অপূর্ব্ব গরিমা, শৌর্য্য, পরাক্রম, সমুদ্রযাত্রা, সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, সুখ-দুঃখ, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতির সুন্দর আলেখ্য নিপুণ শিল্পী নারায়ণ দেবের তুলিকায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ধনাইয়ের মুখে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বর্ণনায় অতিরঞ্জন ও যথেষ্ট হাসির খোরাক থাকলেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য জানা যায়। যুগের প্রভাবে তাঁর রচনাও অশ্লীলতা দোষ থেকে অব্যাহতি পায়নি। তবে সে যুগের অন্যান্য কাব্যে যে রকম অশ্লীলতার বাহুল্য দেখা যায় তার চেয়ে অনেক কম আছে। চন্দ্রধরের দক্ষিণদেশে সমুদ্র পথে বাণিজ্যযাত্রা উপলক্ষ্যে যে চৌদ্দটি বৃহৎ জলযান বিবিধ পণ্যসম্ভার নিয়ে সজ্জিত হ'য়েছে তা থেকে সেকালের জাহাজের কৌতূহলোদ্দীপক নামগুলি পাওয়া যায়,—

"প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
জাহার উপরে আছে সিবলিঙ্গ ঘর॥
দ্বিতিয়ে মেলিল ডিঙ্গা আগল-পাগল।
জাহাতে ভরিচে চান্দো গাড়র ছাগল॥
ত্রিতিয়ে মেলিল ডিঙ্গা নামে চন্দনপাট।
জাহার গলইতে থাকিয়া দেখে শ্রীকলার হাট॥

চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গা নামে টিঞাধুটী।
জাহাতে ভরিছে খেস মঞা ভুটী॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে জাত্রাবর।
গুয়া পান ভরিয়াছে জাহার উপর॥
সপ্টে মেলিল ডিঙ্গা নামে সুতারেখি।
জাহাতে থাকিয়া লংকার দ্বার দেখি॥
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা মাণিক্যমেড়ুয়া।
উড়াইয়া দাড় বাহে সোলস দাড়ুয়া॥
অষ্টমে মেলিল ডিঙ্গা নামে হিংগুলবাড়ি।
জাহাতে ভরিয়াছে নেত কুতুবার সাড়ি॥
নবমে মেলিল ডিঙ্গা নামে কাজলরেখি।
মালুম কাষ্ঠেত থাকিয়া নিল পর্ব্বত দেখি॥
দশমে মেলিল ডিঙ্গা নামে সংখচুর।
জাহাতে ভরা ভরিয়াছে সংখ সিন্দুর॥
একাদশে মেলিল ডিঙ্গা নামে রত্নমালা।
জাহাতে ভরিয়াছে হরিদ্রা ছালা ২॥
দ্বাদসে মেলিল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
জাহার ধনে কার্য্য করে চান্দোর বেহারা॥
ত্রয়দসে মেলিল ডিঙ্গা নামে দুর্গাবর।
জাহাতে ভরিয়াছে চান্দো নারিকেল কুমড়॥
চতুর্দ্দশে মেলিল ডিঙ্গা নামে খরসান।
পাগ হাড়ি ভরিয়াছে করিয়া সন্ধান॥"

(সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ)

কবির দৃষ্টি সর্ব্বত্র সতর্ক এবং অনেক স্থানে তাঁর বর্ণনা বাস্তবধর্ম্মী। বেহুলার বিবাহে তারকারাণী রন্ধনরতা। কবি অলক্ষ্যে রন্ধনশালায় উপস্থিত হ'য়ে নিরামিষ ও আমিষ বাহান্ন ব্যঞ্জনের রন্ধন কৌশল সহ তালিকা পর পর লিপিবদ্ধ ক'রে চলেছেন। শুধু তাই নয়,—"রন্ধন রান্ধে তারকা কানের লড়ে সোনা",—সুন্দরী পাচিকার কর্ণভূষণ হিন্দোলের সৌন্দর্য্যটুকুও কবির চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। এই ধরণের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় তাঁর রচনায় অনেক পাওয়া যায়।

পরবর্তী মনসামঙ্গলকার বা ভাসানরচকগণ নারায়ণ দেবকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধার সঙ্গে বন্দনা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঢ় দেশের কবি কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সুদূর পূর্ব্ববঙ্গের কবি নারায়ণ দেবের নাম গভীর শ্রদ্ধাভরে ব্যাস-বাল্মীকি প্রভৃতি আদি কবিগণের সঙ্গে উল্লেখ ক'রে মনসার গীত রচনা আরম্ভ করেছেন,—

"ব্যাস বাল্মীকি মুনি নারায়ণ তত্ত্ব মানি
তোমাকে সেবিয়া হইল কবি॥"

ময়মনসিংহের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে নারায়ণ দেবের রচনার অনেক অংশ পাওয়া যায়। বংশীদাসের ভণিতাযুক্ত কোন কোন পদ নারায়ণ দেবের পুঁথিতেও মেলে।

## বিজয়গুপ্ত

বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রাম নিবাসী বৈদ্যজাতীয় বিজয় গুপ্ত মনসা-মঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বরিশাল, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর কাব্যের বহুল প্রচার হ'য়েছিল এবং তাঁর যশে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক কবির খ্যাতি ম্লান হ'য়ে গেছে। অন্য কবির ভণিতাবিহীন কেবল বিজয় গুপ্তেরই ভণিতাযুক্ত কোন পুঁথি কোথাও পাওয়া যায়নি। বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা তাঁর কাব্যেও স্থান পেয়েছে। এগুলি পরবর্ত্তী কবি ও গায়েনের হাতের প্রলেপ ব'লে অনুমিত হয়। তাঁর গ্রন্থে বহু ঐতিহাসিক তথ্য নিবদ্ধ আছে। সৌভাগ্যের বিষয় পদ্মাপুরাণে রচনার কাল নির্দ্দেশ ক'রে তিনি লিখেছেন,—

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক সীম॥"

পাঠান্তরে,

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে শাসিলা পৃথিবী॥"

অতএব দেখা যাচ্ছে, ১৪১৬ শকাব্দে (১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) গৌড়ের পাঠান সুলতান সুপ্রসিদ্ধ হুসেন শাহের রাজত্বকালে এই গীত রচিত হ'য়েছে। হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বীয় নিবাস-স্থানের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে কবি লিখেছেন,—

"পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থজাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর।
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয়॥"

বর্ত্তমান গৈলা গ্রামের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লীবিশেষ এই ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয় গুপ্তের বাসভূমি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীর বিগ্রহ, মন্দির ও দীঘি আজও বর্ত্তমান র'য়েছে। তাঁর বংশধরেরা সেই গ্রামেই বাস করছেন। কবির পিতার নাম ছিল সনাতন এবং মাতার নাম রুক্মিণী,—

"সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয়গুপ্তে রাখ তব পদসাথ॥"

(বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, গায়েনের বন্দনা)

বিজয়গুপ্ত সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনায় কবিত্বের চেয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে বেশী। পদ্মাপুরাণের মূল সুর করুণ রসাত্মক। সেদিকে বিজয় গুপ্ত একটু অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় শিব, চণ্ডী, পদ্মাবতী প্রভৃতি দেবতার বেনামীতে মানবচিত্র অঙ্কন ক'রতে এবং কথায় কথায় ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্তের বেশ দখল ছিল। রুচির প্রশ্ন না তুলে পদ্মার (মনসার)

বিবাহ সম্বন্ধে শিবদুর্গার রহস্যালাপের একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল,—

"জামাই এনেছি পুণ্যবান, কন্যা করিব দান
বিবাহের সজ্জা কর ঘরে।
এনেছি মুনির সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
কন্যা সমর্পিব তার করে॥
হাসি বলে চণ্ডি আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে,
আর চাবে তৈল সিন্দুরে॥
হাসি বলে শূলপাণি, এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে॥
আছুক পানের কাজ, এয়োগণ পাবে লাজ,
পান গুয়া দিবে কোন জনে।
বিজয় গুপ্তেতে কয়, এরূপ উচিত নয়,
ঘরে গিয়ে কর সম্বিধানে॥" (বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ)

এ ধরনের হাস্যরস তাঁর কাব্যে প্রচুর। বর্ত্তমান যুগের রুচির মাপ-কাঠিতে কোন কোন অংশ শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। নটীর ছদ্মবেশিনী মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগবেব ব্যবহারে বিজয় গুপ্ত আদিরসাত্মক বর্ণনায় বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছেন। তবে রুচির ও নীতির মানদণ্ড সব দেশে সব কালে এক নয়। দেশ-কাল ভেদে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তাই সে যুগের স্থূল ও অমার্জ্জিত ব্যঙ্গ ও রসিকতা আজকের দৃষ্টিতে ভাঁড়ামীর নামান্তর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সেকালের ব্যঙ্গ ও রসিকতা সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্রাট্ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন,—"আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ প্রণালী একজাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি

লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা।" একথাও মনে রাখা দরকার, যে পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শও এই রুচি-বিকৃতির জন্য কম দায়ী নয়। শুধু মঙ্গলকাব্যই নয়—মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্য-সাহিত্যেই এই ছাপ সুস্পষ্ট।

গতানুগতিক পয়ার ত্রিপদী বা লাচারী প্লাবিত মধ্যযুগে ছন্দের যাদুকর ভারতচন্দ্রের প্রসিদ্ধি আজ কারও অজানা নেই। কিন্তু তাঁরও প্রায় আড়াই শ' বছর আগে ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে কবি বিজয় গুপ্তের দানও নিতান্ত অবহেলার নয়। 'শিবের অদর্শনে চণ্ডিকার রাগ' অংশটি দেখা যাক,—

"প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি॥
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে॥
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, প'ড়ে ভাঙ্গুক লাউ।
কপালের তিলক চন্দ্র তারে গিলুক রাউ॥"

এই উদ্ধৃত অংশটির কাছে আধুনিক বাঙলা স্বরবৃত্ত ছন্দের ঋণ অস্বীকার করা যায় না। বিজয় গুপ্ত শিব-নৃত্য বর্ণনা ক'রেছেন,—

"জগত মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ॥
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক॥
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গে॥

বিশাই নাচে রে হাতেতে বাদ্য বাজে।
হাতেতে তালি দিয়া রে মুখেতে গীত গাহে॥
বিকট দশনে ভ্রুকুটি ভাল সাজে।
ডুম ডুম বলিয়া শিবের ডম্বুর বাজে॥"

(বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ)

এই ছন্দের সঙ্গে অন্নপূর্ণার অন্নে পরিতৃপ্ত ভিক্ষু শিবের নৃত্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্ত্তীকালের কবি ভারতচন্দ্র যে ছন্দের অবতারণা ক'রেছেন তা তুলনা করা যেতে পারে। যেমন,—

"জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লট পট জটা লপটে গায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
*     *     *
*     *     *
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায় গালে॥
নাচেন দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নপূর্ণা মৃদু মধুর॥"

(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল)

বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে আমাদের একটি বড় অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁর আরাধ্যা দেবী মনসার প্রতি প্রবল ভক্তির আতিশয্যে জীবন সংগ্রামে অপরাজেয় পুরুষকারের মহান আদর্শ চাঁদ সদাগরের চরিত্রকে অনেক ক্ষুন্ন ক'রেছেন। চাঁদের মহৎ মর্য্যাদাকে দৈবের পায়ে বলি দিয়েছেন। বেহুলার তপস্যায় চমৎকৃত ও স্নেহে বশীভূত চাঁদ অঙ্গীকার ক'রলেন পিছন ফিরে বাম-হস্তে দেবীর পূজা ক'রবেন। এ পর্য্যন্ত চাঁদের চরিত্র বলিষ্ঠ ও সুন্দর হ'য়েছে। কিন্তু একেবারে শেষ দিকে দেখতে পাই, চাঁদ ষোড়শোপচারে

পূজা সাজিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে মনসার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দীনভাবে স্তব ক'রছেন। নারায়ণ দেব যদি বিজয় গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি হন তাহলে হয়ত তিনি এই অংশে নারায়ণ দেবকে অনুসরণ ক'রেছিলেন; অথবা সন্দেহ হয়, এই অংশ পরবর্ত্তী কোন অক্ষম কবি, লিপিকার বা গায়েনের মুন্সিয়ানা।

## বিপ্রদাস পিপিলাই

কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল রচনার পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, বর্ত্তমান চোব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার বাদুরিয়ার সন্নিকটে বড়গাঁ বা বটগ্রাম নিবাসী বিপ্রদাস মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বড়গাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল বাদুড়্যা-বটগ্রাম। বিপ্রদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ও চারি সহোদর ছিলেন। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন,—

"মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা বটগ্রাম॥
বাৎস্য গোত্র পিপিলাই পঞ্চপ্রবর।
সাম বেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর॥

* * * *

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান॥
হেন কালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পিরীত॥
পদ্মাবতী-চরণ-সরোজ-মধুলোভে।
দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গরূপে শোভে॥"

এ থেকে জানা যায়, কাব্যের রচনাকাল ১৪১৭ শকাব্দ অথবা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার বিভিন্ন নাম ও সেগুলির উৎপত্তির বিবরণ আছে,—

"জনম পাতালপুরী অযোনিসম্ভবা।
নিৰ্ম্মানি জননী মহাদেব-তেজস্‌ভবা॥
আপনা আপনি কৈলা জীবের সঞ্চার।
বাসুকি দিলেক বিষ নাগ-অধিকার॥

উদ্ভবা পাতাল নাম পাতালকুমারী।
নাগদান পাইয়া নাম হৈল নাগেশ্বরী॥
কালিদহে পদ্মবনে হইল উৎপত্তি।
তথির কারণে নাম হৈল পদ্মাবতী॥
মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারি।
তথির কারণে নাম মনসা-কুমারী॥
নিরঞ্জনকায়-ভেদ সর্ব্বশাস্ত্র-জানী।
ব্রহ্মজ্ঞান পায়্যা নাম হইল ব্রহ্মাণী॥
মহাজ্ঞান দিলা যদি দেব শূলপাণি।
যোগেশ্বরী নাম আর পরমযোগিনী॥
চন্ডীর বিবাদে নাম হইল মন্দাক্ষী।
চন্ডী জিনি নাম হইল বিষপূর্ণ-আঁখি॥
শুক্লপট্ট পরি যবে গেলা বনবাসে।
শ্বেতাম্বরী নাম আর সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
চন্ডীর বিবাদে নাম হইল নির্ব্বাসিনী।
পর্ব্বতে পার্ব্বতী নাম পর্ব্বতবাসিনী॥
জগৎকারু পত্নী নাম হইল জগদ্‌গৌরী।
পতির বিচ্ছেদে নাম পতিমন্দাদরী॥
জাগিয়া জাগুলি নাম সীজবৃক্ষে স্থিতি।
আমি কি বলিতে পারি আমার শকতি॥"

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে নদীপথের ও অনেক মূল্যবান ভৌগলিক বৃত্তান্ত বিপ্রদাসের কাব্যে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হুগ্‌লী ও কলিকাতার উল্লেখ দেখা যায়। সাহিত্যে হুগ্‌লী ও কলিকাতার উল্লেখ বোধকরি এই-ই সর্ব্বপ্রাচীন। বিপ্রদাসের বর্ণনার সঙ্গে তাঁর প্রায় কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পরে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ফান্‌ ডেন ব্রোক (Van den Broucke) সাহেবের দ্বারা প্রস্তুত নদীপথের নকশার বর্ণনার অনেকক্ষেত্রেই সাদৃশ্য দেখা যায়। এই নকশাতেও হুগ্‌লী ও কলিকাতার উল্লেখ আছে। বিপ্রদাসের রচনায়, পঞ্চদশ শতাব্দীতে, কলিকাতার নামোল্লেখে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। বিপ্রদাস বর্ণিত নদীতীরবর্ত্তী স্থান সমূহের মূল তালিকায় পরবর্ত্তীযুগের লিপিকার হুগ্‌লী ও কলিকাতার নাম সংযোগ করে দিয়েছেন, এরূপ অনুমান করা

হয়ত অসঙ্গত হবেনা। তবে সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা এই কাব্যে আছে *রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সপ্তগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন যে, সে বর্ণনা পঞ্চদশ শতাব্দীর পরের হ'তে পারে না।

বিপ্রদাসের কাব্য থেকে জানা যায়, সমাজে তখন ধর্ম্মরাজ দেবতার পূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল। শিবের মত মহাকুলীন দেবতাও বল্লুকাতীরে ধর্ম্ম-ঠাকুরের তপস্যায় বসে আছেন দেখা যায়।

## দ্বিজ বংশীদাস

দ্বিজ বংশীদাস মনসামঙ্গলের একজন প্রধান ও জনপ্রিয় কবি। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন পাটওয়ারী গ্রাম কবির জন্মস্থান। ইনি সুপরিচিতা মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। বংশীদাস চন্দ্রাবতী ও তাঁর প্রণয়ী জয়চন্দ্রের সাহায্যে মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন।

বংশীদাসের মনসামঙ্গল রচনার যথার্থ কাল নির্ণয় হয়নি। কোন কোন পুঁথিতে কালজ্ঞাপক পদ দেখা যায়,—

> "জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
> শকে রচে দ্বিজবংশী পুরাণ পদ্মার॥"

অর্থাৎ ১৪৯৭ শকাব্দ অথবা ১৫৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দ। দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এই মত গ্রহণ করেছেন। সুকুমারবাবু 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' লিখেছেন,"......বংশীদাসের বর্ত্তমান কাল ষোড়শ শতাব্দী হওয়া সন্দেহের বিষয়। যাহা হউক, সন্দেহের সুবিধা দিয়া আমরা বংশীদাসকে ষোড়শ শতাব্দীর কবিগণের মধ্যেই গণনা করিলাম।" এদিকে আশুতোষবাবু 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' দ্বিজ বংশীদাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন ব'লে সিদ্ধান্ত ক'রেছেন। কাব্য মধ্যে হাজরাদি পরগণার উল্লেখ (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্রাট্ আকবরের সময়ে এই পরগণার বিভাগ হয়), আরাকানের মগ ও পর্ত্তুগীস দস্যুগণের উল্লেখ (পর্ত্তুগীসরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বাঙ্গলায় আসে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দস্যুতা ও মিশনারি প্রচার কার্য্যে লিপ্ত থাকে), সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের আদর্শ, কাব্যে প্রাচীন শিবঠাকুরের পরিবর্ত্তে চণ্ডীর প্রাধান্য এবং কবির বংশধরদিগের নিকট প্রাপ্ত বংশাবলী প্রভৃতি বিচার ক'রে

দেখলে আশুতোষবাবুর এই অনুমান বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। তবে এ বিষয়ে আরও পুঁথি-প্রমাণ না পাওয়া গেলে জোর ক'রে কিছু বলা চলেনা।

বংশীদাসের এক পূর্ব্বপুরুষ চক্রপাণি রাঢ়দেশ থেকে এসে ব্রহ্মপুত্রের তীরে বসবাস করেন। এঁরা রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটী গাঁই। কবির পিতামহের নাম হৃদয়ানন্দ, পিতা যাদবানন্দ ও মাতা অঞ্জনা। কবির পত্নীর নাম সুলোচনা। বংশীদাস অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। চন্দ্রাবতী স্বীয় রামায়ণে যে পিতৃ-পরিচয় দিয়েছেন সেটি 'অনুবাদ সাহিত্য' বিভাগে উদ্ধৃত করা হ'য়েছে। বংশীদাস ছিলেন একাধারে কবি ও সুকণ্ঠ গায়ক। তাঁর গানেব দল ছিল। স্বরচিত মনসার ভাসান গীত গ্রামে গ্রামে গান ক'রে তাঁর জীবিকা নির্ব্বাহ হ'ত। তিনি প্রতিভাবান কবি অপেক্ষাও বিখ্যাত গায়করূপে সুপরিচিত ছিলেন।

দেশে তখন ধন-সম্পদ ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল ঘোর অরাজকতা। ঠগ, ডাকাত প্রভৃতির অত্যাচারে দেশের লোক অতিষ্ঠ—লোকের ধন-মান-প্রাণ বিপন্ন। চন্দ্রাবতী লিখেছেন,—

"টাকা পয়সা রাখে লোক মাটীতে পুতিয়া।
ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া॥
ডাকাত দেশের রাজা পাতসায় না মানে।
উজাড় হইল রাজ্য কাজির শাসনে॥
দৈছত পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়।
ধনে প্রাণে মরে প্রজা চন্দ্রাবতী কয়॥"

দ্বিজ বংশীদাস একবার সদলে 'জালিয়া হাওরে' নলখাগড়ার বনের মধ্য দিয়ে দূর কোন গ্রামে মনসার ভাসান গান করতে চলেছিলেন। এইখানে তিনি তখনকার দিনের বিখ্যাত নরহন্তা দস্যুসর্দ্দার কেনারামের দ্বারা আক্রান্ত হন। এই ঘটনাটি চন্দ্রাবতী 'কেনারাম' নামে গাথাকাব্যে অপূর্ব্ব কারুণ্য ও ভক্তির সঙ্গে লিখে রেখেছেন। কেনারামের প্রকৃতি যেমন নৃশংস তার আকৃতিও তেমনি ভীষণ,—

"হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া।
আসমানে জমিনে ঠেকে যখন হয় খাড়া॥" (চন্দ্রাবতী)

বংশীদাস ভক্তিভরে দেবীর নাম গান করতে করতে পথ চ'লেছেন। সন্ধ্যা আসন্ন। সম্মুখে দেখলেন খড়্গ হস্তে কৃতান্ত সদৃশ কেনারাম সদলে তাঁদের

পথ রোধ করে দাঁড়াল। তিনি তাঁর ঝুলিতে সামান্য সম্বল কয়েকটি কড়ি, কিছু আতপ তণ্ডুল ও ছিন্নবস্ত্র দেখিয়ে কেনারামকে সেগুলি নিতে ব'ললেন। কিন্তু কেনারামের গৌণ উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন—মুখ্য উদ্দেশ্য মনুষ্য হনন। সে বিখ্যাত গায়ক বংশীদাসের নাম শুনেছিল কিন্তু তাঁর কোন কথাতেই কর্ণপাত করল না, তাঁদের সকলকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে আদেশ ক'রল। সাধক বংশীদাসের প্রাণে মৃত্যুর ভয় নেই। তিনি কেনারামের কাছে মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষবারের মত মায়ের নামগান করার অনুমতি প্রার্থনা ক'রলেন। কি ভেবে কেনারাম সম্মত হ'ল। ভক্তকবি বংশীদাস সুমধুর অমৃতবর্ষী কণ্ঠে মনসার ভাসান গান আরম্ভ ক'রলেন।

"আকাশ চাঁদোয়া হইল শুনে পশুপাখী।
কেনারাম বসিল যে হাতের খাণ্ডা রাখি॥" (চন্দ্রাবতী)

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল, ডাকাতেরা মশাল জেবলে গান শুনতে বসল। কাল ভুজঙ্গ কেনারাম গানের করুণ সুরে মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল হ'য়ে রইল। গান শেষ হ'য়ে এসেছে, সহসা "ফেলাইয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম॥" কেনারাম মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে বংশীদাসের চরণ ধুইয়ে দিল। সে তার অতুল ঐশ্বর্য্য বংশীদাসকে নিতে অনুরোধ ক'রল, কিন্তু নির্লোভ কবি নররক্ত কলুষিত সে ধন গ্রহণ ক'রতে অস্বীকার ক'রলেন। অনুতাপে দগ্ধ কেনারাম উন্মত্তের ন্যায় সে সমস্ত ঘড়া ঘড়া ধনরত্ন ফুলেশ্বরী নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে আত্মহত্যা ক'রতে উদ্যত হ'ল। তখন বংশীদাস তাকে তা থেকে নিবৃত্ত ক'রে শিষ্যত্বে বরণ ক'রে নিলেন। যে কেনারামের নাম সকলের আতঙ্কের বিষয় ছিল সে অচিরে সকলের প্রিয়জন হ'য়ে প'ড়ল। বংশীদাসের সঙ্গে সে গ্রামে গ্রামে মনসার ভাসান গান গেয়ে পাষাণ হৃদয়কেও গলাতে পারত। চন্দ্রাবতী রচিত এই গাথার শেষে ভণিতা দেওয়া আছে এই রকম,—

"কেনারাম গায় গীত ঝরে বৃক্ষের পাতা।
পয়ার প্রবন্ধে কহে দ্বিজ বংশী সুতা॥"

দ্বিজ বংশীর কাব্যে অনাড়ম্বর ভঙ্গী, ভাষার সরলতা, গভীর অনুভূতির তীব্রতা ও ভাবের আবেগ অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। ময়মনসিংহ জেলার সর্ব্বত্র ক্রিয়াকর্ম্ম ও যে কোন শুভ অনুষ্ঠানে এই সর্ব্বজনপ্রিয় কবির 'গান' হওয়া চাই-ই। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরসিক ও গীতিকাব্য সংগ্রাহক শ্রীযুত

চন্দ্রকুমার দে মহাশয় 'ময়মনসিংহের কবি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "কবি দ্বিজবংশী ছিলেন পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রাণের কবি। প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, আজও ময়মনসিংহবাসী তাহাদের প্রাণের কবিকে ভুলে নাই। ঘরে বাইরে, মনের মধ্যে, আজও তাঁহাকে দেবতার পাশে ঠাঁই দিয়া রাখিয়াছে। বিবাহে, উপনয়নে, অন্যান্য উৎসবে আজও দ্বিজবংশীর গান তাহাদের ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদির একটি প্রধান অঙ্গ। মেয়ের বিবাহে সোহাগ সাধিতে, তৈল রাঁধিতে পাড়ার মেয়েরা আজও বংশীদাসের গান গাহিয়া থাকে। অধিবাস কালে বরকন্যাকে হলুদজলে নাইয়া তোলার যে রীতি ও অন্যান্য যে স্ত্রী-আচার আছে তাহাতে তাঁহারা বংশীদাসের উপদেশই গ্রহণ করিয়া থাকেন। মার নিকট হইতে মেয়ে, সেই গান আচার অনুষ্ঠান ক্রমেই শিক্ষালাভ করিয়া চলিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে আজও বংশীদাসের নামে উলুধ্বনি পড়ে। আজ কোন দুর্ব্বার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে যদি বংশীদাসের সেই সুবৃহৎ পদ্মাপুরাণ সকল সমূলে নষ্ট হইয়া যায়, তবু কালের কবল হইতে একটি অক্ষরও মুছিবে না। এদেশে এমন গায়ক আজও জীবিত আছেন, যাঁহারা এই দেড় হাজার পৃষ্ঠার অতিকায় পুঁথিখানা আগাগোড়াই একদম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।"

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের কাহিনী অংশে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। শিবের চেয়ে চণ্ডীই অধিক প্রাধান্য লাভ ক'রেছেন। সমাজে সম্ভবত তখন ভিক্ষুক শিবের কৌলিন্যের চেয়ে বরাভয়দাত্রী চণ্ডীর মর্য্যাদাই অধিক ছিল। তাই দেখতে পাই বংশীদাসের চাঁদ সদাগর পরম শৈব নন—পরম শাক্ত। তিনি শিবের ভার্য্যা চণ্ডীর একনিষ্ঠ উপাসক। ইষ্টদেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে তিনি দেবীর সপত্নী-কন্যা মনসার বিরোধী। শেষ অঙ্কে শিব স্ত্রী ও কন্যার মাঝে মধ্যস্থতার কাজ ক'রে এই গৃহ-বিবাদ অবসান ক'রলেন। চণ্ডী তখন চাঁদ বেণেকে জানালেন,—

> "যেহি পদ্মা সেহি আমি জানিহ নিশ্চয়।
> পদ্মা পূজা কর পুত্র না ভাব বিস্ময়॥"

(বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ)

দৈব-লাঞ্ছিত পৌরুষের প্রদীপ্ত-ভাস্কর চাঁদ সদাগরের চরিত্রের যোগ্য মর্য্যাদা নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিরাও যেখানে সর্ব্বত্র বজায় রাখতে পারেননি বংশীদাস কিন্তু সেখানে সফল হ'য়েছেন। তিনি চাঁদের চরিত্রকে আরো মহান, আরো গৌরবোজ্জ্বল ক'রে চিত্রিত করেছেন।

## কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ

মনসামঙ্গলকাব্য প্রণেতাগণের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। মনসার ভাসানগানও পূর্ব্ব-বঙ্গেই সমধিক সমাদৃত। পশ্চিম-বঙ্গের ভাসান রচকগণের মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচনা সমগ্র রাঢ় দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়েছিল।

কবি ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ ছিলেন বৰ্দ্ধমান জেলার অধিবাসী এবং জাতিতে কায়স্থ। "কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরানী, কায়স্থ যতেক আছে"—এই ব'লে তিনি স্বজাতি কায়স্থকুলের জন্য দেবীর আশিস্ প্রার্থনা ক'রেছেন। তাঁর কাব্যে কয়েকটি পদে কেতকাদাস এবং অবশিষ্ট কতকগুলি পদে ক্ষেমানন্দ এই দু'রকম ভণিতা দেখতে পাওয়া যায়। এইজন্য অনেকেই এই কাব্য দু'জন স্বতন্ত্র কবির রচনা মনে ক'রেছেন। কিন্তু তা মনে করার কোন হেতু নেই।

"বনের ভিতর নাম মনসাকুমারী।
কেআ পাতে জন্মহৈল কেতকাসুন্দরী॥" (ক্ষেমানন্দ)

ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে এই উদ্ধৃত অংশ থেকেই জানা যায় যে, মনসাদেবীর আর এক নাম কেতকা। মনসাদেবীর ভক্ত কবি ক্ষেমানন্দ সেজন্য নিজেকে কেতকাদাস ব'লে পরিচিত ক'রেছেন। কাব্য মধ্যে তিনি গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও নিজের আত্মবিবরণ এইভাবে দিয়েছেন,—

"সুন ভাই পূর্ব্ব কথা, দেবী হৈলা বরদাতা,
সহায় পূর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয়, চন্দ্রহাসের তনয়,
তাঁহার তালুকে ঘর করি॥
তাঁহার রাজত্ব শেষ, চলি গেল স্বর্গদেশ,
তিন পুত্রে দিয়ে অধিকার।
শ্রীযুক্ত আস্কর্ণ রায়, পুত্রের অধিক তায়
রণে বনে বিজয়ী তাহার॥
তিন পুত্র অল্প বয়, প্রসাদ গুরু মহাশয়,
তালুকের করে লেখা পড়া।
তাহার তালুকে বৈসে, প্রজা নাহি চাষ চসে
শমন নগর হইল কাঁথড়া॥

রণে পড়ে বারা খাঁ, বিপাকে ছাড়িল গাঁ,
যুক্তি করেন জনে জন।
দিন কত ছাড়ি জাই, তবে সে নিস্তার পাই,
সকলের তবে ভাল জান॥
শ্রীযুত আস্কর্ণ রাএ, অনুমতি দিল তাএ,
যুক্তি দিল পলাবার তরে।
তার যুক্তি সুনি বাণী, পালাএ অনেক প্রাণী,
বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে॥
মনে ভাবি সবিস্ময়, বেলা আছে দণ্ড ছয়,
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই।
অবসান হ'ল বেলা, গ্রামের উত্তর জলা,
খড় কাটিবারে তথা যাই॥
তথায় ছাওাল পাঁচে, খোলা দিয়ে জল সিঁচে,
মৎস্য ধরে পঙ্কেতে ভূষিত।
আমার কৌতুক বড়, ছাওাল পাঁচেতে জড়,
সেইখানে হইলাম উপনীত॥

*　　　　*　　　　*

মৎস্য লইয়া অভিরাম, চলিল আপন ধাম,
যত শিশু গেল নিজ পুরে।

*　　　　*　　　　*

মুচিনীর বেশ ধরি, বলেন দেবী বিষহরী,
কাপড় কিনিতে আছে টাকা।
এতেক কহিয়া মোরে, কপট চাতুরী করে,
যত্নে একাইআ দেই টাকা॥
বেষ্টিত ভুজঙ্গ ঠাটে অবতরি মাঝ মাঠে,
দেখি মোর মুখে উঠে ধূলা।
পাইলাম মনস্তাপ, দেখিলাম অনেক সাপ,
আমারে বেঢ়িল কথোগুলা।

জেরূপ দেখিলা নেতে, মানা কৈল প্রকাশিতে,
কহিলে না হব তোর ভাল।
ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ, কবিত্বে কর প্রবন্ধ,
আমার মঙ্গল গাইআ বুল॥"

আত্মবিবরণে যে বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় কবি দুঃখ প্রকাশ ক'রেছেন, সেই বারা খাঁ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (১৬৪০ খৃঃ) বর্দ্ধমান জেলার সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ন্যায়-শাসন ও দানের জন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হ'য়েছিলেন। এই সময় হিন্দু-মুসলমানে খুব সম্প্রীতি ছিল মনে হয়। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে দেখা যায় লক্ষীন্দরের লোহার বাসরে সমস্ত বিপদ থেকে নবদম্পতিকে রক্ষার জন্য মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ প্রভৃতির সঙ্গে একটি কোরানও রাখা হ'য়েছিল। পানাগড় (ই. আই. আর) রেল ষ্টেসনের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে সিলিমপুর গ্রামে বারা খাঁর সমাধি আছে। সে অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস যে চাঁদ সদাগরের বাস ঐ গ্রামের কাছেই ছিল। সেখানে চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠিত (?) শিবলিঙ্গ আছে। একটি প্রাচীন ভগ্ন-স্তূপ চাঁদ সদাগরের ভিটারূপেও নির্দ্ধারিত হয়। প্রতি বৎসর শ্রাবণমাসে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এখনও ঢাক ঢোল বাদ্যসহ মহাসমারোহে মনসার পূজা করে থাকে। সেখানে বহুদূর বিস্তীর্ণ শালবন, কাছাকাছি অজয় ও (বাঁকা) দামোদর দুই নদ, বিষাক্ত সর্পের সংখ্যাও ঐ অঞ্চলে খুব বেশী।

বারা খাঁর উল্লেখ থেকে আমরা ক্ষেমানন্দকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কবি ব'লে অনুমান করতে পারি। তিনি কাব্যের প্রারম্ভে নারায়ণ কবির বন্দনা করেছেন। এই বন্দনা সম্ভবত পদ্মাপুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেবেরই উদ্দেশ্যে মনে করা অসঙ্গত হবেনা।

ভেলায় মৃতস্বামীসহ বেহুলার ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করে কবি বর্দ্ধমান অঞ্চলের অনেক স্থানের যথাযথ ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বর্ণনা দিয়েছেন। ক্ষেমানন্দ পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সর্ব্বত্র পান্ডিত্য প্রকাশে তাঁর কাব্যে রস ব্যাহত হ'য়েছে। বেহুলার চরিত্র অঙ্কনে অসাধারণ দক্ষতা দেখালেও চন্দ্রধরের চরিত্রকে তিনিও খর্ব্ব ক'রেছেন। হাস্য ও করুণ উভয় রস সৃষ্টিতে কবি সমান পটু ছিলেন। পতিব্রতা বেহুলার দুঃখ বেদনার অংশ কবি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। সদাগরের সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের 'বাঙগাল মাঝি'দের নিয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ন্যায় ক্ষেমানন্দও

মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা ক'রেছেন। 'বাঙ্গাল'দের নিয়ে পরিহাস করা তখনকার দিনে রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—যার জের আজও মেটেনি। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়,* মহাপ্রভুও তরুণ বয়সে বাঙ্গালদের—বিশেষ করে শ্রীহট্টিয়া বাঙ্গালগণকে—ব্যঙ্গ ক'রে হাস্যের রোল তুলতেন, যদিও তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষগণের বাস ছিল শ্রীহট্টেই। নিছক রহস্য-প্রিয়তার বশেই তিনি এরূপ ক'রতেন, এর মধ্যে কোন তিক্ততা ছিলনা

---

* "সভার সহিত প্রভু হাস্যকথারঙ্গে। কহিলেন যেন-মত আছিলেন বঙ্গে॥
বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া। বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥
... .. ...
বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া। কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া॥"
-(চৈতন্যভাগবত)

## চণ্ডীমঙ্গল

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলের পরই চণ্ডীমঙ্গল সর্ব্বাধিক প্রচারিত হয়েছিল। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অনেকখানিই জুড়ে আছেন মনসা ও চণ্ডী। মনসামঙ্গল যেমন পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল তেমনিই পশ্চিমবঙ্গে বিস্তারলাভ করেছিল। একের পর এক কবি এই দুই দেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য প্রণয়ন করে গেছেন। শিবের নিশ্চেষ্টতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মনসা ও চণ্ডী অসাধারণ উদ্যমে, যে কোন উপায়ে, নিজেদের পূজা প্রচারে তৎপর হ'য়ে ওঠেন এবং ক্রমশ বাঙলাদেশে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হন। জনসাধারণের কাছে সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে নিস্পৃহ শিবের মর্য্যাদা কেন যে হ্রাস পেতে থাকে এবং পার্থিব সুখ-সম্ভোগদায়িনী শক্তির আরাধনা অধিক আকর্ষণীয় হ'য়ে দাঁড়ায় তা অনায়াসেই বোঝা যায়। অরূপের ধ্যান ও বিশুষ্ক আধ্যাত্ম সাধনায় বাঙালীর কোনদিনই আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা ছিল না। ঐহিক বস্তুনিষ্ঠ সাধারণ লোকে জ্ঞানময় ঈশ্বরকে নিষ্কামভাবে অন্তরে উপলব্ধি ক'রেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। পরকালের মোহে ইহকালের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে তারা অস্বীকার করতে পারেনি। ভগবানকে কাছে টেনে রূপ গুণ ও রসের মাঝে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে। এর পরিচয় আছে বাঙলার সকল ধর্ম্মেই। বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম্ম নির্বাত্তিত সব কটি সাধনমার্গ, নাথধর্ম্ম, বাউল-দরবেশের ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, দেহাশ্রয়ী তন্ত্র-ধর্ম্ম প্রভৃতিতে এর নিদর্শন আছে।

বিষহরী ও চণ্ডীর পূজা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলার সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল ও লাভজনক ব্যবসা ছিল। চৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরনে॥"

দরিদ্র শ্রীধরকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রশ্ন করেন,—

"লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥" (চৈতন্যভাগবত)

এবং অর্থকরী মনসা ও চণ্ডীর পূজা করে দারিদ্র দূর করতে উপদেশ দিয়ে নজির দেখান,—

'দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে যত নাগরিয়া॥' (চৈতন্যভাগবত)

সম্ভবত খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে চণ্ডীর পূজার প্রচলন হয়। এই সময়ে ও কিছু পরে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, হরিবংশ, দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে লৌকিক দেবী চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ ও তাদের উপর প্রাচীনত্ব ও আভিজাত্য আরোপের চেষ্টা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে এই লৌকিক চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীকে অভিন্না করে প্রচার করারও প্রয়াস পেয়েছিলেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোম বা গোষ্ঠীবদ্ধ আর্য্যেতর জাতির মধ্যে মাতৃকা পূজা সুপ্রচলিত ছিল। অনার্য্যভাষীদের সঙ্গে মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে এই স্ত্রী দেবতার অর্চ্চনা আর্য্যভাষীদের সমাজেও গৃহীত হয় এবং পরবর্ত্তী কালের শক্তিধর্ম্মের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু তখনও সমাজে দেবীদের পূজা এত ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়নি। শক্তিপূজার বিশেষ করে তন্ত্রসাধনার-প্লাবন এসেছে অনেক কাল পরে বিত্তহীন অবজ্ঞাত নিম্ন শ্রেণীর মাঝে, নিপীড়িতের মধ্য দিয়ে। যদিও শ্রেণী চেতনা এবং প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে এই বিপ্লব কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক মুক্তির পথ প্রদর্শন করেনি ক্রিয়াবহুল সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান মাত্র হয়ে দাড়িয়েছে। ঐহিক বিষয়ে নির্ব্বিকার জৈন ও বৌদ্ধ কর্ম বাঙ্গলা দেশে প্রচারিত হয়েছিল। জৈনধর্ম্ম বৃহত্তর জনসমাজে আমল পায়নি বেশীদিন। বৌদ্ধধর্ম্ম দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মৈত্রী-করুণার মন্ত্রে অভিষিক্ত অহিংসা ধর্ম্মে জীব হনন নিষিদ্ধ থাকায় জাতির যুদ্ধ স্পৃহা লোপ পেতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম্ম নিপীড়িত হওয়ার পরও এই ধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি বহুকাল। শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদেও দেশ আচ্ছন্ন হয়ে বিষয় ও কর্ম্ম বিমুখ হয়েছিল। তাছাড়া রাষ্ট্র ও সমাজ নায়কেরা সমাজের নিম্নস্তরের লোকেদের প্রতি ছিলেন উদাসীন ও উন্নাসিক। এতে জাতি দিন দিন শক্তিহীন হয়ে পড়তে থাকে। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে মানুষে মানুষে ভেদ দেখা দেয় দুর্লঙ্ঘ্য বর্ণব্যবস্থায় ও ছুৎমার্গের প্রাবল্যে। এই সুযোগে বিদেশীয়গণ সামরিক শক্তির প্রতি উদাসীন সঙ্ঘশক্তিবিহীন

ও একান্ত ভাগ্যনির্ভর হিন্দুদের শিথিল মুষ্ঠি হ'তে দেশের শাসনদণ্ড একের পর এক ছিনিয়ে নিতে থাকে। স্বাধীনতা হারিয়ে অরাজকতা ও মন্বন্তরের মধ্যে দেশের লোকের মোহ-নিদ্রা ভাঙে। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রের সংযোগে শক্তি-সাধনার মধ্য দিয়ে সুপ্তোত্থিত জনগনের বিদ্রোহের রূপটি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই বিদ্রোহ ভ্রান্ত পথে চালিত হওয়ায় এতে বৃহত্তর সমাজদেহ অসুস্থ, বিকারগ্রস্থ ও দুর্ব্বল হ'য়েছে।

বিকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মমতের সমন্বয়ে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে তান্ত্রিকের এই ভীষণ ও ভয়াল সাধন-পদ্ধতির মধ্যে দু'রকম সাধন পন্থা আছে,—দক্ষিণমার্গ ও বামমার্গ। দক্ষিণমার্গ কিছুটা বেদান্তের ভাব-রসে পুষ্ট। কিন্তু বামপন্থী বা বামাচারীরা প্রবৃত্তি চরিতার্থতার পথ বেয়ে নির্লিপ্ততা আয়ত্ত করতে গিয়ে যৌনাতিশয্যে নানা অনাচার, অভিচার ও ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। তাদের সাধনার প্রধান উপকরণ হ'য়েছিল, "বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্"। এইভাবে দেহাশ্রয়ী তন্ত্রধর্ম্ম সাধন-রূপকের বিকৃত অর্থ ক'রে মূল আদর্শ ভ্রষ্ট হ'য়ে, মদ্য-মাংস প্রভৃতি পঞ্চ-'ম'কার এই পর্য্যবসিত হ'য়ে পড়ল। চীন-তিব্বতী বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও পূর্ব্ব-ভারতের হিন্দু তন্ত্রোপাসকদের মিলন ও নিভৃত সাধনের প্রধান ক্ষেত্র হ'য়েছিল আরণ্য ও পার্ব্বত্যভূমি আসামের কামরূপ-কামাখ্যা ও বর্ত্তমান গৌহাটী অথবা প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। ভোট্টদেশ (তিব্বত), কামরূপ, রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গদেশ ও কিছুটা মিথিলায় তান্ত্রিকদের সংখ্যা ও প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশী। দেবী-পুরাণের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে মনে হয় যে, খৃীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেই এই সমস্ত অঞ্চলে বামাচারী শাক্ত মতে দেবী পূজার প্রচলন হ'য়েছিল। আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে রচিত অষ্টাদশ আগম ও ষষ্ঠ যামল গ্রন্থের প্রভাবে পরবর্ত্তীকালে বাঙলাদেশে অধিকাংশ তন্ত্রশাস্ত্রাদির উদ্ভব হ'য়েছে। তন্ত্রগ্রন্থগুলি রচিত হ'য়েছে দ্বাদশ শতাব্দী ও তার পরবর্ত্তী সময়ে।

বামাচারী তান্ত্রিকদের স্ত্রী-পুরুষের একত্রে ভৈরবীচক্রে সাধনা এবং অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যাভিচার প্রণোদিত শব-সাধন, কায়া-সাধন, নারী-সাধন প্রভৃতি নানা প্রক্রিয়া ও খাদ্যাখাদ্যের বিচারহীনতা সামাজিক জীবনকে বীভৎস ক'রে তোলে। এই নৈতিক কদর্য্যতার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার যুগে। বিকৃত তান্ত্রিক প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য সমাজ-পতিরা খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও নিয়মনিষ্ঠাকে সমস্ত রকম গুণের উপর শ্রেষ্ঠ

মর্য্যাদা দিলেন। কালচক্রের আবর্ত্তনে আবার নব যুগের সূচনা হ'ল। তান্ত্রিকের খর্পরধারিণী ভীষণা চামুণ্ডা বৈষ্ণব যুগের প্রভাবে, অষ্টাদশ শতকে, রামপ্রসাদের ভাব-কল্পনায় অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে রূপান্তরিতা হ'লেন।

এই আর্য্যেতর শক্তিরূপিণী দেবী শৈবধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় যথা নিয়মে—শিবের স্ত্রী পরিচয়ে উচ্চতর সমাজে আসন অধিকার করেন। সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্রগুলি এই শক্তির মহিমা প্রচারে ব্রতী হ'ল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ও তন্ত্রাদিতে দেবীর অনেকগুলি নাম দেখা গেলেও তাঁর চণ্ডী নামই সর্ব্বাধিক প্রচলিত। অনেক পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এই যে, 'চণ্ডী' শব্দটি অনার্য্যভাষা থেকে অনেক কাল পরে আর্য্যভাষায় গৃহীত হ'য়েছে। অষ্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, শবর, ভূমিজ, হো প্রভৃতি লোকেরা "চাণ্ডী" নামে যে দেবীর পূজা ক'রে থাকে সেই চাণ্ডীদেবী থেকেই নাকি হিন্দু সমাজের শক্তিস্বরূপিণী চণ্ডীদেবীর উদ্ভব হ'য়েছে। শ্রীযুত শরৎকুমার রায় মহাশয় বলেন, "ভারতে শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন সম্ভবতঃ ইহারাই প্রথম করে। ওরাওঁ প্রভৃতি জাতির চাণ্ডী নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডী দেবীর সাদৃশ দেখা যায়।" ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে এই সকল লোকেদের বসবাস ছিল বেশী সেই সমস্ত অঞ্চলে, অর্থাৎ "উত্তর-ভারতে—গঙ্গাতটে, বাঙ্গলা দেশে, উড়িষ্যায় এবং অনেকটা মধ্য-ভারতে" হিন্দুসমাজে চণ্ডীপূজার বিস্তৃতি হয়েছে অধিক। এরা মানুষের একাধিক জীবনে বিশ্বাস করত, এখনও করে। আবহমান কাল ধরে মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এরা সময় সময় আহার্য্য দান করে। এদের এই সমস্ত ধারণা ও ক্রিয়া-কলাপই পরবর্ত্তীকালে হিন্দুসমাজের পুনর্জন্মবাদ, পরলোকবাদ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে রূপান্তরিত হ'য়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

উচ্চতর সমাজে চণ্ডীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রতাপ বর্দ্ধিত হওয়ার পর অনার্য্য সমাজ ও বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে আরও কয়েকটি স্ত্রীদেবতা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেন এবং আর্য্যানার্য্য মিশ্র কল্পনায় নানা রূপ ও গুণের অধিকারিণী হন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাহিনীর মধ্যে যে অনৈক্য দেখা যায় তার কারণও এই। বর্ণহিন্দুর সমাজে চণ্ডীর প্রতিপত্তি লক্ষ্য ক'রে এই সমস্ত পরবর্তী-কালে আগতা দেবীরাও চরিত্রগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও নামের শেষে 'চণ্ডী' পদবী যোগ করে নিজেদের সম্ভ্রান্ত ক'রে নিয়েছিলেন। মঙ্গলচণ্ডী এই রকম কোন এক দেবী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় কোন পুরাণ বর্ণিত কাহিনী নয়—চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীর লৌকিক উপাখ্যানই

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। "এই চণ্ডী শুধু বিপদ-ত্রাণ-কারিণী; ইনি বসন্তকালে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যে বেশে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আসেন নাই—এখানে ইনি শুধু বরাভয়দাত্রী, সঙ্কটবারিণী।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দু'টি উপাখ্যান আছে। একটি কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, অপরটি ধনপতি সদাগরের কাহিনী। প্রথম অর্থাৎ কালকেতু ব্যাধের গল্পটি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, আরণ্য ব্যাধ ও শবরগণই চণ্ডীদেবীর আদি পূজক ছিল। চণ্ডী বন্য পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। সেজন্য পশুরাজ সিংহকে দেখি দেবীর প্রধান বাহনরূপে। হস্তী ও গোধিকা প্রভৃতি অতিকায় ও প্রাচীন জীবও দেবীর বাহন রূপে কল্পিত হ'য়েছে। ভাস্কর্য্যেও তার নিদর্শন মেলে। বাঙ্গলাদেশে প্রাপ্ত চণ্ডীমূর্ত্তিগুলির মধ্যে দণ্ডায়মানা ও চতুর্ভূজা মূর্ত্তির সংখ্যাই বেশী। অধিকাংশ প্রতিমার পাদপীঠে একটি গোধিকার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই মূর্ত্তিগুলিতে লৌকিক কল্পনার সঙ্গে পৌরাণিক কল্পনার সমন্বয় হ'য়েছে। অতএব ধারণা করা যায়, লোকমুখে প্রচলিত এই কাহিনীর যখন জন্ম হয় চণ্ডী তখন ব্যাধ বা শবর জাতির দেবতা ছিলেন। পশুরুধিরে ও মাংসে এই দেবীর তুষ্টি-বিধান ব্যাধ সংস্পর্শের কথাই সমর্থন করে। উচ্চবর্ণের সমাজে তখনও তিনি ছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয়া। কালক্রমে ইনিই 'চণ্ডী' নামে বর্ণহিন্দুর সমাজে আবির্ভূতা হন এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রভাবে দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীতে রূপান্তরিতা হন। দ্বিতীয়, অর্থাৎ ধনপতি সদাগরের গল্পটি বোধকরি অনেক পরবর্ত্তীকালের। এখানে যে চণ্ডীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সঙ্গে ব্যাধ কিংবা বন্যপশুদের সংস্রব নেই। ভক্তের মঙ্গল সাধন করাই তাঁর একমাত্র কাজ। এঁর প্রকৃত নাম 'মঙ্গলচণ্ডী' এবং সম্ভবত ইনি ছদ্মবেশিনী বৌদ্ধ আদ্যাদেবী। এই দেবী যে সময়ে বৌদ্ধসমাজ থেকে এসে উচ্চবর্ণের হিন্দু স্ত্রী-সমাজে পূজা লাভ করে সে যুগে সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বণিকদের দ্বারা স্বীকৃতা হবার পথ অনুসন্ধান করছিলেন এ কাহিনী খুব সম্ভব সেই সময়ের। পরবর্ত্তীকালে পৌরাণিক প্রভাবে লৌকিক চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীরা পৌরাণিক গৌরী, পার্ব্বতী, অন্নপূর্ণা এবং দুর্গার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে সমন্বিতরূপে দেখা দিলেন। "ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্" এই চণ্ডীর কাছে ত্রিলোকের সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ প্রহরণ উপহার দিয়ে প্রণত হ'লেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রভাবে রচিত দুর্গামঙ্গল বা দুর্গাপুরাণগুলি

ালক্রমে চণ্ডীমঙ্গলের স্থান অধিকার করে নেয়। আগে শারদীয়া দুর্গাপুজোর সময় পুজামণ্ডপে চণ্ডীমঙ্গল পাঠ করা হত। কিন্তু পুরাণ-বর্ণিত চণ্ডীর ধ্যান-কল্পনার সঙ্গেই দেবী প্রতিমার সাদৃশ্য থাকায় দুর্গামঙ্গলগুলিই সমাদৃত হতে থাকে। অন্তঃপুরবাসিনিদের কাছে চণ্ডীমঙ্গলের আদর এখনও কিছুটা আছে। পল্লীগ্রামে তাঁরা এখনও সংসারের মঙ্গল কামনায় মঙ্গল-চণ্ডীর পুজা করে থাকেন এবং সেই উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্র ব্রতকথা পাঠ করেন।

অনেকে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর ঐতিহাসিকত্বে আস্থাবান। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন মঙ্গলকোট, কোগ্রাম প্রভৃতি স্থান রাজা বিক্রমকেশরীর রাজধানী, ধনপতি সদাগর ও তস্যপুত্র শ্রীমন্তের নিবাসভূমি বলে খ্যাত। কোগ্রামে মঙ্গলচণ্ডীর ও ভৈরব কপিলাম্বরের প্রাচীন দেউল বর্ত্তমান এবং কাছেই একটি পতিত ভূখণ্ড শ্রীমন্ত-ডাঙ্গা নামে কথিত হয়। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্ত্তমান কোগ্রামই অতীতের সেই উজানিনগর। কোগ্রাম তন্ত্রোক্ত একান্নটি শক্তিপীঠের অন্যতম। এখানে নাকি দেবীর দক্ষিণ কনুই পতিত হ'য়েছিল। এই লোক প্রবাদকে উপেক্ষা করা শক্ত কিন্তু কোন নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত পণ্ডিতগণ এই কাহিনীর ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করেন না। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর ন্যায় চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীও সম্ভবত লোকমুখে প্রচলিত কোন প্রাচীন কল্পিত উপাখ্যানকে ভিত্তি করে পল্লবিত হ'য়েছে। কবিরা এই গল্পকে নিয়ে কাব্য রচনা করার সময় নায়ক-নায়িকাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করতে যত্নবান হ'য়েছেন— সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায়। বাস্তবতার গন্ধ থাকায় জনসাধারণের কাছে কাব্যের সমাদর তো হ'য়েছেই উপরন্তু সত্যঘটনা ব'লে কীর্ত্তিত হওয়ায় দেবীর মহিমাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

## কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান

দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরের দ্বারা মর্ত্ত্যভূমিতে স্বীয় পুজো প্রচারের জন্য চণ্ডী ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। স্বর্গবাসী নীলাম্বরকে কি ভাবে মর্ত্ত্যে পাঠান যায়? দেবী শিবকে অনুরোধ ক'রলেন নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতে। নিরপরাধকে অহেতুক শাপ দিতে শিব সম্মত হ'লেন না। তখন ছলনাময়ী দেবী স্বামী ভোলানাথকে ছলনা ক'রে নীলাম্বরকে দোষী প্রতিপন্ন করা স্থির করলেন। নীলাম্বর পিতার শিব-

পূজার জন্য যে পুষ্প চয়ন ক'রে এনেছিলেন তাতে দেবী কীটরূপ ধারণ ক'রে অবস্থান ক'রলেন এবং সেই ফুলে ইন্দ্র মহাদেবের পূজা করার কালে কীটরূপিণী দেবী শিবের মস্তকে দংশন ক'রে তাঁকে যন্ত্রনায় অস্থির ক'রে তুল্‌লেন। শিব নীলাম্বরকে মৃগয়াজীবি ব্যাধরূপে মর্ত্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দিলেন। নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়াও স্বামীর অনুগামিনী হ'য়ে এলেন। মর্ত্ত্যলোকে এ'দের নাম হ'ল কালকেতু ও ফুল্লরা।

শৈশব হ'তেই কালকেতুর দুর্দ্দান্ত তেজ, অমিত বল, দুর্জ্জয় সাহস। পাঁচ বছর বয়সেই সে "শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল" তার "দুই বাহু লোহার শাবল" সদৃশ। স্বাস্থ্যের অনুপাতে তার ভোজনও সামান্য ছিল না। "গ্রাসগুলি তোলে যেন তে আঁটিয়া তাল"। এগার বছর বয়সে সোমাই ওঝার ঘটকালিতে সঞ্জয় ব্যাধের কন্যা ফুল্লরার সঙ্গে কালকেতুর বিবাহ হ'ল। সঞ্জয় ব্যাধ পাত্র পক্ষের ঘটকের কাছে নিজ কন্যার পরিচয় দিয়েছিল,—

> "এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লরা।
> কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পসরা॥
> রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
> বন্ধুজন মিলিয়া ইহার গুণ গানে॥" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

পিতার এই বর্ণনায় এতটুকু স্নেহান্ধতা ছিল না। কথাগুলি সর্ব্বাংশে সত্য।

কালকেতু সারা দীর্ঘ দিন বনে বনে শীকার ক'রে ফেরে। সন্ধ্যায় ভারে ভারে মৃত পশু কাঁধে করে ঘরে ফিরে আসে। সামান্য ব্যঞ্জনসহ গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে কয়েক হাঁড়ি ভাত শেষ ক'রে স্ত্রীকে বলে, "রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে? " কালকেতুর সংসারে অভাব ছিল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল শান্তি। মৃতপশুর মাংস, হাড় ও চামড়া বাজারে বিক্রয় ক'রে তাদের দিনপাত হ'ত।

কালকেতু রোজ অসংখ্য পশু বধ ক'রত। শুধু সিংহকে দেবীর বাহন ব'লে বধ করত না—ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে তাকে সামান্য একটু শিক্ষা দিয়েই নিস্কৃতি দিত। তাতেই "তৃষ্ণায় আকুল সিংহ পান করে নীর"। কালকেতুর ভয়ে পশুগণ চণ্ডীর শরণাপন্ন হ'ল। দেবী তাদের অভয় প্রদান ক'রলেন। দেবীর মায়ায় সমস্ত বনভূমি কুজ্ঝটিকায় আবৃত হ'ল। কালকেতু কয়েকদিন

বনের মধ্যে ঘুরেও কোন পশুর সন্ধান পেল না। এ ক'দিন ব্যাধ-দম্পতির অনাহারে কাটল। সেদিন কালকেতু,—

"প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া,
খর খুর কাছে তিনবাণ।
শিরে বাঁধা জাল-দাঁড়ি, কর্ণে ফটিকের কড়ি,
মহাবীর করিল প্রয়াণ॥" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

কালকেতু শীকারে যাত্রা ক'রে পথে বহু সুমঙ্গল চিহ্ন দেখতে পেল। হরষিত অন্তঃকরণে সে চলেছে। অকস্মাৎ পথে এক স্বর্ণবর্ণ গোধিকা দেখতে পেল। গোসাপ যাত্রার পক্ষে অশুভ চিহ্ন। সমস্ত আশা নির্ম্মূল হওয়ায় ক্রুদ্ধ কালকেতু সেটিকে ধনুর্গুণে বেঁধে নিল এই ভেবে যে যদি অন্য শীকার জোটে তাহলে এটিকে ছেড়ে দেবে, না হলে এটিকেই শিকপোড়া ক'রে খাবে।

দেবীর মায়ায় সেদিনও কালকেতুর সমস্ত পরিশ্রম বিফল হ'ল। সন্ধ্যায় অবসন্ন দেহে ক্ষুণ্ণ মনে সে ঘরে ফিরল। সারাদিন সাগ্রহ প্রতীক্ষার পর শূন্য হাতে তাকে ফিরতে দেখে ফুল্লরা অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। কালকেতু তাকে গোসাপটির ছাল ছাড়িয়ে রান্না ক'রতে বলল এবং তার সখী বিমলার কাছ থেকে কিছু ক্ষুদ ধার ক'রে আনতে বলে নিজে বাসি মাংসের পসরা নিয়ে বাজারে চলে গেল।

সখীগৃহ থেকে দু'কাঠা ক্ষুদ ধার ক'রে ফুল্লরা ঘরে ফিরল। এদিকে গোধিকরূপিণী চণ্ডী অপরূপ লাবণ্যময়ী সুন্দরী যুবতীর বেশে কুটীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর রূপের প্রভায় ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরখানা ঝল্‌মল্‌ ক'রছে। তাঁকে দেখে বিস্মিতা ফুল্লরা প্রণাম ক'রে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন যে, সতীনের সঙ্গে কলহ ক'রে তিনি এসেছেন, কালকেতুই তাঁকে এনেছে এবং তিনি সেই ব্যাধ কুটীরেই থাকবেন মনস্থ ক'রেছেন। ভগ্ন কুটীরে অশেষ দারিদ্র্য ও উপবাসের মধ্যে একমাত্র স্বামীপ্রেমকে আশ্রয় ক'রেই ফুল্লরা সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রেছে। কিন্তু দেবীর কথা শুনে ও তাঁর রূপলাবণ্য দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল। মনের আশঙ্কা গোপন ক'রে ফুল্লরা সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক সতী রমণীদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বহু নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা ক'রল যে, স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীলোকের একদণ্ডও

পরগৃহবাস উচিত নয় এবং দেবীর তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দেবীকে প্রবোধ ও মন্ত্রণা দিল,—

"সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে,
অভিমানে ঘর ছাড়বে কেনি।
এ বিরহ-জ্বরে, যদি স্বামী মরে
কোন ঘাটে খাবে পানী॥"

পৌরাণিক দৃষ্টান্ত, নীতিকথা, হিতোপদেশ সমস্তই ব্যর্থ হয় দেখে উপায়হীনা ফুল্লরা তার সংসারের নিত্য অভাব অনটনের কথা, দ্বাদশ মাসের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী বিবৃত করে দেবীকে ভয় দেখিয়ে বিদায় করার চেষ্টা ক'রল। কিন্তু সমস্তই বিফল হ'ল। দেবীর সেইখানেই বাস করার অভিপ্রায় অটুট রইল। তিনি জানালেন তাঁর অনেক ধন-সম্পদ আছে, তিনি ব্যাধের দারিদ্র্য মোচন করবেন। তাছাড়া তিনি তো স্বেচ্ছায় আসেননি,—

"এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে।
* * *
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে॥"

অভিমানিনী ফুল্লরা আর সহ্য করতে পারল না। অশ্রুপূর্ণচক্ষে ছুটল গোলাঘাটে—স্বামীর উদ্দেশ্যে। কালকেতু কিছুই জানত না, সমস্ত শুনে বিস্মিত হ'য়ে ফুল্লরার সঙ্গে ছুটে এল কুটীরে। সেখানে এসে দেখে ফুল্লরার কথা সত্য—"ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরখানা করে ঝলমল। কোটি চন্দ্র বিরাজিত বদনমণ্ডল॥" কালকেতুও নানাভাবে দেবীকে অস্পৃশ্য ব্যাধের শ্মশানসদৃশ কুটীর পরিত্যাগ ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান করতে উপদেশ দিল। নিজেরা লোকজন সঙ্গে নিয়ে গৃহে পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইল। দেবী তবু নিরুত্তর। ব্যাধ ব্যাকুলভাবে মিনতি করল "চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গো নিলয়।॥" দেবী তবু যেতে চান্না। তখন কালকেতুর ক্রোধ হ'ল। অন্য উপায় না দেখে সে ধনুতে শর সন্ধান ক'রল। চণ্ডী সরলা ফুল্লরার অপরিমেয় স্বামীপ্রেম এবং বীর কালকেতুর নির্ম্মল চরিত্রবলে মুগ্ধ হ'য়ে জানালেন যে তিনি স্বয়ং চণ্ডী, কালকেতুকে বর দিতে এসেছেন। কিন্তু কালকেতুর তা বিশ্বাস হয়না। সে সবিনয়ে বলল, "হিংসামতি ব্যাধ আমি

অতি নীচ জাতি। কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্ব্বতী॥" দেবী তখন মহিষমর্দ্দিনী রূপ পরিগ্রহ ক'রে সন্দেহ ভঞ্জন করলেন। ব্যাধ দম্পতি কেঁদে তাঁর চরণে পড়ল। চণ্ডী তাদের একটি অঙ্গুরী ও সাত ঘড়া ধনরত্ন দিলেন।

কালকেতু মুরারি শীলের কাছে অঙ্গুরী ভাঙ্গাতে গেলে ধূর্ত্ত বেণে মুরারিশীল তাকে ঠকাতে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষে দেবীর স্বপ্নাদেশে যথার্থ মূল্যই দিল। দেবীর আদেশে কালকেতু বন কাটিয়ে নগর পত্তন ক'রে গুজরাটে রাজধানী স্থাপন করল। খলপ্রকৃতির ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর মন্ত্রীত্ব প্রার্থনা ক'রে বিফল হ'য়ে কলিংগাধিপতিকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্ররোচনা দিল।

যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত হ'ল এবং ভাঁড়ুদত্তের শঠতায় বন্দী হ'ল। কারাগারে কালকেতু চণ্ডীর স্তব ক'রল। দেবী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নাদেশ দিলেন তাঁর পরমভক্ত কালকেতুকে মুক্ত করে তাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'রতে। এই আদেশ অনুসারে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে মুক্ত ক'রে স্বয়ং তাকে গুজরাটের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। মিত্ররূপে তিনি তার সহায় হলেন। দেবীরও পূজার প্রচার হ'ল।

কিছুদিন পরে অভিশাপের অন্ত হ'ল। কালকেতু ও ফুল্লরা নীলাম্বর ও ছায়া রূপ ধারণ ক'রে স্বর্গে ফিরে গেল।

## ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

অমরাবতীর অপ্সরা রত্নমালা নৃত্যকালে তালভঙ্গ হওয়ার অপরাধে অভিশপ্ত হ'য়ে লক্ষপতি বণিকের ঔরসে রম্ভাবতীর গর্ভে খুল্লনা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

উজানিনগরের যুবক ধনপতি সদাগর একদিন পায়রা উড়াচ্ছিলেন। শ্যেন পক্ষীর ভয়ে ভীত একটি পায়রা উড়ে খুল্লনা সুন্দরীর বস্ত্রাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ ক'রল। পারাবতের অনুসন্ধানে ধনপতি সেখানে এসে উপস্থিত হ'য়ে কপোতটি প্রার্থনা করলেন। খুল্লনা জানতে পারল ধনপতি তার খুল্লতাত কন্যা লহনার স্বামী। তাই সে কৌতুক করে পায়রাটি নিয়ে চলে গেল। ঈষদুদ্ভিন্ন যৌবনা খুল্লনার রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে ধনপতি তার সঙ্গে নিজের বিবাহের প্রস্তাব ক'রে বয়স্য জনার্দ্দন ওঝাকে পাঠালেন।

কুলে-শীলে, ধনে-মানে ও শিক্ষা-দীক্ষায় ধনপতি শ্রেষ্ঠ, তাই কন্যাপক্ষের সম্মতি পেতে বিলম্ব হ'লনা। কিন্তু তাঁর প্রথমা পত্নী লহনা সুন্দরী এ সংবাদে অভিমান ক'রে বসল। শেষে অনেক মিষ্ট কথায় তাকে সন্তুষ্ট ক'রে এবং একখানি পাটশাড়ী ও চুড়ি গড়াবার জন্য পাঁচ তোলা সোনা দিয়ে সদাগর এ বিবাহে তার সম্মতি লাভ করলেন।

বিবাহের পর ধনপতিকে রাজার আদেশে একবার গৌড়ে যেতে হ'ল। দ্বাদশ বর্ষীয়া খুল্লনাকে সদাগর লহনার হাতে সমর্পণ ক'রে গেলেন। স্বামীর বাক্যে লহনা খুল্লনাকে আন্তরিক যত্ন ও আদর করতে লাগল।

"দুসতীনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ,
সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা॥"

কিন্তু মন্থরা সদৃশা দুর্ব্বলা দাসীর দুই সতীনের এরূপ সম্প্রীতি সহ্য হ'লনা। সে চিন্তা করল,—

"যেই ঘরে দুসতীনে না হয় কোন্দল।
সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল॥
একের করিয়া নিন্দা যায় অন্য স্থান।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান॥"

সে লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে তাকে অনেক উপদেশ দিল। আদর যত্নে খুল্লনার রূপলাবণ্য বৃদ্ধি পেলে স্বামীর কাছে তারই আদর বাড়বে এবং লহনার পক্ষে তা কত বড় সর্ব্বনাশ সে কথা বোঝাতে ছাড়ল'না। লহনার প্রকৃতি খুব সরল ও সুন্দর। কিন্তু সেই সংগে সে নির্ব্বোধ। তাই সহজেই দুর্ব্বলা দাসী তাকে আয়ত্ত ক'রে ফেল্‌লে। খুল্লনাকে স্বামীর চক্ষের বিষ ক'রে তোলার জন্য হিতাহিত জ্ঞান শূন্যা হ'য়ে লহনা নানা মন্ত্র তন্ত্র ও ঔষধের ব্যবস্থা করল। তাতেও যখন কোন ফল হ'ল না তখন স্বামীর এক জাল পত্র নিয়ে খুল্লনাকে দিল। তাতে খুল্লনার প্রতি নির্দ্দেশ ছিল যে সে ছাগল চরাবে, ঢেঁকিশালে বাস করবে, এক বেলা আধপেটা খেতে পাবে ও 'খুঁয়াবস্ত্র' পরবে। খুল্লনা বুদ্ধিমতী, সে সমস্তই বুঝল। সে এই জাল পত্রের নির্দ্দেশ পালন ক'রতে প্রথমে রাজী হ'ল না। শেষে লহনা বলপ্রয়োগ করে তাকে পত্রানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য ক'রল।

খুল্লনা নিরুপায় হ'য়ে বনে বনে ছাগল চরায়, খুঁয়া কাপড় পরে, অর্দ্ধাশনে থাকে ও ঢেঁকিশালে শয়ন করে। দুঃখে তার দিন কাটে।

"ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল।
ছোট হাতে, পাত মাথে, যেমন পাগল॥
নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি।
দেখিয়া কৃষাণ সব দেয় গালাগালি॥
শিরীষ কুসুম তনু অতি অনুপাম।
বসন ভিজিয়া তার গায় পড়ে ঘাম॥"

বসন্তের আগমনে বনের শ্যামল প্রান্তর নানা পুষ্পে সজ্জিত হ'য়ে উঠেছে। ভ্রমরের মধুগুঞ্জন, কোকিলের কুহুরবে বয়ঃসন্ধিকালের খুল্লনা পতির বিরহ ব্যথায় ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। লতাকে সখি সম্বোধন ক'রে, ভ্রমরকে মিনতি ক'রে, "চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত, খাও ভ্রমরীর মাথা॥" কোকিলকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—

"সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ॥"

একদিন খুল্লনা পথশ্রান্তা হ'য়ে বনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। চণ্ডী খুল্লনাকে স্বপ্নে মাতৃরূপে দেখা দিয়ে বল্লেন,—

"কত দুঃখ আছে ঝি তোমার কপালে।
সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে॥
তোর দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিঁধে ঘুণ।
আজি লো লহনা তোরে করিবেক খুন॥"

খুল্লনা জেগে উঠে দেখে 'সর্ব্বশী' ছাগলটি নেই। অনেক খুঁজেও সেটিকে পাওয়া গেল না। কেঁদে কেঁদে বনে ঘুরতে ঘুরতে সে পঞ্চকন্যার দেখা পেল। তারা তাকে চণ্ডীপূজা শিখিয়ে দিল। চণ্ডী দেখা দিয়ে তাকে স্বামী পুত্র লাভের বর দিয়ে গেলেন। চণ্ডী লহনাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন খুল্লনাকে আগের মত আদর যত্ন করতে। সে রাত্রে খুল্লনা বনেই ছিল। পরদিন প্রভাতে খুল্লনা বাড়ী ফিরলে অনুতপ্ত চিত্তে লহনা তাকে সাদরে গ্রহণ করে আবার পূর্ব্বের মত আদর যত্ন করতে লাগল।

এদিকে ধনপতি গৌড়দেশে বিলাস-ব্যসনে মত্ত হ'য়ে গৃহের কথা ভুলে ছিলেন। চণ্ডীর মায়ায় সেই রাত্রে ধনপতি স্বপ্নে খুল্লনা ও লহনাকে দেখে বাড়ী ফিরলেন। লহনা নিজের শিথিল সৌন্দর্য্যকে যতদূর সম্ভব মেজে ঘষে স্বামী সন্দর্শনে গেল।

সদাগরের গৃহে সেদিন বহু লোক নিমন্ত্রিত। অনেক আয়োজন হ'য়েছে। খুল্লনা সদাগরের ইচ্ছায় রন্ধন করল। চণ্ডীর বরে রান্না খুব ভাল হল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পরিতৃপ্ত হ'য়ে খুল্লনার খুব প্রশংসা করলেন। লহনা অভিমান ক'রে রইল। ক্ষমাশীলা খুল্লনা লহনার কাছে গিয়ে,—

"সম্ভ্রমে খুল্লনা আসি ধরিল চরণে।
ঘুচিল কোন্দল দোঁহে বসিল ভোজনে॥"

কিছুদিন পরে ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধ। আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতিবর্গ নানা স্থান হ'তে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এলেন। ধনপতি সর্ব্বপ্রথম চাঁদ সদাগরকে মালা চন্দন দিলেন। এই নিয়ে বণিক্‌সমাজে কলহ আরম্ভ হ'ল। এই কলহের সুযোগে সভাস্থ অনেকে খুল্লনার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে অন্নজল গ্রহণ করতে আপত্তি তুল্‌লেন। তাঁরা দাবী করলেন, খুল্লনা বনে বনে একাকিনী ছাগল চরাত—যদি সে সতী হয় পরীক্ষা দিক, নতুবা ধনপতি এক লক্ষ টাকা সমাজের কাছে জরিমানা দিন। ধনপতি লহনাকে এই অপরিণামদর্শী কার্য্যের জন্য ভর্ৎসনা ক'রলেন এবং খুল্লনাকে আশ্বাস দিলেন যে এক লক্ষ মুদ্রা দিয়ে সমাজপতিদেব শান্ত করবেন। কিন্তু খুল্লনা তাতে সম্মত হ'লনা। সে বুঝল' আজ যাঁরা লক্ষ মুদ্রা নিয়ে অন্নগ্রহণ করবেন অন্য এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে তাঁরা এই ছুতোয় হয়ত দ্বিগুণ অর্থ দাবী করবেন এবং এইভাবে ধনপতিকে বারে বারে পীড়ন করতে থাকবেন। অথচ তার নিজের মিথ্যা কলঙ্ক ঘুচবে না।

খুল্লনার পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। তাকে জলে ডোবাতে চেষ্টা করা হ'ল, সর্প দংশন করান হ'ল, জলন্ত লৌহদণ্ডে দগ্ধ করা হ'ল; অবশেষে জতুগৃহে তাকে বন্ধ ক'রে অগ্নি সংযোগ করা হ'ল। কিন্তু খুল্লনার কোন অনিষ্টই হ'ল না। সতীত্বের মহিমায় সে আরো উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিল। সমাজ-পতিরা পরাভূত হ'য়ে খুল্লনাকে প্রণাম করলেন।

সুখে দিন যায়। এমন সময় রাজভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়ায় রাজা ধনপতিকে সিংহল দেশে যেতে আদেশ দিলেন। সপ্তডিঙ্গা

বোঝাই ক'রে ধনপতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। খুল্লনা তখন গর্ভবতী—সাধু সেই মর্ম্মে 'জয়পত্র' লিখে দিলেন। লগ্নাচার্য্য জানালেন যে যাত্রার নির্দ্ধারিত সময় অশুভ। ধনপতি তাঁকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলেন। পতির মঙ্গলের জন্য খুল্লনা ঘট পেতে চণ্ডীপূজা করতে বসেছিল। পরম শৈব ধনপতি ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে "ডাকিনী দেবতা" ব'লে চণ্ডীর ঘটে লাথি মেরে প্রবাস যাত্রা ক'রলেন। এই অপমানের শোধ চণ্ডী ধনপতির উপর নিলেন অকূল সমুদ্রে। প্রবল তুফানে তাঁর ছয়টি নৌকা ডুবল। অবশিষ্ট একমাত্র 'মধুকর ডিঙ্গা' আশ্রয় ক'রে সদাগর সিংহল পৌঁছলেন। পথে কালীদহে চণ্ডী তাঁকে গজগ্রাসশীলা 'কমলে-কামিনী' মূর্ত্তি দেখালেন। এই মূর্ত্তি যেমন অলীক তেমনি অদ্ভুত।

সাধুকে সিংহলরাজ পরম সমাদরে গ্রহণ ক'রলেন। কিন্তু তাঁর মুখে কমল বনে অপরূপ সুন্দরী কামিনীর হস্তী গ্রাসের কথা শুনে কারও বিশ্বাস হ'ল না। তখন সিংহলরাজ ও ধনপতির মধ্যে অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষরিত হল যে সদাগর এই "কমলেকামিনী" মূর্ত্তি দেখাতে পারলে রাজা তাঁকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করবেন, আর না দেখাতে পারলে ধনপতিকে দ্বাদশ বৎসর কারাগারে বন্দী থাকতে হবে। সকলে কালীদহে গিয়ে কিন্তু এ দৃশ্য দেখতে পেলেন না। সাধু কারাগারে বন্দী হলেন। চণ্ডী তাঁকে স্বপ্নে জানালেন যে তাঁর পূজা করলে সদাগর এ দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ পাবেন। কিন্তু শিবোপাসক ধনপতি দম্ভভরে বল্লেন,—

"যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥"

এদিকে শুভদিনে খুল্লনার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। মালাধর নামে এক গন্ধর্ব্ব শিবের শাপে খুল্লনার পুত্র হ'য়ে জন্ম নিলেন। এই সুন্দর শিশুর নাম হ'ল শ্রীমন্ত। বাল্যের চপলতার অবসানে শ্রীমন্ত অল্প সময়েই নানা শাস্ত্রে ও কাব্য-সাহিত্যে সুপণ্ডিত হ'য়ে উঠলেন। একদিন গুরুকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি সদুত্তর দিতে না পারায় শ্রীমন্ত তাঁর প্রতি পরিহাস সূচক বাক্য প্রয়োগ করেন। গুরু কুপিত হ'য়ে শ্রীমন্তের জন্ম সম্বন্ধে কটাক্ষ করলেন। তরুণ শ্রীমন্ত সেই দিনই পিতার অনুসন্ধানে সিংহল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। দেশের রাজার অনুরোধ, মাতার অশ্রুধারা কিছুই তাঁকে নিরস্ত ক'রতে পারল না। সাত ডিঙ্গা সাজিয়ে শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রা করলেন।

কালীদহের নীল জলরাশির মধ্যে শ্রীমন্তও সেই পরমাশ্চর্য্য 'কমলে কামিনী-মূর্ত্তি' দেখে সিংহলের রাজাকে সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা বল্লেন। কিন্তু কেউই এ কথা বিশ্বাস করল না। এবারে পণ হ'ল যে শ্রীমন্ত যদি রাজাকে ঐ মূর্ত্তি দেখাতে পারেন তবে রাজা তাঁকে নিজ কন্যার সংগে বিবাহ দেবেন ও অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করবেন। আর, দেখাতে না পারলে দক্ষিণ মশানে শ্রীমন্তের শিরচ্ছেদ হবে। চণ্ডীর ছলনায় শ্রীমন্ত রাজাকে এই মূর্ত্তি দেখাতে পারলেন না। সর্ত্ত অনুযায়ী তাঁকে মশানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে শ্রীমন্ত একাগ্র চিত্তে চণ্ডীর স্তব করলেন। দেবী জরতী ব্রাহ্মণীর বেশে এসে শ্রীমন্তকে কোলে নিয়ে বসলেন। চণ্ডীর ভূত প্রেতের কাছে পরাজিত হ'য়ে যুবরাজ ও অনেক সৈন্য হত হ'ল, বাকী সৈন্যগণ পলায়ন ক'রল। সিংহলরাজ চণ্ডীর অনুগ্রহে 'কমলেকামিনী'-মূর্ত্তি দেখলেন। চণ্ডীর অনুগ্রহে মৃত সৈনিকেরা প্রাণলাভ করল। পিতা পুত্রে মিলন হ'ল। রাজকন্যা সুশীলার সংগে মহাসমারোহে শ্রীমন্তের বিবাহ হ'ল। পিতাপুত্রে স্বদেশ যাত্রা ক'রলেন। পথে দেবীর কৃপায় ধনপতি তাঁর জলমগ্ন ছয় ডিঙগা ফিরে পেয়ে চণ্ডীর পূজা ক'রতে সম্মত হ'লেন। উজানিনগরে এসে শ্রীমন্ত রাজা বিক্রমকেশরীকে 'কমলেকামিনী'-মূর্ত্তি দেখিয়ে সন্তুষ্ট করলেন এবং রাজ-কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ ক'রলেন।

ধনপতি শিবপূজা ক'রতে বসে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দেখলেন,—

"ধনপতি পূজা করে মৃত্তিকা-শঙ্কর।
নানা পরিপাটী করি পূজা করে হর॥
মুদিতনয়নে সাধু ভাবে মহেশ্বর।
পার্ব্বতী হইল তার অর্দ্ধ কলেবর॥
বামভাগে সিংহ হৈল দক্ষিণভাগে বৃষ।
পতি-বামভাগে গৌরী দক্ষিণে মহেশ॥
বিভূতি-ভূষণ হর স্ফটিক বরণ।
বামভাগে হৈলা গৌরী বরণ কাঞ্চন॥
অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধেক সিন্দূর।
ডানি কর্ণে অহি বামকর্ণে মণিপুর॥
ডানি ভাগে জটাজূট বামে অলিকেশ।
অর্দ্ধেক ভূষণ অহি অর্দ্ধ রত্নদেশ॥

বামে শঙ্খ দক্ষিণেতে ভূজঙ্গ-বলয়।
কেবল ভাবিতে হর ধ্যান নাহি রয়॥
অর্দ্ধনারী শিব বিনে না রহে ধেয়ান।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমান॥
দুইজনে একতনু মহেশ পার্ব্বতী।
না জানিয়া এত দুঃখ পাইলুঁ মূঢ়মতি॥"

শিব ও পার্ব্বতী অভিন্ন জেনে তিনি অনুতপ্ত চিত্তে দেবীর পূজা করলেন। চণ্ডীর পূজা জগতে প্রচারিত হ'ল। যথাসময়ে শাপ মোচনের পর শাপভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরে গেলেন।

## চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ

### মাণিক দত্ত

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি রচয়িতা সম্ভবত মাণিক দত্ত। অবশ্য এই কাহিনী তাঁর স্বকপোল কল্পিত নয়। লোক মুখে প্রচলিত কোন প্রাচীন অথবা গ্রাম্য গীতকে সুসম্বদ্ধ কাহিনীর আকারে প্রথম গ্রথিত করার গৌরব বোধ হয় তাঁরই। পরবর্ত্তীকালের কবিরা এই ক্ষুদ্র কাব্যকে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী দীর্ঘ ও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। মুক্তারাম সেন, দ্বিজ হরিদাস, জনার্দ্দন, ভবানীশংকর প্রভৃতি অনেক কবিই এই উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা ক'রেছেন। কিন্তু মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলের দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি। এ'দের হাতে এই কাব্য পূর্ণতা লাভ ক'রেছে।

ডক্টর ꠶দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়"এ অনুমান করেছেন, মাণিক দত্ত সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রারম্ভে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের বন্দনার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের গীত-পথ পরিচায়ক কবি মাণিক দত্তকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন,—

"মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয়॥" (দিগ্‌বন্দনা)

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল যে বেশ প্রাচীন তার একটি প্রমাণ এই যে

এই কাব্যে হিন্দু পুরাণ-বহির্ভূত সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা অংশ বৌদ্ধ শূন্যবাদ এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাবযুক্ত। এই অংশ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের অনুরূপ।

মাণিক দত্ত মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন বলে অনেকের অনুমান। তাঁর কাব্যের প্রচার এই অঞ্চলেই বেশী হ'য়েছিল। কাব্যের মধ্যেও গৌড়ের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান, দেব মন্দিরাদি ও নদী-নালা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তাছাড়া ভাষার মধ্যেও এই অঞ্চলের বিশেষত্ব দেখা যায়। কবির আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায় যে, তাঁর নিবাস ফুলুয়া নগর। শ্রীযুত হরিদাস পালিত মহাশয় মনে করেন, মালদহ জেলার ফুলবাড়ীই সেই স্থান। কবি অন্ধ ও খঞ্জ ছিলেন। দেবীর কৃপায় তিনি আরোগ্যলাভ করেন এবং গানের দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করতেন। তাঁর সরল রচনা গানের উপযোগী ও সাধারণ গ্রাম্য ভক্ত শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী ক'রে ছড়ার আকারে রচিত হ'য়েছিল। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের যে সামান্য অংশ পাওয়া গেছে তা থেকেই বোঝা যায় কাব্যটির যথেষ্ট বৈশিষ্ট ছিল।

## মাধবাচার্য্য

মাধবাচার্য্য চণ্ডীমঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আসন প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে।

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন-অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদীতটবাসী পরাশর।
যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধ্যে সম সুরগুরু॥
তাহার তনুজ আমি মাধব-আচার্য্য।
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥

* * *

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত॥
সারদার চরণসরোজমধুলোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে॥"

কাব্য মধ্যে কবির এই আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায়, মুঘল সম্রাট্ আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের সপ্তগ্রাম নিবাসী মহাপণ্ডিত পরাশরের পুত্র মাধবাচার্য্য ১৫০১ শকাব্দে (খৃষ্টীয় ১৫৭৯ অব্দে) চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন। মাধবাচার্য্যের রচিত একটি 'গঙ্গামঙ্গল' পুঁথিও পাওয়া গেছে। মাধবাচার্য্য পৈত্রিক নিবাস স্থান পরিত্যাগ করে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন মেঘনা নদীর তীরে নবীনপুর গ্রামে (বর্ত্তমান গোঁসাইগঞ্জ) বাস স্থাপন করেন বলে অনেকের অনুমান। পূর্ব্ববঙ্গ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাধবাচার্য্যের পুঁথির ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে সর্ব্বপ্রথম প্রথম শ্রেণীর কাব্যের মর্য্যাদা দান করার গৌরব মাধবাচার্য্যেরই। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র তাঁরই অনুগামী। মাধবাচার্য্যের রচনা অনাড়ম্বর ও বাস্তবধর্ম্মী। সেই সঙ্গে তাঁর কাব্যে একটা বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়।

অল্প কথায় কালকেতু ব্যাধের শৈশব বর্ণনায় মাধবাচার্য্য লিখেছেন,-

"তবে বাড়ে বীরবর, জিনি মত্ত করিবর,
গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে।
যতেক আখেটি সুত, তারা সব পরাভূত,
খেলায় জিনিতে কেহ নারে॥
বাঁটুল বাঁশ লয়ে করে, পশু পক্ষী চাপি ধরে,
কাহার ঘরেতে নাহি যায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি, থাকিয়া মারয়ে পাখী,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায়॥"

পরবর্ত্তীকালের কবি মুকুন্দরাম এই বর্ণনাটিকে অলংকার ও বর্ণবিন্যাসে আরো বড় এবং অনেক উজ্জ্বল ক'রে অঙ্কিত করেছেন,—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি,
সবার লোচনসুখ হেতু॥

নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।
রূপগুণ শীলনোড়া, বাড়ে যেন হাতী কড়া,
যেন শ্যাম চামর কুন্তল"
বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁটী,
করযোড়া লোহার শিকলি।
বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে,
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে দান্ডা গুলি ভাঁটা,
কাণে শোভে স্ফটিক কুন্ডল।
পরিধান রাঙ্গা ধুতি, মস্তকে জালের দড়ী,
শিশুমাঝে যেমন মন্ডল॥
সহিয়া শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জন আকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণী ধরে,
ডরে কেহ নিকটে না রয়॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শজারু তাড়িয়ে ধরে,
দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়ে বাঁধে,
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥"

মাধবাচার্য্যের অনতিকাল পরেই মুকুন্দরাম কাব্য রচনা করেন। তাই মুকুন্দরামের যশ-সৌরভে মাধবাচার্য্যের কবিত্বের খ্যাতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই অনেক লুপ্ত হ'য়ে যায়।

কালকেতু ব্যাধ ও তার ভেরান্ডার থামের ভাঙ্গা কুটীরে ছেঁড়া কাঁথা, বাসি মাংসের পসরা ও ব্যাধরূপসীগণের দুর্গন্ধযুক্ত অর্দ্ধাবৃত অঙ্গ মাধবাচার্য্য যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যথাযথ চিত্রিত ক'রেছেন। ধনপতির কাহিনীতেও কবি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। অনেক ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনাও তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। মুকুন্দরাম ব্যাধ কালকেতুকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করলেও রাজা কালকেতুর চরিত্র খর্ব্ব করে ফেলেছেন। তাঁর কালকেতু কলিঙ্গ-রাজের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে স্ত্রীর পরামর্শে

কাপুরুষের ন্যায় "লুকাইল বীর ধান্য ঘরে"। কিন্তু মাধবাচার্য্য পরাক্রমশালী কালুকেতুর চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে সুন্দরভাবে অঙ্কিত ক'রেছেন। ফুল্লরা যখন সভয়ে স্বামীকে যুদ্ধ থেকে বিরত হ'তে অনুনয় করছে, তখন,—

"শুনিয়া যে বীরবর, কোপে কাঁপে থরথর,
শুন রামা অ'মার উত্তর।
করে লৈয়া শর গাণ্ডী, পুজিব মঙ্গলচণ্ডী,
বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর॥
যতেক দেখহ অশ্ব, সকলি করিব ভস্ম,
কুঞ্জর করিব লণ্ড ভণ্ড।
বলি দিব কলিঙ্গরায়, তুষিব চণ্ডিকামায়,
আপনি ধরিব ছত্র দণ্ড॥"

(মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল)

কলিঙ্গ রাজার কাছে বন্দীভাবে আনীত হলে কালকেতু, "রাজসভা দেখি বীর প্রণাম না করে"।

দীনেশবাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখেছেন,—"মুকুন্দের কাব্যের প্রায় সমস্ত অংশই মাধুর চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট; উহাতে আখ্যান বস্তুর বর্ণনা, কাব্যাংশ, ঘটনা-বৈচিত্র্য প্রভৃতি সকল গুণেরই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু মাধুর কালকেতু, মুকুন্দের কালকেতু হইতে বিক্রমশালী, মাধুর ভাঁড়ু দত্ত, কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্ত হইতে শঠতায় প্রবীণ।"

মাধবাচার্য্য কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গাধিপতির যুদ্ধ বর্ণনার জন্য যে ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁর পৌণে দু'শ বছর পরে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে যুদ্ধ বর্ণনায় সেই ছন্দ অনুসরণ করেছেন।

## কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম শুধু মঙ্গলকাব্যেরই শ্রেষ্ঠতম কবি নন,—তিনি সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গ-সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কাউয়েল (Cowell) সাহেব মুকুন্দরামকে বাঙ্গলার চসার (Chaucer) বলেছেন এবং তাঁর কাব্যের কোন কোন অংশ ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ ক'রেছেন।

"......মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রে, দক্ষ-চরিত্রাঙ্কনে, কুশল-ঘটনাসন্নিবেশে, ও সর্ব্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত-সম্বন্ধস্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎ কালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্ব্বাভাস পাইয়া থাকি। মুকুন্দরাম কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রথার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই একজন খাঁটি ঔপন্যাসিক হইতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।" ('বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা',—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এচ-ডি.)

মুকুন্দরাম তাঁর গ্রন্থোৎপত্তির যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য থাকায় সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল,—

"শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধীপ।
অধর্ম্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ॥
উজির হইল রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জনে অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া,
নাহি মানে প্রজার গোহারি॥

সরকার হইল কাল, খিল ভূমি লিখে লাল,
বিনি উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার অবোধ-খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ,
ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটী যার গাঁ,
যুক্তি কৈল মুনিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই,
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥
ভেটনায় উপনীত, রূপরায় নিল বিত্ত,
যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা॥
বহিয়া গোড়াই নদী সদাই স্মরিয়ে বিধি
তেউটায় হইলুঁ উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি পাইল মাতুলপুরী,
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত॥
নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর,
উপনীত তেউটা নগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিলুঁ উদক পান,
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
আশ্রয় পুখরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক-নাড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
হাতে লৈয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি
নানাছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্রে দিলা দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ-ছায়া,
আজ্ঞা দিলা রচিতে সংগীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই,
আড়রায় হইলুঁ উপনীত॥
আড়রা ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিনু নৃপমণি,
দশ আড়া মাপি দিলা ধান॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়,
সুতপাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু করি করিল পূজিত॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বপন-সন্ধি
অনুদিন করয়ে যতন।
নিজে দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি,
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ॥
বীরমাধবের সুত রূপে গুণে অদভূত,
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তাঁর সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত,
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান॥"

এ থেকে জানা যায় যে, বর্দ্ধমান জেলার রত্নানু নদীর তীরবর্ত্তী দামুন্যা গ্রামে কবির ছ' সাত পুরুষের বাস ছিল। চাষ আবাদে সুখে সচ্ছন্দে তাঁদের দিনপাত হত। ডিহিদার মাহ্মুদ সরিফের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে তিনি পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। পথে বহু দুঃখ কষ্টের পর

তিনি মেদেনীপুর জেলার, বর্ত্তমান ঘাটাল থানার অধীন, আড়রা গ্রামের পালধি বংশজাত ব্রাহ্মণরাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়-প্রার্থী হন। বাঁকুড়া রায় কবিকে স্বীয় পুত্র রঘুনাথের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করেন। বাঁকুড়া রায়ের দেহাবসানের পর রাজা রঘুনাথের সভাকবিরূপে তাঁরই অভিলাষে মুকুন্দরাম তাঁর অপূর্ব্ব চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথ ১৪৯৫ থেকে ১৫২৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

গ্রন্থ রচনার কাল,—"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥ রস অর্থে 'ছয়' ধরলে কালসঙ্গতি হয়না, 'নয়' গ্রহণ করলে দাঁড়ায় ১৪৯৯ শকাব্দ (১৫৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)। রচনাকাল সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে এই যে সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ পাওয়া যায় তা নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হ'য়েছে। সে সমস্তের বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম আনুমানিক ১৫৯৪ অথবা ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা শেষ করেন। এই মত গ্রহণ ক'রতে কোন বাধা নেই। মানসিংহের সময়কার ঐতিহাসিক পটভূমিকাও এই মত সমর্থন করে। কবির আত্মকাহিনী অংশ থেকে জানা যায় যে, কাব্যটির রচনার পূর্ব্বাহ্নে মানসিংহ বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। মানসিংহ ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা জয় ক'রেছিলেন।

কবি নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে ভণিতায় লিখেছেন,—

"মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

* * *

দিবা নিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উর মা কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥"

কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, পিতা হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বা উপাধি কবিচন্দ্র, পুত্র শিবরাম, কন্যা যশোদা, পুত্রবধূ চিত্রলেখা এবং জামাতার

নাম মহেশ। কবি পঞ্চোপাসক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ'রা রাঢ়ী শ্রেণী ও কয়াড়ি গাঞি। কবির কোন রকম গোঁড়ামি ছিল না। চণ্ডীমঙ্গলে ইনি শ্রীচৈতন্যেরও বন্দনা ক'রেছেন।

কবিকঙ্কণের কাব্যের প্রকৃত নাম 'অভয়ামঙ্গল'। তিনি মার্কণ্ডাচার্য্যের চণ্ডী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন এবং পুরাণাদি ও সংস্কৃত সাহিত্য হতে রত্নরাজি আহরণ ক'রে স্বীয় কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি ক'রেছেন। মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুকরণে অর্দ্ধ-সজ্জিতা সুন্দরীগণের চিত্র অঙ্কিত ক'রেছেন এবং 'মুকুন্দরাম ক্রুদ্ধা চণ্ডীর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গাম্ভীর্য্যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর একখানি সমুন্নত প্রতিলিপি—'।

প্রবাসে সুখে বাসকালেও কবি দামুন্যার স্মৃতি বিস্মৃত হননি। জন্মভূমির জন্য সকরুণ বেদনায় তাঁর অন্তর ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। গ্রামের পথ-ঘাট, পাড়া-প্রতিবাসী সকলের কথাই তিনি গ্রন্থসূচনায় গভীর আবেগের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। গ্রামের রত্নানু নদকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,—

"গঙ্গাসম সুনির্ম্মল তোমার চরণজল
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই সে পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥"

(দামুন্যায় রক্ষিত কবির সহস্ত লিখিত পুঁথি)

"কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর। ষোড়শ শতাব্দীর জীবন্ত ইংরেজসমাজ আর সেই যুগের স্তিমিত সুখদুঃখের আলয় বঙ্গীয় কুটীর একরূপ দৃশ্য নহে। কিন্তু আল্পাইনশীর্ষে দ্বিযামার শশি-রশ্মি এবং পল্লীগ্রামের বর্ষা-প্রপাতসিক্ত তরুগুল্ম, এই উভয় দৃশ্যে সৌন্দর্য্যের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও উভয়কেই উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর তুলির প্রয়োজন। সেক্ষপীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, মুকুন্দরামও সেইরূপ এক তুলি লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃশ্যগুলি একদরের নহে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

মুকুন্দরাম সুখের চেয়ে দুঃখের কথায় বড়। তিনি প্রকৃত পক্ষে দুঃখেরই কবি। তিনি যে আধিব্যাধি পীড়িত, দারিদ্র্য অত্যাচার ও অপমানে ভরা সমাজে বাস করেছিলেন, নিজে যে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করেছিলেন, বিনা অপরাধে—

শাসকের নির্য্যাতনে স্বদেশ হতে নির্ব্বাসিত হ'য়েছিলেন, এ সমস্তেরই প্রত্যক্ষ বেদনা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে কবি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাই রাজকন্যা সুশীলার বারমাসের সুখ বর্ণনার চেয়ে দরিদ্রা ব্যাধজায়া ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ বর্ণনার অংশ অনেক বাস্তব ও মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীমন্তের কাছে সুশীলার বারমাস্যা বর্ণনায়,—

ফাল্গুনে,— "ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোলমঞ্চ আমি করিব রচনে॥
সখী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত।
আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত॥"

চৈত্রমাসে, "মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে।
মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে॥"

আর ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর কাছে ফুল্লরার বারমাস্যায় দেখি,—

বৈশাখে,— "ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি॥
ভেরাণ্ডার থাম তার আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে অনল-সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥"

শ্রাবণে,— "কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী—দুঃখ কর অবধান।
বৃষ্টি হৈলে কুড়ায় ভাসিয়া যায় বান॥"

আশ্বিন মাসে,— "উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥"

কার্ত্তিক মাসে,— "নিযুক্ত করিলা বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥"

মাঘ মাসে,— "ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক।
মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥"

বসন্তে,— "মধুমাসে মলয়-মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীএ মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে।
ফুল্লরার অংগ পোড়ে উদর-দহনে॥"

মুকুন্দরাম পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্র অংকনে অধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমন্তের চেয়ে ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা প্রভৃতি চরিত্র অনেক সজীব। মুকুন্দরামের কাব্যে নারীর নারীত্ব আছে কিন্তু পুরুষের দৃপ্ত পৌরুষের একান্ত অভাব। কালকেতু যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে 'ধান্য ঘরে' আত্মগোপন করে, ধনপতি ও শ্রীমন্তের উল্লেখযোগ্য পৌরুষ কিছু দেখা যায় না। তাঁরা যেন যন্ত্রচালিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকা। কিন্তু সমগ্র কাব্যে একটি অপ্রধান ক্ষুদ্র চরিত্র কবি অল্প কথায় বীরত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন। ধনপতির উপাখ্যানে দেখা যায়, সিংহলে দেবীর অনুগ্রহে শ্রীমন্ত যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর সিংহলরাজের অনুনয়ে তিনি দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন যুদ্ধে সিংহলের সমস্ত হত সৈন্য-সামন্তদের প্রাণ দান করতে। দেবী-প্রদত্ত সঞ্জীবনী ঔষধ মৃত ব্যক্তিদের দেহে ছিটিয়ে দেওয়া মাত্র তারা পুনর্জ্জীবন লাভ করতে লাগল।

"প্রথমে দিলেন জল যুবরাজের গায়।
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী—বলি কুমার পলায়॥"

কিন্তু নির্ভীক ও পুরুষকারে বিশ্বাসী নেবা কোতোয়াল প্রাণ লাভ ক'রেই,—

"আঁখি কচালিয়া উঠে নেব কোটাল।
কুন্তল বন্ধন করি ধরে অসি ঢাল॥
কোপে নেব কোটালিয়া বলে কটুবাণী।
আগুতে হানিয়া ফেল জরতি ব্রাহ্মণী॥"

মংগলকাব্যের বৈচিত্র্যহীন আবেষ্টনীর মধ্যে, অলৌকিক ও সামান্য বিষয়-বস্তুকে উপজীব্য ক'রে, মুকুন্দরাম শুধু স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলে যে অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি ক'রেছেন তা সত্যই মধ্যযুগে তুলনা রহিত। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সুগভীর সৌন্দর্য্যবোধ তাঁর কাব্যকে সৌষ্টব ও বৈশিষ্ট্য দান

করেছে। কাব্যের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও অন্যান্য ত্রুটি লক্ষিত হয় তার জন্য দায়ী তিনি নন্,—দায়ী সমসাময়িক কাব্যের আদর্শ, জনসাধারণের চরিত্র, রুচি এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা। একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও যুগধর্ম্মে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার ছলে কাব্য রচনা করা ছাড়া তাঁর প্রতিভা বিকাশের আর অপর কোন ক্ষেত্র ছিল না।

কবিকঙ্কণের কাব্য সম্বন্ধে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত আই. সি. এস্ মহাশয় বলেছেন,— 'Its most remarkable feature is its intense reality. Many of the incidents are superhuman and miraculous but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature."—(*Literature of Bengal*).

# অন্নদামঙ্গল

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে মঙ্গলকাব্যগুলির উপর সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদির প্রভাব বিশেষভাবে পড়তে থাকে। এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কবি মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে লৌকিক কাহিনী মূলত উপজীব্য ক'রলেও তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও অনেক পুরাণের ছায়াপাতে তাঁর কাব্যের গৌরব ও আভিজাত্য বৃদ্ধি ক'রেছিলেন। তাঁর পরবর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গল-কারেরা বিশেষ ভাবে সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিলেন এবং কাল-ক্রমে লৌকিক চণ্ডী ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিতা চণ্ডী নাম-সামঞ্জস্যে অভিন্না হ'য়ে পড়েন। এই সমস্ত কারণে এবং ব্যাপক সংস্কৃত চর্চ্চার ফলে লৌকিক চণ্ডীর প্রতিষ্ঠা সমাজে দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে ও তাঁর স্থান অধিকার করতে থাকেন পুরাণ-বর্ণিতা চণ্ডী। এই সময় থেকেই পুরাণোক্ত কাহিনী নিয়ে বাঙলা ভাষায় রচিত হ'তে থাকে 'দুর্গাপুরাণ' বা 'দুর্গামঙ্গল'।

অষ্টাদশ শতকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের উপরেও বহু সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ ও আগম গ্রন্থাদির প্রভাব দেখা যায়। তাছাড়া বিবিধ সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, নাগরী, ও ফারসী ভাষা প্রভৃতিতে তাঁর বেশ দখল ছিল। এ সমস্তই তিনি নিজেই দেবীর জবানীতে জানিয়েছেন। যুগমাহাত্ম্যে, সংস্কৃত পুরাণ, সাহিত্য ও রামপ্রসাদ প্রবর্ত্তিত শাক্ত-পদাবলীর প্রভাবে লৌকিক চণ্ডী ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হ'য়েছেন।

মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অনুকরণে ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলকাব্যে দুই খণ্ডে রচিত হ'য়েছে। এই দুই খণ্ড আবার তিন অংশে বিভক্ত। বাস্তবিক পক্ষে অন্নদামঙ্গলে তিনটি স্বতন্ত্র কাব্যের উপাখ্যানকে কোনমতে একসূত্রে গ্রথিত করা হ'য়েছে,—'(১) শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, (২) কালিকামঙ্গল এবং (৩) মানসিংহ—ভবানন্দ—অন্নপূর্ণামঙ্গল।' চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গলের পৌরাণিক অংশের আখ্যানভাগের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে, কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম দুই অংশের কাহিনীতে কিছু মৌলিকতা থাকলেও ঐ কাহিনী দু'টি তাঁর নিজস্ব নয়, কিন্তু শেষাংশে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন

ক'রে কবি সম্পূর্ণ নূতন গল্প রচনা করেছেন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অন্নদাতা রাজার প্রশস্তি রচনা।

অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে দেব-দেবী বন্দনা, গ্রন্থ-সূচনা, মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের সভা বর্ণন, গীতারম্ভ, সতীর পিত্রালয়ে গমন, শিব নিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ নাশ, হিমালয় আলয়ে উমার জন্ম। শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম, শিব-বিবাহ, দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধারণ ও কাশীপ্রতিষ্ঠা, ব্যাসের শিব নিন্দা, অন্নদার জরতী বেশে ব্যাসকে ছলনা। দেবীর পূজা প্রচারের জন্য কুবেরের সহচর বসুন্ধরের শাপগ্রস্থ হ'য়ে হরিহোড়রূপে জন্ম, হরি-হোড়ের প্রতি অন্নদার কৃপা ও তাঁকে বরদান। কুবেরের পুত্র নলকূবরের প্রতি শাপ এবং নলকূবরের আন্দুলিয়া গ্রামে রাম সমাদ্দারের ঔরসে সীতাদেবীর গর্ভে, কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদি পুরুষ, ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্মগ্রহণ। হরিহোড়কে পরিত্যাগ ক'রে দেবীর ভবানন্দ নিবাসে যাত্রা ও খেয়াঘাটে ঈশ্বরী পাটনীকে বরদান। ভবানন্দ মজুমদার কর্ত্তৃক দেবীর পূজা ও তাঁর প্রতি দেবীর অনুগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণিত হ'য়েছে।......এই অংশে একমাত্র সজীব চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী। এছাড়া অপর কোন চরিত্র তেমন বিকাশ লাভ করেনি।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশে 'বিদ্যাসুন্দর' অধ্যায়ে যশোরের স্বাধীন নরপতি প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হ'য়ে রাজা মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমন এবং বর্দ্ধমানে অবস্থান কালে তাঁর কৌতূহল নিবারণের জন্য কানুনগো ভবানন্দ মজুমদার কর্ত্তৃক বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বর্ণনা। এই অংশটি প্রকৃতপক্ষে কালিকামঙ্গল। এরপর দ্বিতীয় অংশে 'মানসিংহ' অধ্যায়ে বর্ণিত হ'য়েছে,--মানসিংহের যশোর যাত্রা, মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ এবং ভবানন্দ মজুমদারের কৌশলে প্রতাপাদিত্যের পরাজয়। ভবানন্দের খেলাৎ লাভের জন্য দিল্লী যাত্রা প্রসঙ্গে দেশ-বিদেশ বর্ণন। বাদশাহের দেবতা নিন্দা ও তাঁর প্রতি মজুমদারের উত্তর। বাদশাহের কোপে মজুমদারের কারাবাস। মজুমদারের অন্নদা স্তব এবং দেবীর অভয় দান। দেবীর ভূত প্রেত ও ডাকিনী-যোগিনীর দিল্লীতে উৎপাত। দিল্লীশ্বরের কাছে দেবীর মাহাত্ম্য জাহির ও ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণার পূজা এবং ভবানন্দ মজুমদারের রাজত্ব প্রাপ্তি। মজুমদারের নিকট দেবীর ভবিষ্যৎ কথনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর সভাকবি অন্নদা-অষ্টমঙ্গলার রচক ভারতচন্দ্রের উল্লেখ।......এই দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় কবি অত্যাশ্চর্য্য নিপুণতা প্রদর্শন করেছেন।

**পরবর্ত্তী** অধ্যায়ে আমরা কবি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করব'।

## ভারতচন্দ্র

পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। কাব্য-সাহিত্যেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। মানুষের রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা ও রুচির পরিবর্ত্তনের উপর সাহিত্যের ভিত্তি। তাই কাব্য-সাহিত্য সময় সময় দীর্ঘায়ু হ'লেও অমরত্ব লাভ ক'রতে পারে না,—পারা হয়ত কাম্যও নয়।

বাঙ্গলার ইতিহাসের সঙ্গে নবদ্বীপের কথা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সেন-পর্ব্বের শেষ দিকে নবদ্বীপ থেকেই 'বাঙ্গালার লক্ষ্মী' একদিন অন্তর্হিতা হ'য়েছিলেন। তারপর যে নবদ্বীপে একদিন শিক্ষা-সংস্কৃতির পাদপীঠ গড়ে উঠেছিল, যে নবদ্বীপে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গোস্বামিগণ প্রেমধর্ম্ম প্রচার ক'রেছিলেন, পরবর্ত্তীকালে সেই নবদ্বীপেই দুর্ব্বল মেরুদণ্ডহীন রাষ্ট্র, বিকৃত শক্তিধর্ম্ম, মুসলমান দরবারী প্রভাব, সামাজিক দুর্নীতি, চারিত্রিক অবনতি ও তরল রুচির জন্য এক নূতন ধরনের কাব্য-সাহিত্য সৃষ্ট হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এক অদ্ভুত স্মরণীয় যুগ। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে, স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্রে, দেশের শাসনভার ইংরেজ বণিকের হাতে চলে যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ ও বিশেষ ক'রে বাঙ্গলা দেশে এই যে একটি সঙ্কটময় প্রধান ঘটনা সমসাময়িক সাহিত্যে তার কোন নিদর্শন নেই। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, ইংরেজ একদিনে এ দেশের রাজা হ'য়ে বসেনি। প্রথমটা তারা 'ক্লাইভের গর্দ্দভ' অহিফেনসেবী মীরজাফরকে ঔপাধিক আড়ম্বরে মসনদে বসিয়ে রেখে দেওয়ানী লাভ ক'রে ট্যাক্স আদায় ও কুঠি নির্ম্মাণ করতেই ব্যস্ত ছিল। তারপর কিছুদিন মীরকাশিমকে নিয়েও প্রহসন ক'রতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনচেতা মীরকাশিমের সঙ্গে সওদা না হওয়ায় তাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল'। তখন তারা ছলে-বলে-কৌশলে শাসন-দণ্ড ছিনিয়ে নিল একের এক ক্ষমতা গ্রহণ ক'রে। তাই দেশের রাজারূপে আত্মপ্রকাশ করতে তাদের কিছুটা সময় লেগেছিল। তাই বোধ হয়, জনসাধারণ, এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায় পর্য্যন্ত, পলাশী-যুদ্ধের যথার্থ ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অনেক দিন পর্য্যন্ত উপলব্ধি ক'রতে পারেনি। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, দেশের আভ্যন্তরিক শাসনের ভার এ সময়ে স্থানীয় ভূস্বামীদের উপরই ন্যস্ত ছিল।

সেজন্য দেশে এত বড় একটা রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন হ'লেও দেশের লোক তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। তাছাড়া, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বাঙ্গালীর চিত্ত বিমূঢ় হ'য়ে থেকে ছিল দীর্ঘকাল। এই শতাব্দীতে যে সব লোক ইংরেজের সংস্পর্শে এসে অল্পায়াসে হঠাৎ খুব ধনী হ'য়ে ওঠে তারা কাঞ্চন-কৌলিন্যে সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অন্ধভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়। এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে—সমাজের উচ্চস্তরে—অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর ও দেহগত বিলাস-বাসনা উগ্রভাবে দেখা দেয়। এরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এই যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার জের চলে এবং নৈতিক অধোগতি চরম রূপে দেখা দেয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে—নাগর-সমাজে। পল্লী অঞ্চল এই কদর্য্য প্রভাব থেকে দূরে থাকায় সে দিকে রচিত সাহিত্যগুলি অনেকাংশে নির্ম্মল ছিল।

বহু প্রকার সুকুমার বিদ্যা, কুরুচি, কূটনীতি ও বিলাসপ্রিয়তা এই যুগের সাহিত্যকে এক মিশ্রিতরূপে গড়ে তুলেছে। শিব ও শক্তি উপাসক নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহ ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা এই যুগে কাব্য-সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তন করে। পল্লীবাসিনী দীনা বঙ্গভাষা এখন রাজদরবারে অনুগৃহীতা। সংস্কৃত ও ফার্সীর বড় বড় পণ্ডিতদের কৃপায় বাঙ্গলা সাহিত্য সরলতা ও আবেগধর্ম্ম পরিহার ক'রে বিলাস-আড়ম্বরাতিশয্যপূর্ণ রাজসভার উপযুক্ত কৃত্রিম নানা আভরণে সজ্জিতা হ'য়ে যৌনলালসাময় উত্তপ্ত মদিরা-মধুর স্রোত প্রবাহিত করার কাজে নিযুক্তা হল। অলঙ্কার-মুখর ভাবোচ্ছ্বস, আড়ম্বরময় অতিশয়োক্তি, লালস-বিভ্রম যুক্ত শৃঙ্গাররসাবিষ্ট দৃষ্টি,—ঐশ্বর্য্য-বিলাসের এই বিবিধ বিচিত্র সম্ভারের মাঝে নির্ম্মলতার স্থান কোথায়? সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে দেশের আপামর সাধারণের এতদিন যে একটি নিবিড় যোগসূত্র ছিল এই সময় থেকেই তা ছিন্ন হ'য়ে গেল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর সভায় ধর্ম্ম, ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই চর্চ্চা হত। ভারতচন্দ্র রায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রিয় কবিকে ব্রহ্মস্বরূপে ভূ-সম্পত্তি দান করেন ও 'কবি রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অনুমান ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভুরশুট পরগনার হুগলীর অন্তর্গত পেড়োঁ-বসন্তপুর গ্রামে এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি ভুরশুটের ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জমিদার 'রাজা' উপাধিধারী নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র।

"ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হতকংস ভুরশুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥"

বর্দ্ধমানের মহারাণী কোনও কারণে ক্রোধান্বিতা হ'য়ে নরেন্দ্রনারায়ণের ভবানীপুর ও পেঁড়োরগড় এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি জোর করে অধিকার করায় নরেন্দ্রনারায়ণ হৃতসর্ব্বস্ব ও দরিদ্র হয়ে পড়েন। ভারতচন্দ্র বাল্যকালে তাঁর মাতুলালয় নাওয়াপাড়া গ্রামে থাকেন এবং তাজপুরের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সের সময় তিনি আত্মীয়-স্বজনের অমতে সারদাগ্রামে আচার্য্যদের পরিবারে বিবাহ করেন। গুরুজনের দ্বারা তিরস্কৃত হ'য়ে অভিমানী ও খেয়ালী কবি গৃহত্যাগ করে হুগ্‌লী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সী নামে কোন ধনী কায়স্থের বাড়ীতে থেকে ফারসী ভাষা শেখেন। এই সময়েই তিনি সংস্কৃত, হিন্দি ও বাঙলা ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারতেন। মাত্র পনের বছর বয়সের সময় তিনি দু'খানি 'সত্যপীরের কথা' রচনা করেন। তার একখানি চৌপায়ী ছন্দে লেখা। এই পুঁথির শেষে রচনাকাল সম্বন্ধে লেখা আছে,—"ব্রতকথা সাঙ্গপায় সনে রুদ্র চৌগুণা॥' অর্থাৎ ১১৪৪ সাল অথবা ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগ থাকায় তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে বৈরাগী সাজা ঠিক করেন। কিন্তু তাঁকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গলের প্রথম অংশে দু'টি গানের ভণিতায় 'রাধানাথ' নাম পাওয়া যায়। এ থেকে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কবি-পত্নীর নাম ছিল রাধা। তাঁর বিবাহিত জীবন বোধহয় সুখের ছিল না। এক জায়গায় তিনি ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, "দুই স্ত্রী নহিলে নহে স্বামীর আদর। সে রসে বঞ্চিত রায়গুণাকর॥" ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর চেষ্টায় তিনি মাসে চল্লিশ টাকা বেতনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হন। এই রাজসভায় তাঁর অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে, ৪৮ বৎসর বয়সে, ভারতচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্র মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রদর্শিত পথে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। এই অন্নদামঙ্গল দুখণ্ডে এবং তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিব-বিবাহ, ব্যাসকাশী, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম ও তাঁর উপর দেবীর অনুগ্রহ। দ্বিতীয়ভাগের প্রথম অংশে বিদ্যাসুন্দর পালা (এই অংশটি অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত হ'লেও প্রকৃত পক্ষে এটি কালিকামঙ্গল। এ সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হ'য়েছে।), দ্বিতীয় অংশে মানসিংহের যশোর বিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের রাজত্বলাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হ'য়েছে। অন্নদামঙ্গল ছাড়া তিনি রসমঞ্জরী (ভানুদত্তের মূল সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থের অনুবাদ), চণ্ডীনাটক (অসম্পূর্ণ) ও সংস্কৃত-বাঙলায় শিখরিণী ছন্দে ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ নাগাষ্টক রচনা করেন। তা ছাড়া তাঁর অনেক বাঙলা, সংস্কৃত, হিন্দি ও ফারসী কবিতা পাওয়া যায়। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে (১৬৭৪ শকাব্দে অথবা ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে) অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যে নির্দ্দেশ আছে,—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

ভারতচন্দ্রের সত্যকার কবি-প্রতিভা ছিল। কিন্তু সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের প্রতি মোহই তাঁর প্রতিবন্ধক হ'য়েছে। যেখানেই তিনি এই মোহ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন সে সমস্ত জায়গায় তাঁর বর্ণনা প্রাণময়, সাবলীল ও সুন্দর হ'য়েছে। ভাবের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর কাব্যের গুরুত্ব হয়ত খুব বেশী নয়, কিন্তু পদলালিত্য, ছন্দবৈচিত্র্য এবং ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি নিঃসন্দেহ প্রাচীন বাঙলার শ্রেষ্ঠ শব্দ-কুশলী কবি। বাঙলা দেশে আজ পর্য্যন্ত তাঁর মত অত বড় শব্দ ও ছন্দের যাদুকর কেহ জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন জাগে। ভাষায় তাঁর মত মনোরঞ্জন করতে মধ্যযুগে আর কেহ পারেননি। কোমল বাংলা ভাষায় যে কতখানি কুহক সৃষ্টি করা যায় তা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর না পড়লে ধারণা করা যায় না। এই গ্রন্থে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, চতুরতা, বাক্যবিন্যাসের অসাধারণ ক্ষমতা ও মৃত্যুঞ্জয় সৃজনী-প্রতিভার সাক্ষর আছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে প্রচুর অশ্লীলতা থাকলেও সেটি এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এবং বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম রোমান্স।

ভারতচন্দ্র যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। তাঁর কাব্যে পূর্ব্বযুগ ও আধুনিক যুগের লক্ষণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্ব্বযুগের ন্যায় দেবদেবীর লীলা বর্ণনা, অতিপ্রাকৃত ঘটনা এবং বর্ত্তমান যুগের মত মানবীয় প্রেম-কাহিনী ও ঐতিহাসিক সত্য যতখানি তাঁর কাব্যে রয়েছে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কাব্যেই তা নেই। তিনিই প্রথম কাব্যকে প্রাচীন গতানুগতিক পয়ার-লাচাড়ী ছন্দ-বন্ধনের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে উদার ও প্রসার করে তুল্‌তে যত্নবান হন। তাঁর অসম্পূর্ণ চণ্ডীনাটকটিতেও মনীষার পরিচয় রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁর কাব্যে সে যুগের চেয়ে বর্ত্তমান যুগের লক্ষণই বেশী।

সে যুগের পক্ষে ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দ বিস্ময়জনক ভাবে ঐশ্বর্য্য-বহুল। তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ; অনেক রকম সংস্কৃত ও বাঙলা ছন্দ ব্যবহারে ও পদলালিত্যে তিনি যে দক্ষতার ও নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই অপূর্ব্ব। 'শব্দকুশলী কবি' ভারতচন্দ্রের কাব্যে শব্দ ও অর্থালংকার আছে পুরো মাত্রায়। শব্দালংকারগুলির মধ্যে ধ্বন্যুক্তি (Onomatopoeia), **যমক** (Analogue) আর শ্লেষই (Pun) বেশী, সুললিত অনুপ্রাস (Alliteration) ও কম নয়। অর্থালংকারের মধ্যে উমপা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি, তাছাড়া বিরোধাভাস, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি বহু অলংকারের সমাবেশ দেখা যায়। বাঙলা ছন্দ লঘু-গুরু ভেদে ধ্বনির সুনির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ক্রম মেনে চলে না। তাতে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করা যে কত কঠিন তা অলংকার শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বোঝেন। ভারতচন্দ্র ভুজঙ্গ-প্রয়াত, তূণক ও তোটকাদি সংস্কৃত ছন্দ বাঙলায় সুন্দর ভাবে অনুসরণ ক'রেছেন।

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দগুলি বাঙলা ভাষার নিজস্ব এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এগুলি শ্রুতিগ্রাহ্য অব্যক্ত শব্দ, অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তু, ভাব, গুণ অথবা ক্রিয়ার সূক্ষ্ম দ্যোতনা প্রকাশ করতে এবং কথায় চিত্র অংকন করতে অপরি-হার্য্য। এগুলি প্রায়শ একাধিকবার উচ্চারিত হ'য়ে ধ্বনিসাম্যের জন্য ভাষায় ঝঙ্কার এনে দেয়। ভারতচন্দ্র এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অন্নদামঙ্গল থেকে নিম্নোদ্ধৃত পদে ভোজনরত শিবের চিত্র ও তাঁর আনন্দোন্মত্ত নৃত্য বর্ণনা করা হ'য়েছে অপূর্ব্ব ধ্বন্যাত্মক শব্দে। এই অংশ ধ্বন্যুক্তি অলংকারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

"পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পুরেন উদর সাধের মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥"
"লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক ধক ধক ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদ মণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম্ ববম্ বাজায়ে গাল।
ডিম ডিম বাজে ডমরু ভাল॥
ভভম ভভম বাজায়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজায়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা॥"

ভারতচন্দ্রের দ্বারা ব্যবহৃত অন্যান্য অলংকারগুলিও মোটামুটি দেখা যাক্।

আদ্যযমকে,—

"ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।"

মধ্য যমকে,—

"পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধুভব, ভব সে ভরসা॥"

চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্যগত শ্লেষে,—

"কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥"

অনুপ্রাসে,—

"খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।"

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে,—

"অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা ল'য়ে।
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হ'য়ে॥"

*  *  *

দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইল লুকাইয়া॥"

ব্যতিরেক অলঙ্কারে (এখানে উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণনা করা হ'য়েছে),

"কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥"

দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে,—

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায়! বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥"

বিরোধাভাস অলঙ্কারে,—

"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।"

অথবা,—

"চাঁদের মণ্ডল ববিয়ে গরল, চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বুল লাগে যেন শূল, গীতনাট ঝনঝনা॥"

অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারে,—

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥"

বিশেষোক্তি অলঙ্কারে,—

"গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গরের নাহি যম।"

ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারে (এখানে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা হ'য়েছে),—

"সভাজন শুন জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥"

অথবা,—

"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥

* * *

ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥"

ভারতচন্দ্রের কাব্য শব্দ ও ছন্দ বিন্যাসে ক্রীড়াশীল। অনেক দুরূহ কাজ তিনি অনায়াসে সম্পন্ন ক'রেছেন। শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত প্রধান ধামালী জাতীয় ছন্দে,—

"আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাংগড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে, পাগল নহে, ওই ভুবনেশ্বর লো॥"

প্রথম তিনটি পর্ব্বের অন্তে মিল যুক্ত মালঝাঁপ পয়ার ছন্দে,—

"কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরিবাণ খরশান হানহান হাঁকে॥"

প্রতি পংক্তিতে লঘু-লঘু-গুরু এই পর্য্যায়ে, দ্বাদশ অক্ষরে, চারটি বিভাগ যুক্ত তোটক ছন্দে,—

"দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।
কবিরাজ কহে যত গৌড় জনে॥"

গুরু-লঘু ক্রমে, পঞ্চদশ অক্ষরে, আটটি বিভাগ নিয়ে গঠিত এবং শেষ বিভাগ অপূর্ণ তূণক ছন্দে,—

"ভূত নাথ ভূত সাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥"

প্রতি পংক্তিতে দ্বাদশ অক্ষর ও চার বিভাগ যুক্ত এবং বিভাগগুলি লঘু-গুরু-গুরু এই পর্য্যায়ে রচিত ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে, উপযুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ নির্ব্বাচন করে, তিনি মহামহিমান্বিত মহাদেবের যে গম্ভীর 'ভৈরব সুন্দর' চিত্র অঙ্কন করেছেন তা সত্যই তুলনা রহিত,—

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ মহাশব্দ গালে॥

*   *   *

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥
ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন,—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য্য।"

কবি প্রধানত তিন রকম ভাবে নিজেকে প্রকাশ ক'রে থাকেন,—শব্দ-শিল্পে, চিত্র-সম্পদে ও ভাব-গভীরতায়। ভারতচন্দ্র প্রথমটিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বাঙ্নৈপুণ্যে প্রতি পদক্ষেপে চমৎকৃত হ'তে হয়। যেখানে যে শব্দ বসালে শ্রুতি-মধুর, রসাল ও প্রসাদগুণে ভরা হবে ভারতচন্দ্র তা

ক'রেছেন। 'ম'-কার, 'ল'-কার প্রভৃতি কোমল অক্ষর দিয়ে তিনি অপূর্ব্ব শব্দ-মন্ত্রে ভাষার যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রেছেন তার সামান্য নমুনা এখানে তুলে দেওয়া হ'ল,—

"কল কোকিল, অলি— কুল বকুল ফুলে,
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥
কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল, উছলে কূলে।
বসন্তরাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী,
করিলা রাজধানী অশোক মূলে॥
কুসুমে পুনঃ পুনঃ, ভ্রমর গুণগুণ,
মদন দিলা গুণ ধনুক হুলে।
যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন,
মধু মুদিত মন ভারত ভুলে॥" (অন্নদামঙ্গল)

নীচের এই পদটিতে দেখা যাবে সংস্কৃত-বাঙলা শব্দের মিলনে ভারতচন্দ্র গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুন্দর স্তোত্র রচনা ক'রেছেন,—

"জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব,
কংসদানব-ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন,
কুঞ্জকানন-রঞ্জন॥
জয় কেশিমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন,
গোপিকাগণ-মোহন।
জয় গোপবালক, বৎসপালক,
পুতনা-বক-নাশন॥" (অন্নদামঙ্গল)

ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলি মিষ্ট শব্দ চয়নে অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। যেমন,—

"ওলো ধনি প্রাণধন, শুন মোর নিবেদন,
সরোবরে স্নান হেতু যেয়োনা লো যেয়োনা।
যদ্যপি বা যাও ভুলে, আঙ্গুলে ঘোমটা তুলে,
কমল কানন পানে চেওনালো চেওনা॥

মরাল মৃণাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পেওনালো পেওনা।
তোমা বিনে নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে দেহ,
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি যেয়োনা লো যেয়োনা॥"

(অনুকূল, রসমঞ্জরী)

কবি কালিদাস এবং বিদ্যাপতির পরে উপমার নবীনতা ও চমৎকারিতার জন্য আর কারও নাম করতে হ'লে ভারতচন্দ্রের নাম সবচেয়ে আগে মনে আসে। কিন্তু অল্প উপমায় চিত্রখানি যেমন সজীব ও সুন্দর হয়, অতিরিক্ত উপমা ব্যবহারে তেমনি সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'য়ে যায়। বিদ্যাসুন্দরে রাজকুমারী বিদ্যার রূপ বর্ণন প্রসঙ্গে তিনি তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করে অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী তিলোত্তমা সৃষ্টি করতে গিয়ে উপমার আতিশয্যে, অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত, যে চিত্রখানি দিয়েছেন তাতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকলেও চিত্রটি প্রাণহীন ও অবাস্তব হ'য়ে পড়েছে।

"বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীব শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥

* * *

কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী-চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা বলে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট সম॥
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥

কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব-ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভিপদ্মে যেতে কাম কুচ-শম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥
কত সরু ডমরু কেশরি-মধ্যখান।
হরগৌরী কর-পদে আছে পরিমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক সে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥

*    *    *

রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥
বসন-ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥"

অন্নপূর্ণার মোহিনী-রূপ-বর্ণনাও অতিশয়োক্তিতে ভারাক্রান্ত হয়েছে,—

"কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥

*    *    *

কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
দলে দলে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥
কঙ্কণ-ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন-খঞ্জনী॥"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়, ঘটনা বা হীরা মালিনী প্রভৃতি ছোট ছোট চরিত্রগুলিতে ভারতচন্দ্র নিপুণ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু প্রধান প্রধান চরিত্র চিত্রণে তাঁর তুলি প্রাণ দান করতে পরেনি,—কারণ সে মন্ত্র ছিল তাঁর অজানা। তাঁর কাব্যে তাই প্রসারতা আছে, গভীরতা নেই। বিলাস-বিভ্রম আছে, কিন্তু হৃদয়ের সহজ ব্যাকুলতা বা আবেগের একান্ত অভাব। এতে বাঙালীর অন্তরের কথা বলা হয়নি, গ্রাম্য কবির সরলতা ও মাধুর্য্যটুকু পাওয়া যায় না। অবশ্য এজন্য কবিকে আমরা সম্পূর্ণরূপে দায়ী করতে পারিনা,—কারণ যুগের ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। 'গীত-গোবিন্দম্' এর কবির দ্বারা যা সম্ভব হয়নি, 'বিদ্যা-সুন্দর' এর কবির কাছে তা প্রত্যাশা করা বৃথা।

ভারতচন্দ্র জনপ্রিয় কবি। তাঁর অনেক কথা প্রবাদ বচনে পরিণত হ'য়েছে। যেমন,—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন; যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন; অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়; মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে, পতঙ্গ প্রহার করে; বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির; নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়; খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত; খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কপাট; যে কহে বিস্তর মিছা কহে সে বিস্তর। মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥ সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার। সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥ বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। ইত্যাদি।

বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে ভারতচন্দ্রের কয়েকটি সুন্দর লিরিক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈষ্ণব গীতি-কাব্যের প্রভাবে, নিজস্ব সুললিত ভাষায় ও নূতন প্রকাশ ভঙ্গীতে গানগুলি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে।

"ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু,
পীতধরা বিজুলীতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়নচকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখসুধাকর-হাসি-সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমন চাহে সেইমত চাও হে॥" (বিদ্যাসুন্দর)

ভারতচন্দ্র খাঁটি বাঙলা আদর্শের সর্ব্বশেষ কবি। ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ ঊনবিংশ শতকের বহু কবিই তাঁর কাছে ঋণী। নিম্নোদ্ধৃত দু'টি গানের অংশ থেকে বোঝা যাবে যে, মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' ভারতচন্দ্রের গানের প্রভাব বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়েও বেশী।

"শিহরিল কলেবর, তনু কাঁপে থরথর,
হিয়া হৈল জরজর আঁখি ছলছল।
তেয়াগিয়া লোক-লাজ, কুলের মাথায় বাজ,
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল॥
রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে,
চিত্ত না ধৈরয ধরে পিক কল-কল।
দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাঙ্গাপায়,
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল-ঢল॥"

* * *

"লোকে হৈল জানাজানি, সখীগণ কানাকানি,
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল,
ভারত সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে॥" (বিদ্যাসুন্দর)

## ধর্ম্মমঙ্গল

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষভাবে রাঢ়দেশের ঐতিহাসিক কাহিনীকে উপজীব্য করে রচিত সাহিত্য। এই কাব্যের পটভূমিকা, বিষয়বস্তু ও চরিত্র সৃষ্টিতে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় যা অপর কোন মঙ্গলকাব্যে নেই। এগুলিকে এক হিসাবে রাঢ় দেশের জাতীয় মহাকাব্য বলা যায়।

'রাঢ়' দেশ বল্‌তে পশ্চিম-বঙ্গকেই বোঝায়। 'বঙ্গ' শব্দ সম্ভবত একটি জাতির (Tribe) নাম। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য বঙ্গদেশের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। 'বঙ্গ' কথাটির সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যকে'। সেখানে বঙ্গ, বগধ (মগধ?) এবং চেরপাদ - এই তিনটি জাতিকে পক্ষীর মত বিচরণশীল বলা হ'য়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' বঙ্গদেশকে অসভ্য জাতির বাসস্থান বলা হ'য়েছে। অথর্ব্ববেদ পরিভাষায় বঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে। বাল্মীকি-রামায়ণে (মূল গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে রচিত?) বঙ্গজনদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়; প্রাচীন বঙ্গ-রাজন্যেরা অযোধ্যার রাজ-বংশ ও অভিজাত বংশীয়দের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এ রকম ইঙ্গিত আছে। মহাভারতে (আদি গ্রন্থের রচনাকাল খ্রী-পূ চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের মধ্যে?) আদিপর্ব্বে, সভাপর্ব্বে ও ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বঙ্গ, তাম্রলিপ্তি ও সুহ্মজনদের কথা রয়েছে। মহাভারত, বায়ু (গুপ্ত যুগে রচিত?), ও মৎস্য পুরাণে (অন্ধ্ররাজত্বের পরে রচিত?) একটি গল্প আছে। অসুর-রাজ বলির স্ত্রীর গর্ভে বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের ঔরসে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। অঙ্গ. বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম - এই পাঁচ পুত্রের নামে পাঁচটি জনপদের উদ্ভব হয়। মনুসংহিতায় বঙ্গদেশ, আর্য্যাবর্ত্তের অংশ এবং সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলে কথিত হ'য়েছে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ গুন্টুর জেলার নাগার্জ্জুনীকোণ্ড শিলালিপিতে এবং চতুর্থ শতকে(?) দিল্লীর কাছে রাজা চন্দ্রের মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভলিপিতে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। বঙ্গের লোক যে নৌ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল এ খবর আমরা পাচ্ছি মহাকবি কালিদাস (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী?) বিরচিত 'রঘুবংশম্'এর চতুর্থ সর্গে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত বৌদ্ধদের আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প পুস্তকে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও

গৌড় প্রভৃতি জনপদের লোকেদের ভাষাকে 'অসুর ভাষা' বলা হয়েছে। নবম শতকে গঙ্গরাজ দেবেন্দ্র বর্ম্মণের লিপিতে উত্তর-রাঢ়ের উল্লেখ আছে। সিংহল দেশে পালিভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গরাজ সীহবাহু বা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহের কাহিনীতে লাড়দেশের বা রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোলের 'তিরুমলয়' শিলালিপিতে 'বঙ্গাল' শব্দটি পাওয়া গেছে। এতে 'লাঢ়ম্' বা রাঢ় দেশেরও নাম আছে। দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী প্রথম রাজেন্দ্র চোল ১০২৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশ আক্রমণ করেন এবং মেদিনীপুর দণ্ডভুক্তি বা দাঁতনের (তাম্রলিপ্ত) রাজা ধর্ম্মপালকে যুদ্ধে নিহত করেন।

বঙ্গদেশ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে পর্য্যন্ত সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল(?) এবং অনার্য্য অধ্যুষিত ছিল। ক্রমশ পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হতে হতে যাযাবর বঙ্গজাতি এখন যে স্থানকে পূর্ব্ববঙ্গ বলা হয় সেখানে বাস করতে থাকে,—তা থেকেই পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন নাম হয় 'বঙ্গ'। বাঙ্গলাদেশ বল্‌তে আমরা বর্ত্তমানে যতখানি ভূভাগকে বুঝি মুঘল আমলে—বিশেষ করে আকবর বাদশাহের সময়—সেই সঙ্গে আরও কিছু অংশকে বোঝাত। সেই বাকী অংশ বর্ত্তমানে অন্য প্রদেশের অধীন। মুঘল যুগে এই সমগ্র দেশ 'সুবা বঙ্গালহ্' নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজলের 'আইন্-ই-আক্‌বরী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সংস্কৃত 'বঙ্গ'-শব্দের সঙ্গে 'আল্'-শব্দ যুক্ত হ'য়ে 'বঙ্গাল' এবং তা থেকে বাঙ্গালা কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র ক্ষেত্রে বা নদীতে আল্ (মাটির বাঁধ) দেওয়া হয়। আল্-বহুল এই দেশকে আবুল ফজল বঙ্গাল বা বাঙ্গালা বলেছেন। 'বঙ্গ' এই নাম বর্ত্তমান কালে সমগ্র বাংগলাদেশ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষদিকেও বঙ্গ শব্দ শুধু পূর্ব্ব-বঙ্গকেই বোঝাত।

রাঢ় ও সুহ্ম জাতির নাম থেকেই পশ্চিম-বঙ্গের নাম হ'য়েছে রাঢ় ও সুহ্ম ভূমি। এই অঞ্চলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা অনেক প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস তালীবনশ্যাম উপকূলে সুহ্মজনদের উল্লেখ করেছেন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে। কবি জয়দেব গীত-গোবিন্দমে রাঢ় ও সুহ্ম জনপদের শ্যাম-মহিমা ও ঘন-বর্ষার মেঘ-মেদুর আকাশকে বর্ণনা করেছেন। রাজশেখর কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থে 'রাঢ়া' দেশের অতুল সৌন্দর্য্যের কথা বলেছেন। কবি ধোয়ী পবনদূতে সুহ্মদেশের (দক্ষিণ-রাঢ়,—

বর্ত্তমান হাওড়া এবং হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার অধিকাংশ ভূভাগ।) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে বলেছেন, "রসময় সুহ্মদেশঃ"।

রাঢ় ও সুহ্মদেশের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আমরা দেখতে পাই জৈনদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ 'আয়ারঙ্গ সুত্ত' বা 'আচারঙ্গ সূত্রে'। আনুমানিক খৃীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর ও তাঁর কয়েকজন শিষ্য ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে রাঢ় ও সুহ্ম ভূমিতে আসেন। এই কাহিনী আচারঙ্গ সূত্রে বর্ণিত হ'য়েছে। এই গ্রন্থে এ দেশের অধিবাসীদের নিষ্ঠুর ও রূঢ় আচরণের এবং অন্যান্য বিষয়ের নিন্দা করা হয়েছে।

বঙ্গ, রাঢ় ও সুহ্ম দেশবাসীরা ছিল আর্য্যেতর। বাঙগলা দেশে অনার্য্য-ভাষীদের বাস অধিক ছিল বলে এ দেশে আসা ও বসবাস করা আর্য্যাবর্ত্তের লোকেদের পক্ষে অনেকদিন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। বোধায়ন ধর্ম্মসূত্রে বলা হয়েছে যে, মধ্যদেশ বা আর্য্যাবর্ত্ত থেকে বঙ্গদেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত না করে কেউ স্বসমাজে ফিরে যেতে পারত না। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই বিদ্বেষ বা কটূক্তি যাঁরা করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন আর্য্যভাষাভাষী ও আর্য্যসংস্কৃতি সম্পন্ন লোক। এ দেশের আচার-ব্যবহার, ভাষা, সংস্কৃতি, সম্বন্ধে সম্যক কোন জ্ঞানই তাঁদের ছিল না। তাঁরা দূর থেকে এ দেশকে শুধু অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখে গেছেন। মধ্য ও উত্তর ভারতের রাজা, সৈন্য-সামন্ত, ধর্ম্মপ্রচারক, বণিক্-ব্যবসায়ী, ভাগ্যান্বেষীরা বাঙগলাদেশে নানা সময়ে, নানা প্রয়োজনে এসেছেন এবং তাঁরাই আর্য্যভাষা ও আর্য্যসংস্কৃতি বহন করে এনেছেন। এদেশে আর্য্যভাষীদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় বরেন্দ্রী এবং রাঢ় দেশের কোন কোন অঞ্চলে—বিশেষ করে ভাগীরথী এবং অজয় ও দামোদর নদ প্রবাহিত ভূভাগে। এদেশে আর্য্যভাষীদের উপনিবেশ স্থাপন বোধকরি মৌর্য্যযুগেই সুরু হয় এবং তা ব্যাপক আকার ধারণ করে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব্বে।

'রাঢ়' শব্দ অসভ্য অর্থ দ্যোতক। প্রাচীন বাঙগলায় এই অর্থে ব্যবহৃত হ'য়েছে;—বর্ত্তমান মৈথিলী ভাষায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খৃীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতু নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলছে,—

"কৃতাঞ্জলি বীর কহে হই গ চোয়াড়।<br>
লোকে না পরস করে সভে বলে রাঢ়॥"

অথবা, "অক্ষটি হিংশক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়।" সপ্তদশ শতকে ঘনরাম লিখেছেন,—"জাতি রাঢ় আমি রে, করমে রাঢ় তু।" ইত্যাদি প্রয়োগেও অসভ্য বা অস্পৃশ্য অর্থই ধ্বনিত হ'চ্ছে।

কিন্তু এই তথাকথিত অসভ্য রাঢ়দেশ (বর্ত্তমান বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চল) বীরের ভূমি বলে বিখ্যাত। শৌর্য্যে, পরাক্রমে, আত্মত্যাগে এই ভূমি অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা বারবার উজ্জ্বল করে তুলেছে। বীরভূম, শূরভূম, মল্লভূম প্রভৃতি নামগুলিও অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। সে যুগে রাঢ়দেশ ছিল বাঙলাদেশে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের রাজন্যদের, পাঠান, মুঘল ও বর্গীদের বারম্বার আক্রমণের প্রবল বাত্যা এদেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। সেই সমস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করতে হ'য়েছে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের—স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে।

ধর্ম্মমঙ্গলে রাঢ়দেশের জাতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কিছুটা ছায়াপাত হ'য়েছে। সেইজন্যই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়দেশের অথবা পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় মহাকাব্যের গৌরব দেওয়া হ'য়ে থাকে। ধর্ম্ম-সাহিত্যের আদি গ্রন্থ পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে ধর্ম্মরাজের উল্লেখ আছে। ধর্ম্মমঙ্গলে বৌদ্ধ প্রভাব ছাড়া হনুমানের কথায়, মায়ামুণ্ড পালায় ও লাউসেনের চরিত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব, পার্ব্বতীর উল্লেখে শাক্ত ধর্ম্মের প্রভাব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জামতি ও গোলাহাটের পালায় নাথ-সাহিত্য ও সহজিয়া সাধনার প্রভাব দেখা যায়।

রাঢ়দেশের নানা স্থানে হিন্দুসমাজে নিম্ন শ্রেণীর অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ জাতিদ্বারা মন্দিরে, মাঠের মধ্যে, নদীতীরে, পুকুর পাড়ে বা গাছের তলায় এক রকম প্রস্তর খণ্ড পূজিত হতে দেখা যায়। ইনি ধর্ম্ম, ধর্ম্মঠাকুর বা ধর্ম্মরাজ নামে অভিহিত হন। কোথাও কোথাও এই শিলাখণ্ডরূপ বিগ্রহের কাছাকাছি আরো দু'একটি ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে কামিন্যা বা ধর্ম্মরাজের সেবাদাসী বলা হয়। শীতলা দেবীকেও ধর্ম্মরাজের মন্দিরে দেখা যায়। ইনি বৌদ্ধ মন্দিরের হারিতী দেবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বৌদ্ধ পূজার এক উপকরণ হ'ল চুন,—ধর্ম্মরাজের কাছে অনেকে চুন মানসিক করেন। বিভিন্ন স্থানের ধর্ম্মঠাকুর এক এক বিভিন্ন নামে কথিত হন। যেমন, বুড়া রায়, বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, কালাচাঁদ, শীতলনারাণ,

ফতেসিং, কাঁকড়া বিছা প্রভৃতি নানা স্থানের ধর্ম্মঠাকুরের অজস্র নামোল্লেখ মাণিক গাংগুলীর ধর্ম্মমংগলে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মঠাকুরের কাছে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নরনারী নানা অভিষ্ট-পূর্ণ হওয়ার জন্য মানসিক করে থাকে। প্রার্থনা সফল হ'লে তাঁর কাছে শূকর, ছাগ, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়। ভোগে প্রচুর পিষ্টক ও মদ্য এবং সেই সংগে অনেক সময় চুনও দেওয়া হয়। ধর্ম্মরাজকে মাটির তৈরী ঘোড়াও উপহার দেওয়া হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে বিহার প্রদেশের 'বঢ়ম্' নামক উদীচ্যবেশী গ্রাম-দেবতার সংগে ধর্ম্মরাজের মিল আছে। ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজারীরা 'পণ্ডিত' উপাধি ব্যবহার করেন এবং তাঁদের তাম্র-দীক্ষার প্রয়োজন হয়। অনেকে আবার ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক পাদুকাচিহ্ন গলায় ঝুলিয়ে রাখেন।

ধর্ম্মরাজ বা ধর্ম্মঠাকুরের উদ্ভবের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রাক্-আর্য্য আদিবাসীদের কৌমি-সমাজে—বিশেষ ক'রে দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে-গ্রাম-দেবতাদের পূজা প্রচলিত ছিল। রোগ-শোক, আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দুর্দ্দশা হতে মুক্তি লাভের জন্য এই গ্রাম-দেবতারা শিলাখণ্ড বা বৃক্ষরূপে পূজা লাভ করতেন, এখনও করেন। শিলা-খণ্ডের পূজা যেমন প্রস্তর উপাসক আদিম মানবের স্মৃতি বহন করে নিয়ে চলেছে, বৃক্ষপূজা বা বনস্পতির উপাসনাও তেমনি আরণ্য মানবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই সমস্ত গ্রাম-দেবতারা কালে যখন যে ধর্ম্মের আশ্রিত সমাজে বাস করেছেন তখন সেই সমাজের ও ধর্ম্মের অনুকূল কোন নাম গ্রহণ করে সেই ধর্ম্মের দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্র, ধর্ম্ম এবং সমাজের উত্থান-পতনে ও বিবর্ত্তনে অনেক প্রাচীন দেবতা বিলুপ্ত হ'য়ে গেছেন, নূতন দেবতারা তাঁদের আসন অধিকার করেছেন। কোন প্রাচীন দেবতা হয়ত পূর্ব্ব পরিচয় ও সংস্কার গোপন করে নূতন ধর্ম্মের আওতায় প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা করছেন। ধর্ম্মঠাকুর এমনিই একটি দেবতা। তাঁর আগে যে কি নাম ও সংস্কার ছিল তা জানা যায়নি। তবে পরবর্ত্তীকালে তিনি লৌকিক, বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাদের সংগে মিশে গিয়ে বৌদ্ধ, শৈব, সৌর, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাশ্রিত সমাজে বাস করে, সকলের কাছেই পূজা আদায় করে, বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে পশ্চিমবংগে ধর্ম্মরাজ নাম নিয়ে পূজা গ্রহণ করছেন।

বাঙ্গলাদেশে এককালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গলার কোন কোন স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধ পাল-রাজারা প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন। পাল-পর্ব্বেই বাঙ্গলার চন্দ্র ও কম্বোজ বংশীয় রাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন। পাল-সম্রাট্ প্রথম মহীপালের সমকালে, তৎকালীন বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ, যাঁর নামে সমগ্র বৌদ্ধজগৎ আজও শ্রদ্ধায় মাথা নত করে, দীর্ঘকাল ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল মহাবিহারের মহাচার্য্যের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য্য শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাঙ্গলার বহু শত লোক নালন্দা ও অন্যান্য মহাবিহারগুলিতে অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় রত ছিলেন। বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যায় শত শত শ্রমণ বাস করতেন।

কোর্ডিয়ার সাহেব কর্তৃক সঙ্কলিত তালিকা থেকে জানা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অজস্র পুঁথি বাঙ্গালীদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। ধর্ম্ম-কর্ম্ম, প্রাচীন সাহিত্য ও গাথায় বহু বৌদ্ধ প্রভাব জড়িত রয়েছে। বঙ্গদেশে অত্যধিক বৌদ্ধ প্রভাবের জন্য (?) বোধায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্রে এদেশে আগমনকারী হিন্দুদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল।

বৌদ্ধ পাল-রাজাদের সময়েই, অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম নবশক্তিতে বিস্তৃত হয়। অনুমান করা হয় যে, এই সময়ের মধ্যেই এই অঞ্চলের 'গ্রাম-দেবতারা' বৌদ্ধ সংস্কারে দীক্ষিত হ'য়ে এবং "ধর্ম্ম" নাম গ্রহণ করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখলেন। বৌদ্ধ সাধনার চরম আদর্শ শূন্যতার উপলব্ধি। তথাগতের বাণীতে আছে,—"সর্ব্বম্ অনিত্যম্, সর্ব্বম্ অনাত্মম্, নির্ব্বাণং শান্তম্"। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এই-ই। এ থেকেই শূন্যবাদের উদ্ভব হ'য়েছে। তাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করলেও ধর্ম্মঠাকুরের ধ্যানমূর্ত্তি রইল "শূন্যতা"। ধর্ম্মরাজ পূজার মন্ত্রে আছে,—"ভক্তানাং কামপুরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং—"। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বুদ্ধদেবের এক নাম 'ধম্মরাজ' বা 'ধর্ম্মরাজ'। মূল বাল্মীকি-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে, এক শত অষ্টম সর্গে, বেদনিন্দাকারী বৌদ্ধদের চোরের ন্যায় ঘৃণ্য ও নাস্তিক বলা হয়েছে দেখা যায়। ধর্ম্মরাজও বেদ নিন্দা করেন এবং উচ্চবর্ণের কাছে তিনি পতিত।

"......বৌদ্ধ ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। কালক্রমে হিন্দুস্থানে বৌদ্ধ শব্দ অর্থদুষ্ট হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ এবং নাস্তিক এই দেশে একার্থ বাচক

হইয়াছিল। এই জন্যই কিংবা অন্য কোন কারণে এদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় আপনাদিগকে ত্রিরত্নের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্ম্মশব্দের রূপান্তর দ্বারা পরিচিত করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে 'সদ্ধর্ম্মী' বলিতেন। বুদ্ধ শব্দের পরিবর্ত্তে তাঁহারা ধর্ম্ম শব্দের দ্বারা আপনাদের উপাস্য দেবতাকে অভিহিত করিতেন। প্রাচীন উপনিষদের ব্রহ্মের সঙ্গে আধুনিক কালের পৌরাণিক দেব দেবীর যে সম্বন্ধ, জগৎপূজ্য বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই কল্পিত ধর্ম্মঠাকুরের সম্বন্ধ তাহা হইতে অধিক নহে। তথাপি যেরূপ হিন্দুধর্ম্ম বলিতে বেদ ও উপনিষদের ধর্ম্ম এবং পৌরাণিক ধর্ম্ম সমস্তই বুঝায়, তদ্রূপ সৎ ধর্ম্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলিতে অশোকের সময়ের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ধর্ম্মপূজা—ইহা সমস্তই বুঝাইতেছে। ত্রিরত্নের তৃতীয়—সঙ্ঘ—শঙ্খ নামে বিকৃত হইয়া ধর্ম্ম পূজায় স্থান পাইয়াছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

ধর্ম্মরাজ অহিংসার প্রতিমূর্ত্তি বুদ্ধদেবের সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে পড়লেও কৌম সমাজের প্রথানুসারে পশুপক্ষীর রুধিরে তাঁর পূজা অব্যাহত রইল।

ধর্ম্মরাজ বিগ্রহরূপ শিলাখণ্ডের আকৃতি সর্ব্বত্র এক রকম নয়। সুপ্রাচীনকালে আদিবাসী-সমাজে গ্রাম-দেবতাদের উদ্ভবের যুগে এই দেবতার কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি ছিল না,—বিগ্রহের জন্য যে কোন একটি শিলাখণ্ডই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু অনেক পরবর্ত্তীকালে, বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়ায় আত্মগোপন করে 'ধর্ম্মরাজ' নাম গ্রহণ করার পর, বৌদ্ধস্তূপের প্রতীক এই পাষাণখণ্ডের আকৃতি পাদুকা-চিহ্নিত কূর্ম্মাকৃতি হবে,—বৌদ্ধ পরিকল্পনায় এই নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। এর কারণ,- "কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের আকৃতি অনেকটা বৌদ্ধ-স্তূপ বা চৈত্যের অনুরূপ। ইহার চারিপদ ও মস্তকে চৈত্য মধ্যস্থ পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করা হয়। এইভাবে এই ধর্ম্মঠাকুর ক্রমে নিরঞ্জন, নিরাকার, ত্রিগুণাতীত, জ্ঞানময়, অনাদি প্রভৃতি বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।" (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)। শূন্যপুরাণে বর্ণিত হ'য়েছে, ধর্ম্মরাজ শূন্যমূর্ত্তি এবং তাঁর বাহন হ'ল শ্বেত উলুক, শ্বেত কাক বা বানর।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে হিন্দু সেন-রাজারা দাক্ষিণাত্য থেকে বঙ্গদেশে আসেন। প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে এবং তারপর পাল-রাজত্বের অবসানে পশ্চিম-বঙ্গেই তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয় বেশী। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও পৌরাণিক আদর্শ এবং স্মৃতির শাসন বাঙলার তদানীন্তন বৌদ্ধ প্রভাবিত সমাজে এক বিরাট পরিবর্ত্তন এনে দেয়। রাজকীয় বলে

বলীয়ান হিন্দু সংস্কারের কাছে দুর্ব্বল বৌদ্ধ সংস্কারকে নত হতে হ'ল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে সমাজের অনেকেই—বিশেষত সম্ভ্রান্ত অভিজাত ব্যক্তিরা—আবার হিন্দুধর্ম্মের নব আদর্শকে বরণ করে নিল'। যারা কোন কারণে পুরাতন সংস্কারকে পরিত্যাগ ক'রল না, তারা সমাজচ্যুত হয়ে রইল'। তাদেরই অনেকে আজও অস্পৃশ্য অন্ত্যজ রূপে হিন্দুসমাজে নিম্নশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে রয়েছে। এদেরই অনেকে আবার চতুর্দ্দশ শতাব্দী ও তার পরবর্ত্তীকালে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক কারণে ইস্‌লাম ধর্ম্মকে আশ্রয় করে।

রাজপ্রসাদ-বঞ্চিত বৌদ্ধধর্ম্মকে অবলম্বন করে থাকায় আর সুবিধা নেই বুঝে 'বহুরূপী' ধর্ম্মঠাকুর যুগোপযোগী নাম পরিবর্ত্তনের আবশ্যক বোধ করলেন না বটে, তবে গুণ এবং ধ্যানমূর্ত্তি পরিবর্ত্তনের আবশ্যক অনুভব করলেন। তিনি 'শূন্যমূর্ত্তি' পরিত্যাগ করে ক্রমশ বৈদিক বরুণ, সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে মিহির, বিষ্ণুর কূর্ম্ম বা কল্কি অবতার এবং কালক্রমে স্বয়ং বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হ'লেন। তাঁর ধ্যানমূর্ত্তি হ'ল—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভূজ মূর্ত্তি এবং তিনি ভক্তবৎসল রূপে পরিচিত হ'লেন। এর কারণ সংসারী মানুষের কাছে অরূপ, নির্গুণ, বিশুষ্ক জ্ঞানময় শূন্যমূর্ত্তির চেয়ে রূপ ও রসাশ্রয়ী সাধনায় ভক্তবৎসল চতুর্ভূজ দেবতার ধ্যানমূর্ত্তি সহজবোধ্য এবং অধিক আকর্ষণীয়। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় ধর্ম্মঠাকুরের বিষ্ণুমূর্ত্তি আরও ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত হ'য়েছিল। কোথাও কোথাও ধর্ম্মঠাকুর যম, শিব, রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেও অভিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। মহিষবাহন যমরাজ এবং পাণ্ডব যুধিষ্ঠির হিন্দু পুরাণে ধর্ম্মরাজ নামেও উল্লিখিত হন। নাম-সামঞ্জস্যের জন্যই এরূপ হ'য়েছিল অনুমান করা যেতে পারে। তাছাড়া, আত্মরক্ষা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য যখন যে রকম 'ভেখ' নেবার দরকার হ'য়েছে ধর্ম্মঠাকুর তা নিতে দ্বিধা করেননি। অতএব দেখা যাচ্ছে, ধর্ম্মরাজ নামে পরিচিত এই লৌকিক গ্রাম-দেবতার উপর এককালে বৌদ্ধ-প্রভাব খুব বেশী পড়লেও আজকের দিনে তাঁর যে-রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই সেটি তাঁর নানা যুগে নানা ধর্ম্মের ভাব-কল্পনায় সমন্বিত রূপ। শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় লিখেছেন,— "সৌর, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়ে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে"।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই আদিম মানবের দ্বারা গ্রাম-দেবতারা পূজিত

হতেন। তাঁদের অধিকাংশেরই অস্তিত্ব উন্নততর ধর্ম্মের ও সমাজের আদর্শে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। কিন্তু ধর্ম্মঠাকুররূপ গ্রাম-দেবতার প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান কালেও অল্প-বিস্তর আছে। এর প্রধান কারণ, এই দেবতার যুগের সঙেগ সমতা রেখে চলার অপারিসীম পটুতা। যখন যে ধর্ম্মের হাওয়া প্রবল হয়েছে তখন সেই ধর্ম্মের নবশক্তির সঙেগ বিরোধ না করে ইনি তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে নিজে তার ছত্রচ্ছায়ায় নিরাপদে বাস করেছেন। দ্বিতীয়ত কয়েকজন প্রতিভাবান কবি এই দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের উপলক্ষ্য করে কাব্য রচনা করে সমাজে এ'র আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন। তৃতীয়ত ধর্ম্ম-মঙগল কাব্যগুলি এই রাঢ় অঞ্চলের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সমসাময়িক সমাজের চিত্র-সম্বলিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এগুলির আখ্যানভাগে বীরত্ব, আত্মত্যাগ, প্রভুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণগুলি বর্ণিত হওয়ায় এগুলি সহজেই এ অঞ্চলের লোকের মর্ম্মমূলে স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়। এই কাব্যগুলির ব্যাপক প্রচারের সঙেগ সঙেগ ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্যেরও বহুল প্রচার হয়। তাছাড়া, ধর্ম্মরাজ সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ণকারী রূপেও সংসারীদের কাছে মর্য্যাদা লাভ করেন।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙগল"-এর ভূমিকায় বলেছেন,—"অশ্বে আরোহণ করিয়া, কোমলাঙেগ কঠিন বর্ম্ম পরিয়া বাঙগালী রমণীর ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধে গমন— কোন কাব্যে এ নয়ন-মনোহর দৃশ্য আছে? ধর্ম্মমঙগলের ন্যায় মৌলিক মহাকাব্য বঙেগর ভাষা-ভাণ্ডারে আর কি আছে? কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশ-কুসুম নহে, মস্তিস্কের বিকৃতি নহে,—বাস্তব ঘটনা'ঐ কাব্যের একাংশীভূত। ঐ কাব্য ঐতিহাসিক, তবে কবি-কল্পনায় ইতিহাস কাব্যরসে পরিণত হইয়াছে। বাঙগলা তখন স্বাধীন ছিল,—পালবংশীয় রাজগণ তখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙগালী বীরের পদভরে বঙগভূমি কাঁপিত, সেই সময় বঙেগর সেই শুভসময় এ কাব্যের উৎপত্তিকাল।"

ধর্ম্মমঙগল কাব্যের বিষয়বস্তু কি ঐতিহাসিক? মঙগলকাব্যগুলির মধ্যে ধর্ম্মমঙগলের আখ্যানভাগেই সবচেয়ে বেশী ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। গল্পাংশে মূল কাঠামোর উপর অলৌকিকতা ও কবি-কল্পনার যথেষ্ট আবরণ পড়লেও এর ভিত্তি নাকি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙগলা দেশে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে প্রায় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে। পাল-পর্ব্বে এই সামন্ত-প্রথা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।

সামন্তেরা মুখে মহারাজাধিরাজের সর্ব্বাধিপত্য মেনে চল্‌লেও প্রকৃতপক্ষে নিজের রাজ্যসীমা মধ্যে তাঁরা স্বাধীন নরপতির মত ব্যবহার করতেন। রাজা-মহারাজা উপাধিও নিতেন। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক বীরধর্ম্মও প্রচলিত ছিল অনিবার্য্য ভাবে। সেই সঙ্গে ছিল সেই ধর্ম্মোদ্ভূত বীরগাথা। ধর্ম্মমঙ্গল এমনিই কোন বীরগাথা অবলম্বনে রচিত কাব্য।

এই গ্রন্থে ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়াও নানা প্রসঙ্গেই বাঙলার পালরাজবংশ ও সেনরাজবংশের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়েছে। এখানে বাঙলার সে-যুগের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বোধকরি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ জেলার কাণসোনা) অধিপতি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত পরম শৈব মহাবীর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত প্রথমে ছিলেন গুপ্ত-সম্রাটদের মহাসামন্ত। তারপর তিনি গৌড়ের[*] স্বাধীন নরপতি রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর সময়ে সর্ব্বপ্রথম গৌড রাষ্ট্র উত্তর ভারতের রাষ্ট্রিক ইতিহাসে একটি

---

[*] গৌড বহু প্রাচীন দেশ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এই জনপদের কথা আছে। গৌড শব্দটি নাকি গুড় থেকে এসেছে এর ঐতিহাসিক ও শব্দতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। আবার অনেকে মনে করেন, গৌড জাতির নাম থেকে গৌড শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

গৌড বলতে বরেন্দ্রভূমি রাঢ় ও সূক্ষ্মদেশকে একত্রে বোঝাত। এক কথায় পূর্ব্ব বঙ্গ বাদ দিয়ে বাঙলাদেশের বাকী অংশকে বোঝাত। পরবর্ত্তীকালে গোটা বাঙলাদেশকে বোঝাতেও গৌড কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'আমরা মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গ বলিতে (অর্থাৎ মালদহ-মুর্শিদাবাদ বীরভূম বর্দ্ধমানের কিয়দংশ) এখন যাহা বুঝি তাহাই ছিল প্রাচীন গৌড় জনপদ। দক্ষিণ রাঢ় মণ্ডল বা তাম্রলিপ্ত দণ্ডভুক্তি বোধ হয় গৌড জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যদিও গৌড়ের রাষ্ট্রসীমা কখনও কখনও উৎকল দণ্ডভুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং গৌড বলিতে এক এক সময় হয়তো সমগ্র বাংলাদেশকেও বুঝাইত।' "পাল ও সেনরাজাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হওয়া। বঙ্গপতি যে মুহূর্ত্তে গৌড়ের অধিপতি সেই মুহূর্ত্তেই তিনি গৌড়েশ্বর, লক্ষ্মণসেন যে মুহূর্ত্তে গৌড় অধিকার করিলেন সেই মুহূর্ত্তে তিনিও হইলেন গৌড়েশ্বর। শশাঙ্কের সময় হইতেই একটি মাত্র নাম লইয়া প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টার সজ্ঞান সূচনা দেখা দিয়াছিল পাল ও সেন রাজাদের আমলে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল যদিও বঙ্গ তখনও পর্যন্ত আপন স্বতন্ত্র জনপদ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছে।' "ঔরংজীবের আমলে সুবা বাংলার যে অংশ নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনাধীন ছিল তাহাকে বলা হইত গৌড়মণ্ডল। ঊনবিংশ শতকে যখন মধুসূদন দত্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন ঃ

'রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

তখন গৌড়জন বলিতে তিনি সমগ্র বাংলাদেশের অধিবাসীকেই বুঝাইয়াছিলেন।"
(ডক্টর শ্রীযুত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের 'বাঙালীর ইতিহাস')

বিশিষ্ট উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে। শশাঙ্কের তিরোভাবের পর দেশে রাজনৈতিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ায় গৌড় ও মগধ রাজ্যের উপর বৈদেশিক আক্রমণ চলে ও সেইসঙ্গে সামন্তদের মধ্যে গৃহবিবাদ লেগে যায়। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর গৌড়তন্ত্র এক রকম ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর প্রায় সুদীর্ঘ একশ' বছর ধরে শুধু গৌড়ের নয়, সমস্ত বাঙলাদেশের ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ। দেশের সর্ব্বত্র দেখা দিল অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়—অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার নীতি। এই নিদারুণ নৈরাজ্য থেকে মুক্তিলাভের আশায় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে সমগ্র বাঙলাদেশের প্রকৃতিপুঞ্জ ও সামন্ত-নায়কেরা নিজেদের মধ্য থেকে ধীর স্থির বুদ্ধিমান ও যুদ্ধকুশলী গোপালদেবকে সার্ব্বভৌম ক্ষমতাযুক্ত অধিরাজ নির্ব্বাচন করেন। পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এই গোপালদেব ছিলেন বাঙালী। তাঁর পিতৃভূমি—বরেন্দ্রীদেশ। খালিমপুর-লিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতামহের নাম বপ্যট এবং পিতার নাম দয়িতবিষ্ণু। তাঁর মহিষীর নাম ছিল দেদ্দদেবী। গোপালদেব দেশের অরাজকতা দূর করে সমগ্র বঙ্গ ও গৌড়ে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। পালবংশীয় রাজারা ধর্ম্মে বৌদ্ধ; পরম সৌগত। তবুও সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁদের সহনশীলতা ছিল ও তাঁরা উদার মত পোষণ করতেন। সমাজের সকল স্তরের প্রতি তাঁদের ছিল সমান দৃষ্টি। পাল-রাজবংশ প্রায় চারশ' বছর বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। শশাঙ্কের বৃহত্তর গৌড়তন্ত্র গড়ে তোলার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টাকে তাঁরা গৌরবময়ভাবে সফল করে তুলেছিলেন। দেশ বিদেশ গৌড়েশ্বরের জয়গানে মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল। এই পর্ব্বে শিক্ষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাস্কর্য্য, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হ'য়েছিল। বর্ত্তমান বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির গোড়াপত্তন হয় এই যুগেই। বৌদ্ধ, শৈব, ব্রাহ্মণ্য ও শাক্ত তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় পাল-পর্ব্বেই হ'য়েছিল। গোপাল-দেবের পুত্র পঞ্চগৌড়াধিপ* ধর্ম্মপাল অথবা শ্রীবিক্রমশীলদেব (আ ৭৭০—৮১০ খ্রীঃ) সমগ্র উত্তর ভারতে এবং বেরার ও নেপালে সর্ব্বময় আধিপত্য বিস্তার করেন। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল (আ ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) বাহুবলে পিতার অধিকৃত সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ

* পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায় কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে। পঞ্চ-গৌড় বলতে গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং উৎকল বোঝায়।

দেশ থেকে আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্য্যন্ত এবং হিমালয়ের সানুদেশ থেকে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তার লাভ করেছিল। দেবপালের তিরোভাবের পর থেকে পালসাম্রাজ্য স্তিমিতবীর্য্য হ'য়ে পড়তে থাকে। রাজবংশে পারিবারিক কলহ ও অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। দেবপালের পুত্র বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন তাঁর সেনানায়ক বাক্‌পালের পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল (আ ৮৫০—৮৫৪) অথবা শূরপাল। প্রথম বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপাল (আ ৮৫৪—৯০৮) এবং তাঁর পুত্র রাজ্যপাল (আ ৯০৮—৯৪০) ও পৌত্র দ্বিতীয় গোপাল (আ ৯৪০—৯৬০) এর সময় পর্য্যন্ত পাল-সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অধিকারচ্যুত হ'য়ে গেলেও অন্তত মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় মগধও হস্তচ্যুত হ'য়ে যায়। বহির্বাঙ্গলার কয়েকটি রাজবংশের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সংগ্রাম এবং সামন্ত-চক্রের বিদ্রোহ ও নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে একাদশ শতকের প্রথম পাদে বাঙ্গলাদেশে দক্ষিণ-রাঢ়ে রণশূর, দণ্ডবুক্তিতে (দণ্ডভুক্তি বা দাঁতন) ধর্ম্মপাল, বঙ্গালদেশে গোবিন্দচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন নর-পতির রাজ্য গড়ে ওঠে। কেবলমাত্র উত্তর-রাঢ় পাল-রাজ দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালের (আ ৯৮৮-১০৩৮) অধীন ছিল। এ'রা সকলেই দাক্ষিণাত্যের, রাজরাজের পুত্র, 'গঙ্গৈকোণ্ড' প্রথম রাজেন্দ্র চোলের কাছে পরাজিত হ'য়েছিলেন,—তিরুমলয় লিপির সাক্ষ্যে এরূপ মনে হয়।

পিতৃরাজ্য গৌড় হারিয়ে পাল-সম্রাট্ প্রথম মহীপাল রাঢ়দেশের অরণ্যময় প্রদেশ মুর্শিদাবাদের গয়েসপুর অঞ্চলে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর প্রধান কীর্ত্তি হ'ল "অনধিকৃতবিলুপ্ত পিতৃরাজ্য" পুনরুদ্ধার করা। নিভৃতে ভল্ল, ডোম, বাগ্দী, হাড়ী প্রভৃতি রাঢ়ের যোদ্ধৃজাতিগুলিকে (ধর্ম্মরাজ দেবতার নামে ?) একতাবদ্ধ করে তাদের সাহায্যে অবিরত সংগ্রামের পর প্রথম মহীপাল শুধু গৌড় পুনরধিকার করেই নিশ্চিত হন্‌নি, বিলুপ্ত পাল-সাম্রাজ্যের কিছু অংশও উদ্ধার করে পাল-বংশের হৃত গৌরবেরও অনেকখানি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতে বাঙ্গলাদেশ আবার গৌরবময় আসন লাভ করেছিল। ধান ভান্‌তে 'শিবের গীতের' সঙ্গে 'মহীপালের গীত' আজও বিখ্যাত হ'য়ে আছে। ধর্ম্মরাজ দেবতার পূজার প্রবর্ত্তন হয় নিঃসন্দেহ এ'রই সময়। মহীপালের দেহাবসানের পর পাল-রাজত্বে আবার ভাঙ্গন ধর্‌ল'। প্রথম মহীপালের পুত্র জয়পাল (আ ১০৩৮-১০৫৫); জয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের (আ ১০৫৫-১০৭০) রাজত্ব-

কালে পশ্চিমবঙ্গে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ (ইছাই ঘোষ?) নামে এক সামন্তরাজা এই সময় প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে নিজেকে স্বাধীন রাজাধিরাজ রূপে ঘোষণা করেন। ইনি পাল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এঁর রাজধানী ছিল বর্দ্ধমান অঞ্চলের অজয়তীরবর্ত্তী ত্রিষষ্টীগড় অথবা ঢেকুর গড়। ধর্ম্মমঙ্গল উপাখ্যানে সোম ঘোষেব পুত্র যে পরাক্রান্ত বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষের কথা আছে, খুব সম্ভব তিনি এবং এই ঈশ্বর ঘোষ অভিন্ন। পূর্ব্ববঙ্গেও এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বাঙালী চন্দ্রবংশ ও পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাশ্রয়ী বিষ্ণুভক্ত অবাঙালী বর্ম্মণবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে পশ্চিম ও পূর্ব্বঙ্গ পালরাজত্বের বাইরে চলে যায়। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র। দ্বিতীয় মহীপাল (আ ১০৭০-১০৭৫), দ্বিতীয় শূরপাল (আ ১০৭৫-১০৭৭) এবং রামপাল (আ ১০৭৭-১১২০)। দ্বিতীয় মহীপাল সন্দেহবশে অপর দুই ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করেন। তাঁর অত্যাচারে উত্তরবঙ্গে বা বরেন্দ্রভূমে কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্যের নায়কত্বে প্রজাগণের অভ্যুত্থান হ'য়েছিল। ঘরে ভাতৃবিরোধ, বাইরে সামন্তদের চক্রান্তেব মধ্যে দ্বিতীয় মহীপাল বরেন্দ্রভূমের এই 'কৈবর্ত্তবিদ্রোহ' দমন করতে গিয়ে নিহত হন। বিজয়ী জন-নায়ক ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিব্য (দিব্বোক) বরেন্দ্রীর স্বাধীন রাজা হন। কর্ণাটী সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন এই সুযোগে রাঢ় অঞ্চলে নিজেকে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রামপালের রাজ্যের বিস্তার ছিল মাত্র উত্তর-বিহার এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে। কর্ণাটী আর এক সেন-বংশোদ্ভূত মিথিলার রাজা নান্যদেবের সঙ্গে গৌড়রাজ রামপালেব এবং বঙ্গরাজ বিজয় সেনের যুদ্ধ হ'য়েছিল; ক্রমে মিথিলাও রামপালের রাজ্যের বহির্ভূত হ'য়ে যায়। কূটবুদ্ধি ও শৌর্য্যশালী রামপাল সামন্ত নরপতিদের সাহায্য ভিক্ষা ও ক্রয় করে সম্মিলিত শক্তিতে দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে পরাজিত করে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেন। ঢেক্করীর বা ঢেকুরের কোন এক সামন্তরাজাও রামপালকে বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছিলেন। রাম-পাল বাঙলার হৃতরাজ্যের কিছু অংশ উদ্ধার করেন এবং উড়িষ্যা ও কামরূপে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। তিনি দৃঢ়চেতা ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন বলে নানা কাহিনী আছে। রামপালের পর তাঁর তৃতীয় পুত্র কুমার-পাল রাজা হন (আ ১১২০-১১২৫)। কুমারপালের পর তাঁর পুত্র তৃতীয় গোপাল (আ ১১২৫-১১৪০) রাজত্ব লাভ করেন এবং তারপর রামপালের চতুর্থ পুত্র মদনপাল (আ ১১৪০-১১৫৫) সিংহাসনারোহণ করেন। তিনিই

সম্ভবত পালবংশের শেষ সম্রাট্। সমগ্র বাঙ্গলাদেশের মধ্যে বরেন্দ্রভূমির কিছু অংশ মাত্র এবং বর্ত্তমান বিহারের মধ্য ও পূর্ব্ব অঞ্চল তাঁর অধীন ছিল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার গৌরব পাল-রাজবংশ লুপ্ত হয়ে গেল।

কর্ণাট দেশাগত সেন-রাজবংশের আদিপুরুষ সামন্তসেনের পৌত্র ও হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন (আ ১০৯৫-১১৫৮) ইতিপূর্ব্বেই বর্ম্মণবংশীয় রাজাদেব পরাজিত করে পূর্ব্ব বঙ্গে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এখন পাল-রাজবংশের দুর্ব্বলতার সুযোগে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হলেন। কালিন্দী নদীর তীরে মদনপালের সঙ্গে বিজয়সেনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত নামে ঐতিহাসিক কাব্যে এবং বিজয়সেনেব দেওপাড়া লিপিতে।

এখন আবার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকত্বে ফিরে আসা যাক।

ধর্ম্মমঙ্গলে গৌড়ের যে রাজার কথা আছে, তাঁর নামোল্লেখ না করে তাঁকে 'রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র' বলা হয়েছে। কে এই গৌড়েশ্বর তা নিশ্চিত জানা যায়নি। তবে অনেক পণ্ডিতের অনুমান যে ইনি পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের পৌত্র এবং পালরাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ধর্ম্মপালদেবের সুযোগ্য পুত্র দেবপাল ভিন্ন আর কেহ নন্। ধর্ম্ম-মঙ্গলের গল্পাংশে শক্তি উপাসক গোপজাতীয় ইছাই ঘোষ (ঈশ্বর ঘোষ?) নামে রাঢ় অঞ্চলের ঢেকুরের কোন বিদ্রোহী স্বাধীন সামন্ত নরপতির কাছে কোন এক পাল-সম্রাটের পরাজয় এবং এই কাব্যের নায়ক লাউসেন নামে পাল-সম্রাটের আর একজন সামন্ত-রাজ কর্ণসেনের পুত্রের দ্বারা ইছাই ঘোষের নিধনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ঈশ্বর ঘোষ কিন্তু দেবপালের প্রায় দুশ' বছর পরে তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক এবং বোধকরি ইনি সেন-রাজবংশের সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার বর্ত্তমান ময়না-পুরকে অনেকে কর্ণসেনের ময়নাগড় মনে করে থাকেন। কবি বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' যে রাজা দেবসেনের উল্লেখ আছে তিনিই সম্ভবত এই রাজা কর্ণসেনের পূর্ব্ব-পুরুষ। সুহ্মের দামলিপ্ত অথবা তাম্রলিপ্ত—বর্ত্তমান তমলুক—এক সময়ে এঁদের রাজধানী ছিল। যাই হোক, এই অংশটুকুকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এরই উপর ভিত্তি করে কাহিনী পল্লবিত হয়েছে।

লাউসেন নামে কোন ঐতিহাসিক চরিত্র ছিল কিনা বলা কঠিন। ডক্টর শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস'এ

লাউসেনকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করে অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন, "তাঁর (দেবপালের) সেনাপতি লাউসেন উৎকল ও কামরূপ জয় করেন।"। এদিকে ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন মহাশয় 'বাঙগালা সাহিত্যের ইতিহাসে' লিখেছেন, "লাউসেনের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া অনেকেই মাথা ঘামাইয়াছেন। * * লাউসেন বলিয়া কোনকালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই।"

প্রাচীনতম ধর্ম্ম-সাহিত্যে নায়ক লাউসেন নন্,—নায়ক পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্র। পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মমঙগলের আদি কবি ময়ূরভট্টই সম্ভবত এই পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী পরিত্যাগ করে স্বদেশ প্রচলিত এক বা একাধিক ঐতিহাসিক বীরগাথাকে অবলম্বন করে লাউসেন-ইছাই ঘোষের গল্পের অবতারণা করেছেন। এই কাব্য রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে মূল কাহিনীর ঐক্য নষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু নানা হস্তের প্রক্ষেপে ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য দেখা যায়। একথা হয়ত অনুমান করা যেতে পারে যে, বাল্মীকির আবির্ভাবের অনেক আগেই যেমন আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত রামগাথা দাক্ষিণাত্যের রাবণগাথার সঙেগ মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ নূতন এক কাহিনীর রূপ নিয়েছিল, তেমনি হয়ত পাল-সম্রাটদের সময়ে লোকমুখে প্রচলিত কোন এক বৌদ্ধ সামন্তের বীরগাথার সঙেগ শক্তিউপাসক মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের স্বতন্ত্র এক বীরগাথা পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের প্রয়োজনে ময়ূরভট্ট বা অপর কারো হাতে সমন্বিত হ'য়ে বর্ত্তমান উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এখানে একথা ভুল্‌লে চলবে না, যে এই কাহিনী সমাজের নিম্নস্তরের অশিক্ষিত জনগণের জন্য রচিত হ'য়েছিল এবং তাদের কাছে ঐতিহাসিক তথ্য বড় কথা নয়; বড় কথা, দেবতার অলৌকিক মাহাত্ম্য।

## ধর্ম্মমঙগলকাব্যের আখ্যায়িকা

প্রথম অংশে ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি ও রামাই পণ্ডিতের কথার পর গল্প আরম্ভ হয়েছে।

রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র তখন গৌড়েশ্বর। তাঁর মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত তাঁরই শ্যালক মাহুদ্যা বা মহামদ। গৌড়েশ্বর, তাঁর মন্ত্রীর চক্রান্তে বন্দী, নিরপরাধ সোমঘোষকে কারামুক্ত করে তাঁকে অজয় নদের তীরবর্ত্তী ত্রিষষ্টী গড়ে (ঢেকুর-গড়—সুহ্মের প্রাচীন রাজধানী শ্যামারূপার গড়) তাঁর আর একজন সামন্ত-রাজা কর্ণসেনের উপরে তত্ত্বধায়ক নিযুক্ত করে তাঁকে সেখানে প্রেরণ করলেন।

সোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষ যৌবনে অত্যন্ত বলশালী ও দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠে কর্ণসেনকে বিতাড়িত করে এবং ঢেকুরে নূতন গড় নির্ম্মাণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। গৌড়ে রাজস্ব না পাঠিয়ে সম্রাটের লোকজনকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। প্রতিশোধ কল্পে গৌড়েশ্বর নয় লক্ষ সৈন্যসহ ঢেকুর আক্রমণ করলেন। কিন্তু ইছাই এর কাছে পরাজিত হয়ে তাঁকে পলায়ন করতে হল। এই যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হলেন, পুত্রবধূরা সহমৃতা হলেন। কর্ণসেনের রাণী শোকে আত্মহত্যা করলেন। বৃদ্ধ কর্ণসেন দুঃখে উন্মত্তবৎ হয়ে পড়লেন। প্রিয় সামন্তের মনস্তাপে সহানুভূতি দেখিয়ে গৌড়েশ্বর তাঁর পরমাসুন্দরী ও অশেষ গুণবতী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন এবং তাঁকে ময়নাগড়ের (বাকুড়া জেলার ময়নাপুর?) সামন্ত-রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। এই বিবাহ মহামদের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীকে অপমান করেন।

রঞ্জাবতী সন্তান লাভে হতাশ হয়ে পড়েন। পরে রামাই পণ্ডিতের উপদেশ মত ধর্ম্মরাজের গাজন উৎসব ও নানা কৃচ্ছ্রসাধন করেন। ধর্ম্মরাজের বরে তাঁর গর্ভে এক শাপভ্রষ্ট দেবতা, ধর্ম্মরাজের মহিমা প্রচার করার জন্য, অত্যন্ত সুন্দর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এই পুত্রের নাম লাউসেন। মহামদের আদেশে ইন্দামেটে নামে এক চোর শিশু লাউসেনকে অপহরণ করে, কিন্তু পথে ধর্ম্মরাজ হনুমানের সাহায্যে লাউসেনকে উদ্ধার করলেন। ধর্ম্মরাজ কর্পূরবিন্দু থেকে এক শিশু সৃষ্টি করে রঞ্জাবতীকে আর একটি পুত্র দেন। এই দ্বিতীয় পুত্রের নাম কর্পূরধবল সেন।

ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে বীর হনুমান বৃদ্ধ মল্লের রূপ ধারণ করে লাউসেন ও কর্পূরসেনকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করলেন এবং অল্পদিনেই লাউসেনকে মল্লযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী করে তুললেন। মোহিনী-মূর্ত্তিতে পার্ব্বতী লাউসেনের চরিত্রবল পরীক্ষা করে প্রসন্ন হয়ে তিনি তাঁকে স্বহস্তের অজেয় খড়্গ দান করলেন।

মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করে লাউসেন কর্পূরকে সঙ্গে নিয়ে গৌড় যাত্রা করলেন। পথে মহামদ প্রেরিত আটজন মল্ল, কামদল বাঘ ও এক অতিকায় কুম্ভীর তাঁদের আক্রমণ করে। কর্পূর প্রাণভয়ে অগ্রজকে পরিত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করে। লাউসেন একাই যুদ্ধ করেন এবং ধর্ম্ম-ঠাকুরের অনুগ্রহে জয়ী হন। এর পর তাঁরা দু'ভাই জামতি নগরে (বীরভূমের জামনা?) পৌঁছেন। এই নগরে বারুই স্ত্রী নয়ানী লাউসেনের কাছে অসৎ

প্রস্তাব করে ব্যর্থ হওয়ায় নিজ সন্তানকে এক কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করে রাজ-দ্বারে লাউসেনকে এর জন্য দায়ী বলে অভিযুক্ত করে। লাউসেনকে কারাবাস করতে হয়। পরে ধর্ম্মরাজের কৃপায় মৃত সন্তানকে জীবিত করে তার মুখে প্রকৃত ঘটনা সকলকে শুনিয়ে অব্যাহতি লাভ করেন। এরপর লাউসেন গোলাহাট (মুর্শিদাবাদে ময়ূরাক্ষী তীরে?) পৌঁছেন। এই গোলাহাট স্ত্রী-প্রধান দেশ। এখানের অধিশ্বরী নটী সুরিক্ষা লাউসেনকে ভুলিয়ে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করে। লাউসেন ধর্ম্মের কৃপায় ও হনুমানের সাহায্যে সুরিক্ষার কতকগুলি হেঁয়ালীর উত্তর দিয়ে জয়ী হন এবং নিস্কৃতি লাভ করে গৌড় যাত্রা করেন।

গৌড়ে (সেকালের পাল-রাজধানী গয়েসপুর?) উপস্থিত হলে তাঁদের মাতুল মহামদ উভয় ভ্রাতাকে চোর বলে ঘোষণা করে দেন। কর্পূরে বিপদের আভাষ পেয়েই পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। মহামদের ষড়যন্ত্রে লাউসেনের কারাবাস হ'ল। তারপর ধর্ম্মরাজের কৃপায় সম্রাটের পাটহস্তিকে বধ ও পুনরুজ্জীবন করে গৌড়েশ্বরের কাছে ময়নানগর তালুক ইজারা পেলেন। পক্ষিরাজ সদৃশ একটি অশ্বও উপহার লাভ করলেন। স্বদেশে ফেরার পথে কালু ডোম, তার স্ত্রী লখ্যা ও তাদের পুত্র ও অনুচরাদি নিয়ে তের জন ডোমকে সঙ্গে করে দেশে পৌঁছলেন।

মহামদ লাউসেনের অমঙ্গল কামনায় গৌড়েশ্বরকে পরামর্শ দিলেন লাউসেনকে পাঠিয়ে কামরূপ-রাজকে দমন করে রাজকর আদায় করে আনতে। গৌড়েশ্বরের আদেশে লাউসেন কালু ডোম ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে কামরূপ যাত্রা করেন এবং গৌড়েশ্বরের মাতার কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্রপূত জপমালা ও জয়-কাটারির সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র নদের জল শুকিয়ে কামরূপ পৌঁছান ও সেখানে বিজয়ী হয়ে রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করেন। যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের প্রাণদান করে লাউসেন দেশে ফেরার পথে মঙ্গলকোটের (কোগ্রাম?) রাজা গজপতির কন্যা অমলার এবং বর্দ্ধমানের রাজা কালিদাসের কন্যা বিমলার পাণিগ্রহণ করলেন।

গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ বয়সে সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার রূপ যৌবনে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে বিবাহ করার জন্য ঘটক পাঠালেন। রাজা হরিপালের অসম্মতি ছিল না। কিন্তু কানড়া ঘটককে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর ন'লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিমুলায় অভিযান করলেন। কানড়া ও তাঁর দাসী ধুমসী দেবীর ভক্ত। দেবী একটি লোহার গণ্ডার তৈরী করে

দিলেন। কানড়া পণ করলেন যিনি এক আঘাতে এই গণ্ডারের মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারবেন কানড়া তাঁকেই স্বামীত্বে বরণ করবেন। গৌড়েশ্বর ও মহামদ শত চেষ্টাতেও অকৃতকার্য্য হয়ে হাস্যাস্পদ হ'লেন। তখন মহামদের যুক্তিতে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ডেকে পাঠালেন। লাউসেন এসে অনায়াসে কৃতকার্য্য হলে কানড়া তাঁকেই বিবাহ করতে চাইলেন। গৌড়েশ্বর এজন্য লাউসেনের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। এই সংকটে লাউসেন কানড়ার সঙ্গে এই সর্ত্তে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, তিনি যদি কানড়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন তবেই কানড়াকে বিবাহ করবেন। পার্ব্বতীর ছলনায় লাউসেন কানড়ার কাছে পরাজিত হয়ে তাঁকে বিবাহ করে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

কিছুতেই লাউসেনের অমঙ্গল সাধন করতে সক্ষম না হয়ে মহামদ গৌড়েশ্বরের দ্বারা লাউসেনকে আদেশ দেওয়ালেন ঢেকুরের বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষকে দমন করতে। লাউসেন কালু ও সৈন্যগণসহ অজয় নদের তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে ইছাইয়ের সেনাপতি লোহাটা সর্দ্দারকে বধ করে তার ছিন্নমুণ্ড গৌড়েশ্বরের কাছে প্রেরণ করলেন। মহামদ এই মুণ্ডটিকে কৌশলে লাউসেনের মুণ্ডের মত সাজিয়ে ময়নাগড়ে পাঠালেন। কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী পুত্রশোকে অধীর হলেন। রাজ্যে হাহাকার উঠল। লাউসেনের চারজন স্ত্রী চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ চিলের রূপ ধরে মুণ্ডটি নিয়ে গেলেন এবং প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করে সকলকে আশ্বস্ত করলেন।

এদিকে লাউসেন যেমন ধর্ম্মরাজের আশ্রিত, ইছাই ঘোষ তেমনি পার্ব্বতীর অনুগৃহীত। লাউসেন যতবার ইছাইয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করেন পার্ব্বতীর অনুগ্রহে মুণ্ড ততবার জোড়া লাগে আর ইছাই নূতন উদ্যমে যুদ্ধ করেন। দেবতারা মন্ত্রণা করে দেবীকে শিবের কাছে নিয়ে গেলেন এবং এই সুযোগে লাউসেন ইছাইকে বধ করলেন। বিষ্ণু ইছাইয়ের ছিন্ন-মুণ্ডকে মুক্তি দিলেন। দেবী ফিরে এসে ইছাইকে আর বাঁচাতে পারলেন না।

গৌড়েশ্বর মহামদের পরামর্শে ধর্ম্মপূজার বিরাট আয়োজন করেন। ধর্ম্মঠাকুর এই ভক্তিহীনভাবে পূজোয় অসন্তুষ্ট হয়ে গৌড়ে প্রবল ঝড় ও জল-প্লাবন সৃষ্টি করলেন। পাপ দূর করার জন্য লাউসেনকে ডেকে বলা হল পশ্চিমদিকে সূর্য্য উদয় করাতে। লাউসেন হাকন্দ নামক স্থানে গিয়ে ধর্ম্মরাজের জন্য কঠোর তপস্যা সুরু করেন। এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ ময়নাগড আক্রমণ করলেন। কালুর স্ত্রী লখাই

ডোমনী একা মহামদের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের অজয় নদের অপর তীরে বিতাড়িত করে। কালু ডোম সত্য রক্ষার জন্য বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ দেয়। কলিঙ্গাও এই যুদ্ধে হত হলেন। কানড়া ও তাঁর দাসী ধুমসী পার্ব্বতীর অনুগ্রহে মহামদকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করেন এবং মুখে চুনকালি দিয়ে তাড়িয়ে দেন। ধর্ম্মের কৃপায় কলিঙ্গা, কালু প্রভৃতি সকলে পুনর্জ্জীবন লাভ করেন।

লাউসেনের তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মরাজ অমাবস্যার রাত্রে পশ্চিমে সূর্য্য উদিত করেন। এই দৃশ্যের সাক্ষী হরিহর বাইতি নামে এক ব্যক্তিকে মহামদ উৎকোচে বশীভূত করে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হরিহর যথার্থ সাক্ষ্য দিয়ে পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের কথা প্রমাণ করেন। লাউসেন বহু সম্মান লাভ করেন। মহামদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও দুষ্কর্ম্মের জন্য ধর্ম্মরাজের অসন্তোষে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ হয়। লাউসেন ধর্ম্মের কৃপায় তাঁকে রোগমুক্ত করলেও তাঁর মুখে একটি চিহ্ন থেকেই যায়।

লাউসেন মর্ত্ত্যে ধর্ম্মরাজের পূজা প্রচার করে স্বর্গে ফিরে গেলেন। তাঁর পুত্র চিত্রসেন ময়নাগড়ে রাজা হলেন।

## ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ

### ময়ূরভট্ট, রূপরাম ও খেলারাম

প্রাচীনতম ধর্ম্ম-সাহিত্যে মার্কণ্ড মুনির কথা ও হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী দেখা যায়। ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত লাউসেনের কাহিনীটির আদি রচয়িতা কে? পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল-কারেরা ময়ূরভট্টকে এই কাহিনীর আদি রচক বলে উল্লেখ ও বন্দনা করেছেন। ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সম্ভবত তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁর কাব্যের নাম ছিল 'হাকন্দ-পুরাণ'। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের দ্বারা পূজিত ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কাব্য রচনায় বোধকরি দ্বিজ ময়ূরভট্টই ব্রাহ্মণ হ'য়েও সর্ব্বপ্রথম লেখনী চালনা করেন।

মাণিকরাম গাঙ্গুলি তাঁর ধর্ম্মমঙ্গলে ময়ূরভট্টের সঙ্গে রূপরাম নামে আর একজন কবির বন্দনা করেছেন,—

> "বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
> দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্মগুণগান॥"

রূপরামের কাল সঠিক জানা যায়নি। গ্রন্থরচনার কাল সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাতে (লিপিকর-প্রমাদ থাকা সম্ভব) জটিলতা বেড়েই গেছে। পণ্ডিতগণের মধ্যেও যথেষ্ট মতদ্বৈধতা আছে এবং একজনের সঙ্গে অপরের অনুমানের মধ্যে প্রায় আড়াই শ' তিনশ' বছরের ব্যবধান দেখা যায়। কারও মতে রূপরাম পঞ্চদশ, কারও ধারণায় ষোড়শ অথবা সপ্তদশ আবার কারও অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। এহেন অবস্থায় যথার্থ কাল নির্দ্ধারণ এক রকম অসম্ভব।

রূপরামের কাব্য-গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানেই পাওয়া গেছে। ময়ূর-ভট্টের কাব্যই তাঁর আদর্শ ছিল। রূপরাম বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অধীন কাইতি-শ্রীরামপুর নিবাসী এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন। কবির মাতার নাম দময়ন্তী। তাঁরা চার ভাই ছিলেন। রূপরামের গানের দল ছিল। তাঁর কাব্যের স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। রচনার মধ্যে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি ও বড় বড় শব্দ ব্যবহার করায় রস ব্যাহত হয়েছে। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছেন, "শব্দ শুনে স্তব্ধ হবে, গান শুনবে কি।"

খেলারাম নামে আর একজন কবির অসম্পূর্ণ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গেছে। ইনি রূপরামের পরবর্ত্তী (?)। কবির আত্মপরিচয় অংশটি পাওয়া যায়নি। ৺হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের কাছে খেলারামের একটি খণ্ডিত পুঁথি ছিল, তাতে নিম্নোদ্ধৃত পয়ারটি পাওয়া গেছে,--

"ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ॥"

অর্থাৎ ১৪৪৯ শকাব্দে (১৫২৭ খৃষ্টাব্দে) কার্ত্তিক মাসে খেলারাম কাব্য রচনা আরম্ভ করেন।

## ঘনরাম চক্রবর্ত্তী

ঘনরাম ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বর্দ্ধমান জেলার কৈয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির নিবাস ছিল। কবির প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়, পিতার নাম গৌরীকান্ত এবং মাতার নাম সীতাদেবী। কবির মাতামহ রায়না গ্রাম নিবাসী দ্বিজ গঙ্গাহরি কৌকুসারী গোত্রীয় এবং কুশধ্বজ-রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন। ঘনরাম সম্ভবত ১৬৬৯

খ্রীষ্টাব্দে পৌষন্বান্ গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রামপুরের প্রসিদ্ধ টোলে তাঁর বিদ্যাভ্যাস হয়। অল্প বয়সেই কবিত্বশক্তির জন্য তাঁর শিক্ষাগুরু তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়া তাঁর রচিত একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও পাওয়া যায়।

পূর্ব্বগামী বহু কবির রচনা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৩৩ শকাব্দে) সুবৃহৎ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা শেষ করেন। ঘনরাম সম্ভবত বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কবির ভণিতায় দেখা যায়,—

"অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রসগান॥"

অথবা,

"রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥"

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে এবং মোট ৯১৪৭ শ্লোকে রচিত। কবি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি আকৃষ্ট হন। পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দু'য়েরই সমাবেশ তাঁর কাব্যে হয়েছে। এদিক দিয়ে তাঁকে পরবর্ত্তীকালের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। ঘনরামের কাছে ভারতচন্দ্রের ঋণও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ঘনরামের কাহিনী মৌলিকতা বর্জ্জিত এবং শাস্ত্রের অত্যধিক উদাহরণে ভারাক্রান্ত। যে সমাজের পাঠক ও শ্রোতার জন্য এ কাব্য রচিত হয়েছিল এর মধ্য দিয়ে আমরা তাদের রুচির পরিচয় পাই। এই কাব্যের নায়ক সর্ব্বগুণ যুক্ত এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লাউসেনের চরিত্র বিকশিত করার জন্য কবি রাশি রাশি উপকরণ জড়ো করেছেন কিন্তু বর্ণনা একঘেয়ে হয়ে পড়েছে এবং চরিত্রটিও সজীব হয়নি। বীরপ্রসবিনী রাণী রঞ্জাবতীকে পুত্রস্নেহাতুরা করে অঙ্কন করতে গিয়ে কবি এই চরিত্রটিকে খর্ব্ব করে ফেলেছেন। প্রকৃত রস সৃষ্টির জন্য কবি বহু শ্রম স্বীকার করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র আশানুরূপ সফল হয়নি,—অনেক স্থানে রসধারাও ব্যাহত হয়েছে।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য থেকে যুদ্ধ বর্ণনার সামান্য নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল,—

"মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী।
সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ,
দুদলে করে হানাহানি॥
রঙ্গিণী রণজয়ী দুন্দুভি বাজই,
ঘন ঘোর বাজাইয়া দামা।
রাজপুত মজবুত যৈছন যমদূত,
সমযূথ যুঝে খানসামা॥
দাদালিয়া দলবল মহীমাঝে মাতল,
মানব মহিমে দানদক্ষে।
ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দাসগণ,
ধমকে ধরাধর কম্পে॥
ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে শরগুলি বরিষে,
আকাশে একাকার ধূম।
দিশাহারা দিবসে হত কত হুতাশে,
গোলা বাজে দুড়ুম দুড়ুম॥
ঝাকতা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিঁকিছে হাঁকে হাঁকে,
লাখে লাখে বরিষে তীর।
সামালিয়া হানিতে গজবাজী সহিতে,
সমরে শিফায়ের শির॥
করিয়া তর্জ্জন ঘোরতর গর্জ্জন,
দুর্জ্জন দানাগণ সর্পে।
সমরে সেনাগণ সংহারে যৈছন,
ক্ষুধিত সর্পে॥"

এই ধরনের প্রাণহীন রচনায় ভারতচন্দ্রের যুগের পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় এবং পাঠক বা শ্রোতার মনে কোন গভীর রসের সঞ্চার করতে সমর্থ হয় না। বীররসের নমুনা দেখা গেল। করুণরস সৃষ্টিতেও কবি এর চেয়ে খুব বেশী লিপি-নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হননি। অবশ্য ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে করুণরস

সৃষ্টির অবকাশও বেশী নেই। ঘনরামের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল হলেও মাঝে মাঝে অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি হয়েছে। উৎকৃষ্ট অনুপ্রাসও অপ্রতুল নয়। যেমন,—

'রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি।
রামরাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি॥"

অথবা,

"বিপক্ষ দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।
কুলকুল কুরব কমল কানে কান॥"

নানা ত্রুটি সত্ত্বেও ঘনরামের কাব্যে এমন অনেক কিছু আছে যা অপর কোন কবির রচিত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে নেই। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের জ্ঞান-ভান্ডারে সঞ্চিত অনেক উপকরণ সংগ্রহ করে তিনি তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যমন্ডিত করেছেন। কবির রুচি মার্জ্জিত ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তি গভীর। প্রধান চরিত্র লাউসেন;—এই আদর্শ চরিত্রটি অলৌকিক রশ্মির প্রখরতায় এবং দৈবানুগৃহীতার প্রবল চাপে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফুটে উঠতে পরেনি। কিন্তু ছোট ছোট চরিত্রগুলি বেশ সজীব হয়েছে। এগুলি যেন কবি স্বয়ং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে চিত্রিত করেছেন। কর্পূরসেনের চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লাউসেন জামতি নগরে বন্দী হলে ভীরু কর্পূর তখন চিরদিনের অভ্যাসমত চাণক্য-নীতি অনুসরণে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে। পরে লাউসেন মুক্ত হলে বাক্‌সর্ব্বস্ব কর্পূর অগ্রজের গললগ্ন হয়ে অম্লান বদনে মিথ্যার জাল বুনে গেল,—

"কাঁদিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা।
কালি কোথা ছিলে ভাই হায় কিবা দশা॥
কর্পূর বলেন যবে বন্দী হলে ভাই।
রাতারাতি গৌড় গেছিনু ধাওয়া ধাই॥
রাজার আদ্দাশ করি জামতি লুঠিতে।
লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে॥
পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই।
লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই॥"

বীররসাত্মক কাব্যে বাহুবলে অমিত লাউসেনের চরিত্রটিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য এই কর্পূর চরিত্রটির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কালু ডোমের উপেক্ষিতা পত্নী সনকার চরিত্রও সামান্য দু'একটি রেখাপাতেই বেশ বাস্তব হয়ে উঠেছে।

বাঙ্গালী বীরাঙ্গনাদের চরিত্র সৃষ্টিতে কবি বাঙ্গলাদেশের লুপ্ত ইতিহাসের এমন কয়েকটি বিস্মৃতি-মলিন আলেখ্যের উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন যা সত্যই অপূর্ব্ব। ঘনরামকে এদিক দিয়ে চিত্রকুশলী কবি বলা যায়। লাউসেনের স্ত্রী কলিঙ্গা রণক্ষেত্র হতে আহত অবস্থায় ফিরে এসে দুর্গদ্বারে প্রাণত্যাগ করলেন। কানড়া যোদ্ধৃবেশিনী সপত্নী কলিঙ্গার শব বক্ষে নিয়ে শোকমগ্না। সেই সম দাসী দুর্ম্মুখা এসে উপস্থিত।

"এলা'ল কবরী কেশ ধূলায় লুটায়।
মুখানি মুছায়ে দাসী দুর্ম্মুখা পেতায়॥
কেঁদনা সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথা কারে প্রাণ দিল কেঁদে॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে॥"

কানড়া শোক পরিত্যাগ করে যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহণে শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হলেন।......লখা ডোমনীর পুত্র শাকা মাতার আদেশে ও স্ত্রী ভর্ৎসনায় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে সমরানলে আত্মাহুতি দিয়েছে। ছোট ভাই শুকা জননীর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ পেয়ে তাঁরই আদেশে রণসাজে সজ্জিত হতে হতে বলে,—

"শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।
শত্রুত সংহারি রণে ভাই কোথা পাব॥
যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন শেল বুকেতে বাজিল বজ্রাঘাত॥
এত বলি কাঁদে শুকা, লখা দেয় বোধ।
শোক তেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ॥"

এই অংশগুলি পড়তে পড়তে অতীতকালের চিত্রগুলি অপরূপ সুষমা মণ্ডিত হয়ে আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্টতর হতে থাকে। এগুলি যেমন তীব্র তেমনি আবেগময়। ক্ষণিকের জন্য আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটে। আমরা ভুলে যাই হিসাব নিকাশে ভরা বর্ত্তমানের এই 'বণিক-ধর্ম্মী' সমাজকে। আমরা ভুলে যাই যে, বাঙ্গালীর কখনও ভীরু কাপুরুষ অপবাদ রটে ছিল। ভুলে যাই, বঙ্গনারীর জীবন 'হাতা-বেড়ি-খুন্তির' মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। কালের কৃষ্ণ-যবনিকার অন্তরালে আমরা এমন এক গৌরবময় যুগের সম্মুখীন হই যে-যুগে

আমাদের দেশে শৌর্য্য ছিল, পরাক্রম ছিল, দেশাত্মবোধ ছিল;—যে সময়ে শুধু 'কোন মতে দুটি অন্ন খুঁটি' 'কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ' ধারণের গ্লানিময় চেষ্টাতেই মানুষের সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অধ্যবসায় নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। ভাবতে ভাল লাগে, এ-ও একদিন সত্য ছিল। মঙ্গলকাব্যের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ও বিধি নিষেধের মধ্যে, সত্যের উপর ভিত্তি করে, ঘনরাম বিচিত্র বর্ণসমাবেশে কল্পনার যে ইন্দ্রজাল রচনা করেছেন সে কথা স্মরণ করলে কবির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে পারা যায় না।

## মাণিকরাম গাঙ্গুলি

মাণিক গাঙ্গুলি ধর্ম্মমঙ্গলের একজন প্রসিদ্ধ কবি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে তাঁর কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ সমাপ্তির হেঁয়ালীপূর্ণ যে পদটি পাওয়া যায় তার অর্থ নিয়ে যথেষ্ট গোলযোগ হয়েছে। হয় কোন সঙ্গত অর্থ কেউ করতে পারেননি অথবা পদটিতে লিপিকর-প্রমাদ রয়েছে।

"শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
শর্ব্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত॥"

এ থেকে ডক্টর ৺দীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্, মহাশয় মাণিকরামের গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্ণয় করেছেন, ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ; রায় বাহাদুর শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় স্থির করেছেন, (১৭০৩ শকাব্দ) ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ। এই গণনার সঙ্গে মাস বার তিথি নক্ষত্র সমস্ত মিলে যায়। কবির বংশলতিকার সাহায্যে বিচার করলেও অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগই মনে হয়। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয় এই সিদ্ধান্তের অনুকূল মত দিয়েছেন। অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম্-এ, বি-এল, ডিপ্লো, ফোন্ (প্যারিস), ডি. লিট্ (প্যারিস), মহাশয়ের অনুমান যে, মাণিকরাম ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, মহাশয়ের মতে গ্রন্থ সমাপ্তির কাল ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই শেষোক্ত অভিমত দুটির মধ্যে অনেকটা ঐক্য আছে। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু-

পুরের মদনমোহন বিগ্রহের মন্দিরের উল্লেখ আছে। তিনি ঘনরামের কাব্যের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। তাই চরম সিদ্ধান্ত না হলেও—কোন বাধা না থাকায়—আমরা মাণিক গাঙ্গুলিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি বলে গ্রহণ করছি।

মাণিকরামের জন্মস্থান হুগ্লী জেলার আরামবাগ মহকুমার অধীন বেলডিহা গ্রাম। তাঁর পিতার নাম গদাধর, মাতার নাম কাত্যায়নী, পত্নীর নাম শৈব্যা। কবির আরও পাঁচজন কনিষ্ঠ সহোদর ও এক ভগিনী ছিলেন। সে যুগে সমাজের নিম্ন ও অন্ত্যজ শ্রেণীর দ্বারা পূজিত ধর্ম্মঠাকুরের অর্চ্চনা বা তাঁর উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা বর্ণহিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল এবং এজন্য হয়ত সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করতে হত। কাব্য রচনার জন্য স্বপ্নে প্রত্যাদেশ লাভ করেও সামাজিক প্রতিষ্ঠা হানির আশঙ্কায় কুলীন ব্রাহ্মণ কবি দেবতাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছিলেন, "জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।"

অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় মাণিক গাঙ্গুলির কাব্যও বার দিনের বারমতি বা চৌব্বিশ পালায় বিভক্ত। প্রথম পালাটিতে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, ধর্ম্মরাজের বন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি এবং অবশিষ্ট তেইশটি পালায় লাউসেনের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

মাণিকরামের যেমন গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তেমনি ছিল তাঁর কবিত্ব শক্তি। ধর্ম্মমঙ্গল বীররসাত্মক কাব্য। এই বীররস সৃষ্টিতে ও লখ্যা ডোমনীর চরিত্র চিত্রণে কবি অনন্যসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। রচনায় মাঝে মাঝে উৎকট অনুপ্রাস থাকলেও কাব্যে বেশ সরসতা আছে। আদিরসাত্মক বর্ণনা ও কৃষ্ণভক্তির কথা এই কাব্যে প্রচুর দেখা যায়।

আলোচিত কবিগণ ছাড়া গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম নারায়ণ, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ), সহদেব চক্রবর্ত্তী (১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ), নরসিংহ বসু (১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ), প্রভুরাম, দ্বিজ ভগীরথ, দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, সীতারাম দাস (১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ), রামদাস আদক, দ্বিজ রামচন্দ্র, সেন পণ্ডিত, বলদেব চক্রবর্ত্তী, হৃদয়রাম সাউ, শ্যাম পণ্ডিত (ইনি ইছাই ঘোষকে ঈশ্বর ঘোষ ও ঢেকুরগড়কে ত্রিহট্টগড় বলে উল্লেখ করেছেন) প্রভৃতি কয়েকজন কবির রচিত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গেছে।

# অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগে লৌকিক পৌরাণিক ও স্থানীয় দেবদেবীকে নিয়ে বহু মঙ্গল-কাব্য রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল প্রধান আসন দাবী করে। এই তিনটি কাব্য এ দেশের লৌকিক দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য প্রাচীন লৌকিক কাহিনীকে ভিত্তি করে এক এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়েছিল। প্রতিভাবান কবিগণ এই ধারা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করতে যত্নবান হয়েছেন। পরবর্ত্তীকালে এই ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে সাহিত্য-সাধনা একটি বিশেষ রীতি হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে আমরা আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আরও পরবর্ত্তীকালে মঙ্গলকাব্যের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ গৌণ হয়ে পড়তে থাকে। তখন ছোট বড়, প্রধান অপ্রধান বহু দেবদেবীকে নিয়ে অসংখ্য কবি কাব্য রচনা করেন এবং মঙ্গলকাব্যের প্রচার ও সমাদর দেখে এগুলিকেও মঙ্গলকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত করে তোলার চেষ্টা করেন।

সে যুগে ধর্ম্ম বা দেবতাকে বাদ দিয়ে নিছক মানবীয় কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনার কথা হিন্দুরা ভাবতে পারেন নি। হয়ত তা করলে সাধারণের কাছে কাব্যের সমাদরের আশা ছিল না। মুদ্রাযন্ত্র ছিল না; পুঁথি রচক বা গায়েনেরা কোন দেবস্থানে বা আসরে বসে দেবমাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য পাঠ করতেন সকল শ্রেণীর শ্রোতার জন্য। অর্থ ব্যয় করে সাধারণ মর্ত্ত্যবাসী মানবের কাহিনী শোনা সে যুগে লোকে অর্থ ও সময়ের অপব্যবহার মনে করতেন। হয়ত নীতি-বিগর্হিতও মনে করতেন। নিরুপায় হয়ে কাব্য রচকদের তাই দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার ছলে দেবানুগৃহীত নায়কনায়িকার প্রাচীন কাহিনীকে যতটা সম্ভব যুগোপযোগী করে শুনিয়ে শ্রোতাদের অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের আশা দিয়ে নিজেদের জন্য অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করতে হ'ত। অধিকাংশ অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের রচনা হয়েছে এই ভাবে।

কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, বাসুলিমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, রায়মঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যগুলি অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত। আমরা এখানে শুধু কালিকামঙ্গল সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। বাকিগুলি

কাব্যগুণ বিবর্জ্জিত এবং অনেক পরবর্ত্তীকালে মঙ্গলকাব্যের অন্ধ অনুকরণে রচিত। এই শেষোক্ত অর্ব্বাচীন মঙ্গলকাব্যগুলি ছাড়া মধ্যযুগে বহু দেবতাকে নিয়ে অসংখ্য ব্রতকথা ও পাঁচালী রচিত হয়েছিল। তাছাড়া সৃষ্টি হয়েছিল ডাক ও খনার বচনগুলি। এগুলি প্রাক্-তুর্কী আমল থেকে মুখে মুখে সংগৃহীত প্রবাদ বাক্য। স্ত্রী-সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সমস্তগুলির জন্ম এবং তাঁদেরই মধ্যে আজও এগুলি বেঁচে আছে।

# কালিকামঙ্গল

## (বিদ্যাসুন্দর কাব্য)

বিদ্যাসুন্দর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম মানবীয় প্রণয়কাহিনী কাব্য। বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিকে জোর জবরদস্তি করে কালিকামঙ্গলের পর্য্যায়-ভুক্ত করা হয়েছে। এই কাব্যে মূলত কামপরায়ণ বিলাসলীলাপূর্ণ যথার্থ মানবীয় প্রণয়কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। শুধু শেষাংশে দুর্গতি মোচনের জন্য এই কাব্যের নায়ক সুন্দরকে দিয়ে কালীর কীর্ত্তন করান হয়েছে। বিদ্যা-সুন্দর ছাড়া আরো দু'তিন খানি বিকৃত রুচির কাব্যে কালী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখা যায়। আদিরসের ছড়াছড়ির জন্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিকে ও এই শ্রেণীর অপরাপর ক্ষুদ্র কাব্যগুলিকে বোধহয় পরবর্ত্তীকালে তুলসী-বিল্বপত্রে শোধন করে এগুলিতে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করার প্রয়োজন হয়েছিল। "কালী-নামের সঙ্গে সংস্রব হেতু আমাদিগের বৃদ্ধগণ এই সব পুস্তকের শৃঙ্গাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব দেখিয়াছেন, এবং প্রণিপাতপুরঃসর নিষ্কাম ধর্ম্মপিপাসার সহিত উপাখ্যানভাগ পাঠ করিয়াছেন। দেব-দেবীগণ যখন এই ভাবে কদর্য্য-রুচির আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

খর্পরধারিণী নগ্নিকা কালীর আকৃতি ও প্রকৃতি তাঁর কুল-পরিচয় স্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করে। তাঁর উদ্ভব হয়েছে প্রাক্-আর্য্য আদিবাসী সমাজে। পরে তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের মাধ্যমে পৌরাণিক সাহিত্যে একাধারে ধ্বংস ও সৃষ্টি, ভয় ও বরাভয়ের প্রতীকরূপে প্রবেশ লাভ করতে সমর্থ হন। তিনি কোথাও কোথাও চন্ডীর সঙ্গে অভিন্না বলে বর্ণিত হলেও চন্ডীর সঙ্গে তাঁর চেহারা ও স্বভাবের বৈষম্য সুস্পষ্ট। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সময় শক্তি-দেবতার রূপভেদ এই কালিকাদেবী আদিবাসী সমাজ থেকে তৎকালীন শৈব প্রভাবান্বিত বর্ণহিন্দুর সমাজে মহাকাল ভৈরব শিবের স্ত্রী পরিচয়ে প্রবেশ করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে রচিত দেবীপুরাণে বামাচারী শাক্ত মতে দেবী পূজার কথা বলা হয়েছে। গুপ্তোত্তর যুগে মধ্য-

ভারতে রচিত জয়দ্রথ-যামল পুস্তকে রক্ষা-কালী, ঈশান-কালী, প্রজ্ঞা-কালী, বীর্য্য-কালী প্রভৃতি কালীর নানা ভাব-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ও সাধন প্রক্রিয়ার কথা আছে। তক্ষণ শিল্পে কালীর প্রাচীনতম রূপ দেখা যায়, আনুমানিক খ্রীষ্টোত্তর অষ্টম শতকে (চালুক্য-রাষ্ট্রকূট যুগে) উৎকীর্ণ, হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত বিখ্যাত ইলোরা গুহায়। এখানে শবদেহ ভূষিতা কংকালসার কালী-মূর্ত্তির নিম্নে শিব, দক্ষিণে গণেশ ও বামে দুটি দেবীমূর্ত্তি দেখা যায়। এই শেষোক্তা দেবী মূর্ত্তি দুটির একটি পদ্মাসীনা এবং অপরটি সিংহারূঢ়া।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে সঠিক জানা যায় না। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের বিক্রমাংকদেব-চরিত রচয়িতা বিখ্যাত কবি বিল্‌হন্‌ সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাশটি শ্লোকে "চৌর-পঞ্চাশিকা" নামে একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। বিল্‌হনের এই বহুল প্রচলিত খণ্ড কাব্যটিকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল মনে করে থাকেন। চৌর-পঞ্চাশিকার আখ্যানটি নাকি বাংগলাদেশে এসে এদেশে প্রচলিত কোন গুপ্ত প্রণয়কাহিনীর সংগে মিশে গিয়ে বিদ্যাসুন্দর নামে এক স্বতন্ত্র কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য এ কথা জোর করে বলা শক্ত। কারণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বিভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল। ফারসী ও নেপালী ভাষাতেও বিদ্যাসুন্দরের অনুরূপ উপাখ্যান আছে। বাংগলা দেশের কাহিনীতে কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। এক মুসলমান সারিবিদ খান (সপ্তদশ শতাব্দী) ছাড়া বিদ্যাসুন্দরের সকল কবিই ছিলেন হিন্দু। তাই এই মানবীয় প্রণয় ঘটিত ব্যাপারেও চিরাচরিত সংস্কার বশে দেবী-মাহাত্ম্য ঢোকান হয়েছে জোর করে।

## বিদ্যাসুন্দরের কবিগণ

বাংগলাদেশে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি কবি হলেন 'দ্বিজ' শ্রীধর কবিরাজ। ইনি গৌড়ের সুলতান নুসরৎ শাহের পুত্র শাহজাদা ফীরুজের মনোরঞ্জনের জন্য বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। তারপর বোধহয় ময়মনসিংহের অধিবাসী কবি কংকের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নাম করা যায়। কংক জনৈক পীরের আদেশে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। ময়মনসিংহ-গীতিকারূপ পল্লীগাথার কংক একজন নায়ক। কংকের বিদ্যাসুন্দর অশ্লীলতা বর্জ্জিত। রচনাও সরল। এর পর

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে (?) রচিত চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম (বর্ত্তমান আনোয়ারা গ্রাম) নিবাসী কবি গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দর পাওয়া যায়। এই কাব্যের কাহিনীভাগে বর্ণিত স্থান ও কতক-গুলি চরিত্রের নামে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। এই কাব্যে গোরক্ষনাথ ও তাঁর গুরু মীননাথকে মহাকালীর সাধক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাব্যটিতে কালীমাহাত্ম্য জ্ঞাপন করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তারপর পাওয়া যায় নিমতা গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণরাম দাস (সপ্তদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক) এবং কবিশেখর বলরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত কালিকামঙ্গল। এই কাব্যগুলিতে শীলতা রক্ষিত হয়েছে এবং দেখা যায় শক্তি দেবতা কালীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে মঙ্গলকাব্য রচনাই গ্রন্থকারদের প্রধান উদ্দেশ্য,—বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় কাহিনী গৌণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য পাওয়া যায়। এঁদের উভয়ের কাব্যেই শৃঙ্গার-রসাত্মক গুপ্ত প্রণয় কাহিনীই প্রধান, দেবতা উপলক্ষ্য মাত্র।

### রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র

রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন' এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর 'অন্নদামঙ্গল'-এর মধ্যে গ্রথিত। রামপ্রসাদের কাব্যে রচনাকাল দেওয়া না থাকায় সঠিক জানা সম্ভব হয়না তিনি অথবা ভারতচন্দ্র কে আগে এই কাব্য রচনা করেছিলেন। তবে সম্ভবত রামপ্রসাদই পূর্ব্ববর্ত্তী এবং এই কাব্য তাঁর প্রথম বয়সের রচনা। এই কাব্যে কবি যুগপ্রভাবে তরলরুচি ও দেহগত বিলাসের যেরূপ অহেতুক বাড়াবাড়ি করেছেন তাকে পরবর্ত্তীকালে তাঁর অন্যান্য রচনার গভীর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তুলনা করলেও এই সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এই কাব্যে কবি কোন বিশেষ মৌলিকতা দেখাতে পারেন নি। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে বিদ্যাসুন্দরে নয়,—তন্ত্র ও বেদান্তের সমবায়ে গঠিত, গ্রাম্য ভাষা ও উপমায় প্রকাশিত আবেগ-প্রধান খন্ড গীতি কবিতাগুলির মধ্যে। এই শাক্তপদাবলীর তিনিই আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি। কালীকীর্ত্তন বা শ্যামা-সঙ্গীতে তিনি লিখেছেন,—

"তুই যা রে, কি করবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মন-বেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি॥"

* * *

"আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি।"

* * *

"ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাই জান না।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা॥"

* * *

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবাসি॥"

* * *

"মনরে, কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত' সোনা॥"

সাধক রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চোব্বিশ পরগণা জেলার হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহের নাম রামেশ্বর এবং পিতার নাম রামরাম সেন। রামরাম দু'বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নাম নিধিরাম্। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ এই দুই পুত্র এবং অম্বিকা ও ভবানী এই দুই কন্যার জন্ম হয়। কবির রামদুলাল ও রামমোহন নামে পুত্রদ্বয় এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর কবির আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হয়ে পড়ায় তিনি কোলকাতায় কোন ধনী ব্যক্তির মুহুরীর কাজ গ্রহণ করেন কিন্তু ভাবতন্ময়তা বশত হিসাবের খাতায় মাঝে মাঝে আবেগপূর্ণ কালী নামাত্মক পদ রচনা করতে থাকেন। তাঁর মনিব হিসাব পরীক্ষাকালে এই আধ্যাত্মিক পদগুলি পাঠ করে চমৎকৃত হন এবং আজীবন মাসিক তিরিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাঁকে গৃহে প্রেরণ করেন। কবি অবশিষ্ট জীবন স্বগ্রামে পঞ্চমুণ্ডী সাধনপীঠে আধ্যাত্মিক সাধনায় এবং শ্যামা ও উমা সঙ্গীত রচনায় যাপন করেন। গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে সাদরে রাজসভায় নিয়ে যেতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু সংসার-বিবাগী কবি প্রকৃতির স্নেহাঞ্চল পরিত্যাগ করে রাজদরবারে যেতে অসম্মত হওয়ায় মহারাজ তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি এবং একশ' বিঘা নিষ্কর

ভূমি দান করেন। পলাশী যুদ্ধের এক বৎসর পরে এই দানপত্র সাক্ষরিত হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজপরিবারের অনেকেই এবং বাঙলার গৌরব মহারাজা নন্দকুমার রামপ্রসাদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে পদ রচনা করেছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের সভাকবি ও মন্ত্রগুরু সাধক কমলাকান্তও রামপ্রসাদের অনুগামী ছিলেন। শোনা যায়, বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা রামপ্রসাদকে গঙ্গাবক্ষে স্বীয় বজরায় পরম সমাদরে আহ্বান করে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে প্রচুর পুরস্কার দিতে চান। কিন্তু কবি সমস্তই প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিদ্যাসুন্দর রচনাকালে মাঝে মাঝে বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করলেও শক্তি উপাসক রামপ্রসাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন অনুদারতা ছিল না। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কালে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু রামপ্রসাদের হৃদয়ে শ্যাম ও শ্যামার সমন্বিত রূপ উজ্জ্বল আলোক-সম্পাত করেছে,—

"কালী, হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥"

ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের সমকালেই তাঁর প্রতিপালক 'সদাজ্যোৎস্নাময়' 'দুই পক্ষ'-সেবী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য, রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরাম দাসের কাব্য অবলম্বন করে, অপূর্ব্ব বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। এই মজলিসী কাব্যের ভাষা মার্জ্জিত, তীক্ষ্ণ ও ব্যঙ্গোজ্জ্বল। এটি একাধারে রোমান্স ও satire. কবির বিস্তৃত পরিচয় ও কাব্যের আলোচনা অন্নদামঙ্গল প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। ভারতচন্দ্রই কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠতম কবি। তাঁর এই কাব্যের মত এত অধিক প্রচার ও সমাদর বোধকরি মধ্যযুগের আর কোন কাব্যের ভাগ্যে ঘটেনি। "একমাত্র নীতির দিক বাদ দিলে সমগ্র মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে এই সৃষ্টির তুলনা হয়না। সমগ্র মঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য্য যুগের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।" (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)

## ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী

বর্দ্ধমান নগরে বীরসিংহ নামে এক নরপতি ছিলেন। বিদ্যা নামে তাঁর এক অপরূপ সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা ছিলেন। রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা ছিল যিনি তাঁকে বিচারে পরাস্ত করতে পারবেন তাঁকেই পতিত্বে বরণ করবেন। বহু দেশ দেশান্তর থেকে রাজপুত্ররা এসে বিচারে পরাস্ত হলেন দেখে রাজা একমাত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধু রায়ের সুন্দর নামে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রূপবান এক পুত্র আছে এ কথা শুনে তিনি কাঞ্চীরাজের কাছে ভাটের হাতে পত্র প্রেরণ করলেন।

সুকবি রাজকুমার সুন্দর ভাটের মুখে বিরলে বিদ্যার রূপগুণের কথা শুনে চমৎকৃত হ'য়ে গোপনে অশ্বারোহণে বর্দ্ধমান যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন রত্নভরা খুঙ্গি, পুঁথি ও শিক্ষিত প্রিয় শুকপক্ষীটি।

"কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥"

সেখানে নগর তোরণের দ্বার রক্ষীকে অশ্ব, অস্ত্র ও শিরোপা দিয়ে পদরজে নগরে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ নগরশোভা দেখে সরোবরে স্নানান্তর 'শিব-শিবা-চরণ' পূজা করে এক বকুল গাছের তলে উপবেশন করলেন। নাগরীগণ স্নান করতে সরোবরতীরে এসে সুন্দরের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে স্মরানলে দগ্ধ হতে লাগলেন।

"কহে এক জন লয় মোর মন
এ' নব রতন ভুবন-মাঝে।
বিরহে জ্বলিয়া সোহাগে গলিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে॥
আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদি জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥"

এইভাবে দিবা অবসান হয়ে এল।

"সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অভিরাম॥
গাল-ভরা গুয়া-পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি ক'ড়ে রাড়ী কথা কয় ছলে॥
চূড়া বান্ধা চুল, পরিধান সাদা সাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা-ফোঁটা তন্ত্র-মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেংগড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়॥"

এই হীরা মালিনী রাজবাড়ীতে রোজ ফুল জোগায়। মালিনীর সংগে সুন্দরের পরিচয় হ'ল। মালিনীর কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে বুঝে সুন্দর তাকে মাসী বলে সম্বোধন করে তার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

মালিনীর কাছে বিদ্যার রূপলাবণ্যের বিস্তৃত পরিচয় পেয়ে সুন্দর বিদ্যার সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য আরও অধীর হ'য়ে উঠলেন। হীরা রাজ-অন্তঃপুরে রোজ ফুল মালা প্রভৃতি নিয়ে যায়। একদিন সুন্দর রাজকন্যার জন্য নিজের হাতে একছড়া মনোহর মালা গেঁথে তাতে কৌশলে পুষ্পময় কামধনু ও শ্লোকে স্বীয় পরিচয় ও অভিলাষ ব্যক্ত করে মালিনীর হাতে প্রেরণ করলেন। বিদ্যা এই লিখন পেয়ে সুন্দরের প্রতি অনুরাগিণী হয়ে পত্র দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এরপর মালিনীর সাহায্যে দুজনে দূর থেকে পরস্পরকে দর্শন করে গভীর ভাবে আসক্ত ও মিলনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন।

অগণিত প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে রাজপ্রাসাদে বিদ্যার কক্ষে গিয়ে নিভৃত মিলনের বাসনায় সুন্দর কালিকার স্তব করলেন। ভগবতী প্রসন্না হ'য়ে সুন্দরকে সন্ধিমন্ত্র ও বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত একটি সিঁদকাঠি প্রদান করলেন।

এই মন্ত্রপূত সিঁদকাঠির সাহায্যে মালিনীর গৃহে সুন্দরের কক্ষ হতে রাজকন্যা বিদ্যার শয়নাগার পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ-পথ খনিত হ'ল। ওদিকে অধৈর্য্যা রাজকুমারী তখন সুন্দরের বিরহে দগ্ধ হয়ে সখীগণকে বলেন,—"চাঁদের মণ্ডল, বরিষে গরল, চন্দন আগুনকণা। * * ফুলের মালায়, সূচের জ্বালায়, তনু হৈল জর জর। মন্দ মন্দ বায়, যেন বজ্রঘায়, অঙ্গ কাঁপে থর থর॥ * * এ নীল কাপড়, হানিছে কামড়, যেমন কালসাপিনী।"...এহেন সময় সুন্দর মালিনীর অগোচরে সেই সুরঙ্গপথে বিদ্যার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। শাস্ত্র বিচারের ছলে রঙ্গ-কৌতুকে বিদ্যা পরাজয় স্বীকার করলেন। মকরকেতন বিজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝে পুষ্পধনুতে শর সন্ধান করলেন।

"বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥
নৃত্যকরে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায়॥
ধিক্ ধিক্ অধিক আছিল সখী তায়।
নিশ্বাস আতসবাজি উত্তাপে পলায়॥
নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
দুহাঁর কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন॥"

এইভাবে প্রত্যহ দিনে রাত্রে বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন হতে লাগল ও কালক্রমে বিদ্যা অন্তঃসত্ত্বা হলেন। শঙ্কিত হয়ে সখীগণ এই কথা রাণীকে জানাল'। রাণী বিদ্যাকে ভর্ৎসনা করে রাজাকে এই সংবাদ দিলেন। ক্রুদ্ধ নৃপতি প্রধান কোটালকে ডেকে এই চোরকে অবিলম্বে ধরার জন্য আদেশ দিলেন। কোটাল রাজকন্যার শয়নগৃহে অনুসন্ধান করে পালঙ্কের নীচে সুরঙ্গের গোপন পথটি আবিষ্কার করল। কোটালেরা পরামর্শ করে নাট্যশালা থেকে স্ত্রীবেশ সংগ্রহ করে রাত্রে বিদ্যা ও সখীগণের ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজকন্যার কক্ষে অবস্থান করল। আর বাইরে রইল কড়া পাহারা। এদিকে সুন্দর অন্যান্য দিনের মত নিঃশঙ্কচিত্তে সুরঙ্গপথে সেই ঘরে প্রবেশ করে

পালঙ্কের উপর বিদ্যাবেশিনী কোটাল চন্দ্রকেতুর মানভঞ্জনে ব্যাপৃত হলে কোটালেরা তাঁকে ধরে বন্ধন করল ও সেই সুরঙ্গ দিয়ে মালিনীর কুটীরে উপস্থিত হয়ে তাকে যথেষ্ট নিগ্রহ করল। পরদিন সুন্দরকে বন্দীবেশে রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। রাজা সুন্দরকে মশানে নিয়ে গিয়ে শিরচ্ছেদ করতে আদেশ দিলেন। মশানে সুন্দর কালিকার দ্ব্যর্থক (বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে) চৌত্রিশা স্তব করলেন। দেবী সুন্দরকে অভয় প্রধান করে তাঁর বন্ধন মোচন করে দিলেন। ডাকিনী যোগিনী ও ভূতপ্রেতগণ অদৃশ্যভাবে কোটাল ও সৈন্যদের বন্ধন করল।

ওদিকে রাজা ভাটের মুখে সুন্দরের পরিচয় পেয়ে স্বয়ং মশানে গিয়ে সুন্দরের সন্তোষ বিধান করলেন। রাজা সুন্দরের কথায় নানা উপচারে কালীর পূজা করে দেবীর দর্শন লাভ করলেন। কোটাল ও সৈন্যদের বন্ধন মোচন হল। রাজা সুন্দরকে সিংহাসনে বসিয়ে তার করে বিদ্যাকে সমর্পণ করলেন। কিছুকাল পরে বিদ্যা ও শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

কালিকার পূজা মর্ত্ত্যে প্রচার করে পুত্রকে রাজভোর দিয়ে বিদ্যা-সুন্দর যথা সময়ে দেবীর সঙ্গে কৈলাসে গমন করলেন।

# উমা-সংগীত

পুরাণে যেমন নারী-প্রকৃতির দুই রূপ কল্পনা করা হয়েছে,—সুর-সভাতলের নর্ত্তকী ঊর্ব্বশী এবং বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরী কমলার প্রতীকের মাধ্যমে,—তেমনিই মধ্যযুগের সাহিত্যেও নারীর দুটি রূপ দুটি বিপরীত দিকে চলে গেছে। একটি দয়িতের অভিসারে গেছে লোকালয়ের বাইরে, যমুনা-পুলিনে। এটি শ্রীরাধার রূপ। নিখিল প্রেমিক হৃদয়ের এই জীবন্ত বিগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'উজ্জ্বল-মধুর' রস। আর একটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গৃহস্থের আঙিনায়,—সেটি 'বাৎসল্য' রসের প্রতিমূর্ত্তি। বাঙালী মায়ের স্নেহাশ্রুধারায় অভিষিক্ত এই আলেখ্য গৌরীর বা উমার। প্রথম রূপটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে বিরাট্ 'বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য'। আর, দ্বিতীয়টিকে নিয়ে আরও পরবর্ত্তীকালে রচিত হয়েছে শাক্তদের 'উমা-সংগীত' অথবা আগমনী-বিজয়া গান। আয়তন ও ভাবের দিক দিয়ে এই উভয় ধারার মধ্যে একটা ঐক্য আছে। কিন্তু বৈষ্ণবকাব্য প্রথম থেকেই গীতি-কবিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শাক্তদের সাহিত্য তখন সৃজিত হ'ত দেব-দেবীর মাহাত্ম্যপূর্ণ বর্ণনা-প্রধান বড় বড় মঙ্গলকাব্যের আকারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতচন্দ্র যখন ঐশ্বর্য্যবিলাসের মাঝে নাগর-সমাজে আসর জমিয়ে কামোদ্দীপক মদিরা পরিবেশন করতে ব্যস্ত, সেই সময় ছায়ানিবিড় সুদূর পল্লীতে সংসার-অনাসক্ত সাধক রামপ্রসাদের কণ্ঠে, মঙ্গল-কাব্যের উপর বৈষ্ণব গীতি-কবিতার ভাবের প্রভাবে, সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় অনুভূতি ও আবেগ প্রধান শ্যামা ও উমা সংগীতগুলি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল। রামপ্রসাদের কবি-হৃদয় স্নেহ প্রেম মমতায় ভরা গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি গভীর সমবেদনায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। এইভাবে, চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করা শৈব-শাক্ত সাহিত্যের মাঝে, রামপ্রসাদ অকস্মাৎ একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করলেন। এই সংগীত প্রকৃত পক্ষে শৈব-শাক্ত সাহিত্যেরই একটি শাখা; নানা সংঘাত ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এর জন্ম। যুগধর্ম্মও বোধকরি এই গতি পরিবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করেছিল।

ধর্ম্মসাধনার প্রধান তিনটি পথ ঃ জ্ঞানমার্গ কর্ম্মমার্গ ও প্রেমমার্গ। বাঙ্গালী সাধক প্রথম দু'টি পথে চল্‌তে গিয়ে সে দু'টিকে গৌণ মনে করে ফিরে এসে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ও মুখ্যতম পথ—প্রেমের সাধনায় দ্রুত এগিয়ে গেছে। এই পথে মানুষই সবচেয়ে বড়, তার উপরে কিছু নেই। তারা বেদপন্থীদের স্বর্গ লাভের জন্য সকাম যাগযজ্ঞকে নিষ্ফল মনে করেছে। অন্তরের সখ্য, মৈত্রী ও প্রেমের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীকেই স্বর্গ করে তুল্‌তে চেয়েছে। নীরস বৈরাগ্যের প্রতিও তার চিত্ত কোনদিন আকৃষ্ট হয়নি। তার বৈরাগ্য—রূপ ও রস-সমৃদ্ধ বৈরাগ্য। বাঙ্গালী তাই কোনদিনই উপাস্য দেবতাকে দূর থেকে পূজা-অর্চ্চনা করেই তৃপ্ত থাকতে পারেনি; কর্ম্মকান্ড বহুল শাস্ত্রাশ্রিত জটিল সাধন পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ থেকে সার্থকতা খুঁজে পায়নি। শুষ্ক যুক্তি বিচারে তাদের ক্লান্তি এসেছে। তারা ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছেড়ে মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছে। তাই যুগে যুগে দেবতাকে ঘরের মানুষ করে বুকে টেনে নিয়েছে পরম আদরে। প্রেম ও আনন্দ সম্পর্কের মাঝে সেই চির-সুন্দরকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে,- মাতাপিতারূপে, সখারূপে, সন্তানরূপে, দয়িতরূপে। দেবতাকে ঘিরে নানাভাবে মনের আবেগ, বিশ্বাস ও ভাবতন্ময়তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে কাব্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে। স্নেহ ও প্রেমের সহস্র বন্ধনের মাঝেই বন্ধন-মুক্তির উপায় খুঁজে ফিরেছে। আত্মোপলব্ধি করতে চেয়েছে চরম আত্মনিবেদনে। এর নিদর্শন রয়েছে বৌদ্ধ সহজ সাধকদের চর্য্যাপদে, বৈষ্ণব-গীতিতে, শ্যামা ও উমা-সঙ্গীতে, আউল-বাউলের একতারায়, গেঁয়ো চাষী ও মাঝির উদাস করা মেঠো সুরে:—এমন কি, বর্ত্তমান যুগে উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথের সহস্রতন্ত্রী বীণায় সেই একই অখন্ড সুর দুর্ব্বার আবেগে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে, "মরণরূপে আসিলে সখা চরণে ধরি মরিব হে"।

মধ্যযুগের শেষ দিকে শৈব ও শাক্ত সাহিত্যের পরিণতি হয় গীতি-কবিতার অজস্র ধারায়। রামপ্রসাদ, তাঁর পরবর্ত্তী কবিগণ ও 'কবিওয়ালা'দের রচিত বোধকরি সাড়ে তিন হাজারেরও অধিক এই ধরনের গীতি-কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই জাতীয় করুণ ও মধুর অনবদ্য গীতিকাব্য একান্তভাবে বাঙ্গলার নিজস্ব। আর কোন সাহিত্যে উমা-সঙ্গীতের মত বাৎসল্যের এমন মর্ম্মস্পর্শী, স্নেহরসে উদ্বেলিত, মানবিকরসে অভিসিঞ্চিত রচনা বিরল। বৈষ্ণব-কাব্যে ক্ষণিক অদর্শন আশঙ্কা পীড়িতা স্নেহান্ধা

যশোদার দুরন্ত গোপালকে উপলক্ষ্য করে এমন গভীর যে বাৎসল্য রসের কবিতা,—

"আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
* * *
থাকিবে তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগয়ে গায়॥" (যাদবেন্দ্র)

তার চেয়েও বোধকির নিবিড়তর আবেদন—প্রত্যক্ষ বেদনা ও আকুলতার কান্না শুনতে পাওয়া যায় উমা-সঙ্গীতে।

গিরিরাণী মেনকার সযত্নে বিলাসের ক্রোড়ে লালিতা একমাত্র শিশুকন্যা উমার বিবাহ হয়েছে কুলীন পাত্র ভাঙগড় শিবের সঙ্গে—সতীনের ঘরে। শিব দরিদ্র ও অসংযত স্বভাব। অভাবের সংসারে অনেকগুলি সন্তান ও কয়েকটি পোষ্য। মেনকার দুঃখের ও দুশ্চিন্তার তাই অন্ত নেই। বৎসরান্তে তিনটি দিনের জন্য এই স্নেহের পুত্তলিকে কাছে পাবেন তারই দিন গণনা করে তাঁর সময় কাটে। স্বপ্নঘোরে মনে হয় উমা এসেছেন। অমনি ঘুম ভেঙে যায়, কন্যাকে কাছে না দেখে স্বামী হিমালয়কে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন,—

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতন কত না ঘুমাও হে॥
এই এখুনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে!"
(কমলাকান্ত)

তারপর অনুযোগ করেন,—

"আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন
আশাপথ রয়েছেন চেয়ে॥
আছে কন্যাসন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,
সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে।" (রামবসু)

মেনকার একান্ত অনুরোধে গিরিরাজ উমাকে বৎসরান্তে আনতে যাবেন; কন্যার সঙ্গে আসন্ন মিলনের আনন্দে মেনকা মাতৃহৃদয়ের দাবী নিয়ে জানান,--

"গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব' না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফেরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥"

(রামপ্রসাদ)

তারপর, উমা আসছেন পুরবাসিনীরা ছুটে গিয়ে গিরিরাণীকে এই সংবাদ দিলেন। তখন,—

"আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়।
যত নগর-নাগরী, সারি সারি সারি, দৌড়ি গৌরী মুখ পানে চায়॥
কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু বালক বক্ষে,
কার আধ শিরসি বেণী, কার আধ অলকা শ্রেণী;
বলে, চল চল চল, অচল-তনয়া হেরি ওমা, দৌড়ে আয়।
আসি নগরপ্রান্তভাগে, তনু পুলকিত অনুরাগে;
কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধরবারি;
তখন গৌরী কোলেকরি, গিরি-নারী প্রেমানন্দে তনু ভেসে যায়॥"

(কমলাকান্ত)

অথবা,—

"আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদমুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে॥

শুনিয়া এ শুভবাণী, এলোচুলে ধায় রাণী
বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে।
পুন কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে, জনক তোমার গিরি,
পতি জনম ভিখারী তোমা হেন সুকুমারী,
দিলাম দিগম্বরে॥" (রামপ্রসাদ)

উমার অভিমান হয়েছে,—

"* * দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কাঁদি রানীরে বলে,—
'কই মেয়ে বলে আন্‌তে গিয়েছিলে!
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপনা হতে।
গেলে নাকো নিতে,
র'বনা, যাব দুদিন গেলে'॥" (গদাধর)

বৎসরান্তে এই সন্তানকে বুকে পেয়ে অশুভ দারিদ্র্যের শঙ্কাই সবচেয়ে আগে স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ে জেগেছে,—

"ওমা, কেমন ক'রে হরের ঘরে
ছিলি উমা বল্‌ মা তাই।
কত লোকে কত বলে,
শুনে ভেবে মরে যাই॥
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষে করে,
এবার নিতে এলে ব'লবো হরে,—
উমা আমার ঘরে নাই।
চিতা-ভষ্ম মাখি অঙ্গে, জামাই ফিরে নানা রঙ্গে,
তুই নাকি মা তারি সঙ্গে,—
সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥" (গিরিশচন্দ্র)

আগমনীর তিনটি দিন দেখতে দেখতে কেটে যায়; মিলনাশ্রুর মাঝেই 'নবমীর কালনিশি' পোহায়। নির্ম্মম বিজয়ার বেদনাশ্রু জেগে ওঠে,—

"ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বারবার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ-প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হল বিদার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সুধার॥" (রামপ্রসাদ)

যে দেশের মায়েরা স্নেহের ধন কচি মেয়েদের অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য, সমাজ-সংসারের অমোঘ নিয়মে, পরের ঘরে পাঠাতে বাধ্য হতেন এ-গান সে দেশের বাস্তব চিত্র। মেনকা বাঙগালী মায়ের জীবন্ত আলেখ্য।

উমা-সঙগীত বাঙগলার সর্ব্বত্র প্রচারিত। দুর্গোৎসবের আগে ও পরে আজও অনেক ভিখারীর কণ্ঠে শোনা যায় এই আগমনী-বিজয়া গান।

রামপ্রসাদের পর অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত, রামবসু, দাশরথি রায়, রামনিধি রায় (নিধুবাবু), কালী মির্জ্জা এবং আরও বহু কবি রামপ্রসাদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে স্বতঃউচ্ছ্বসিত আগমনী-বিজয়া গান রচনা করেন। এ'রা 'কবিওয়ালা' নামে বর্ত্তমান ইঙগ-বঙগ সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে আছেন। মধ্যযুগের এই উমা-সঙগীতের ধারা আধুনিক যুগেও চলেছিল। মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র সেন, রাজকৃষ্ণ রায়, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই উমা-সঙগীতের বিষয় বস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। শেষোক্ত কবির একটি গান, মধ্যযুগেব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, প্রসঙগত আমরা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি।

# বৈষ্ণব-সাহিত্য

# বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য

গীতি-কবিতার সঙ্গে বাঙগালীর অন্তরের গভীর যোগ আছে। এর মধ্যেই হৃদয়-প্রধান বাঙগালীর প্রতিভা চিরদিন মুক্তি লাভ করে এসেছে। চর্য্যাগীতি বা তারও আগে থেকে এর সুরু।

মধ্যযুগে বাঙগলাদেশের দুকূল ছাপিয়ে বৈষ্ণব-গীতিকবিতার বান ডেকেছিল। আর, এই ধারার জের যে আজও মেটেনি তার পরিচয় আমরা পাই মধুসূদনের ব্রজাঙগনাকাব্য থেকে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি রবীন্দ্র-নাথের ভানুসিংহের পদাবলী ও গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত। বৈষ্ণব পদাবলী বাঙগলার নিজস্ব সম্পদ,—বিদেশের ধার করা গিল্টি এতে নেই। মধ্যযুগে বাঙগালীর আধ্যাত্মিক সাধনার ও হৃদয়াবেগের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়েছে এই বৈষ্ণব-কাব্যে।

এই যে শব্দ-চিত্রময় অনুপম বৈষ্ণব গীতিকাব্য এ একটা সাময়িক খেয়ালে -যশের আশায় রচিত হয়নি। বৈষ্ণব-কবি-চিত্তের এই যে অশ্রুজলে গাঁথা গান, এর উৎস হচ্ছে ভক্ত ও প্রেমিকের মর্ম্মকথায়। এর ভাষায়, ব্যাকরণে, ছন্দে ভুল-ত্রুটি খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু সেদিক দিয়ে এর বিচার করলে ভুল করা হবে। একে যাচাই কবতে হবে সূক্ষ্ম অনুভূতির কষ্ঠিপাথবে। বাঙগালীর চিত্তের গভীরে আবেগ ও আবেদনের অভিসিঞ্চনে যে একতারা উঁচু সুরে বাঁধা আছে এর কীর্ত্তনের সুরও সেই এক সুরেই বাঁধা।

এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমলীলা। কাব্যের দিক ছাড়াও এর আধ্যাত্মিক সম্পদও প্রচুর। গোঁড়া বৈষ্ণবদের অনেকেই এর কাব্যের দিকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে এর দার্শনিক তত্ত্বের দিকটিকেই বড় ক'রে দেখেন। এর মধ্যে মানবীয় প্রেমকে স্বীকার করতে তাঁরা নারাজ। তাঁদের মতে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ তরুণ-তরুণী মনে করা চল্‌বে না এবং তাঁদের প্রণয় ব্যাপারও সাধারণ নায়ক-নায়িকার রহস্যকেলি হতে স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ চিরসুন্দর রসস্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীভগবান এবং শ্রীরাধা সেই ভগবানের হ্লাদিনী পরাশক্তি বা মহাভাবময়ী পরমাপ্রকৃতি—তিনি জীবাত্মার প্রতীক।

শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধার অভিসার, পরমাত্মার উদ্দেশ্যে জীবাত্মার অভিসারের রূপক মাত্র।*

সন্দেহ নেই, এই কাব্যে ভগবৎ প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশ হয়েছে। প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু জয়দেব-বিদ্যাপতি-চন্ডীদাস প্রভৃতির গীতিকবিতাকে আশ্রয় করে অশ্রুতপূর্ব্ব প্রেমের মন্দাকিনী-স্রোত প্রবাহিত করেছেন; শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মহাজনেরা মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত আদর্শ লক্ষ্য করে ও তাঁর "রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ" প্রেম-মূর্ত্তি ধ্যান করেই কাব্য রচনা করেছেন। তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মহাপ্রভুর অনেক আগেই রাধাকৃষ্ণের জবানীতে প্রণয়মূলক উমাপতি ধরের গীতিকাব্য, জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দম্', বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' এবং বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক শৃঙ্গার-রসাত্মক পদগুলি রচিত এবং বহুল প্রচারিত হ'য়েছিল। এগুলির অধিকাংশই নরনারীর প্রাকৃত প্রেমলীলার আদর্শে রচিত এবং এগুলিতে রক্তমাংসে গড়া মানুষের প্রেমের ও সম্ভোগের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। এই সমস্ত প্রাণধর্ম্মী, মানবিক ইন্দ্রিয়ালুতা ও হৃদয়াবেগ-প্রধান কাব্য থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব রাগানুগামার্গে গোপীভাবে উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন এবং এই কাব্যকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দেন। তাঁর জীবনেও সাত্ত্বিক বিকার পূর্ণ শ্রীরাধা-প্রেম মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। তখন থেকেই বৈষ্ণব-কাব্যকে নিছক কাব্য হিসাবে দেখা এবং এর মধ্যে মানবীয় প্রেমকে

---

* মহাভারত, হরিবংশ (রামকৃষ্ণ ভান্ডারকরেব মতে এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক।) বা বিষ্ণুপুরাণে (রচনাকাল খ্রীষ্টজন্মের কাছাকাছি সময়,- এতে মৌর্য্য বংশীয় রাজাদের কথা আছে।) রাধার নাম নেই। শ্রীমদ্ভাগবতের (ভিনটার্বনিট্‌স ও রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর প্রমুখ পন্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যে, এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় দশম শতকে রচিত।) দশম স্কন্ধে রাসলীলা বর্ণিত হ'য়েছে, কিন্তু সেখানেও রাধার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। আনুমানিক দ্বাদশ শতকে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং নারদপঞ্চরাত্রসংহিতায বাধার নাম আছে।

"সেন-পর্বের কোনো সময়ে বোধ হয় অনাতমা গোপিনী রাধা কল্পিতা হইয়া থাকিবেন, এবং খুব সম্ভব তাহা ক্রমবর্ধমান শক্তি ধর্মের প্রভাবে। এই শক্তিধর্মের প্রভাব বৈষ্ণবধর্মেও লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বৈষ্ণবেব কৃষ্ণ শাক্তের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, আরও শিথিল ভাবে বলা যায়, বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র; আর রাধা হইতেছেন শাক্তের শক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি, শিথিল ভাবে বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজযানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। সমসাময়িক কালের এই চেতনার স্পর্শ বৈষ্ণবধর্মেও লাগিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। পরবর্তী সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ-রাধা যে পুরুষ-প্রকৃতি ও শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার এক পরিবার ভুক্ত, এ-সম্বন্ধে তো কোনোই সন্দেহ নাই।" (বাঙালীর ইতিহাস)

অনুভব করা নিন্দনীয় হয়েছে। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তীকালে তাঁর জীবনাদর্শ ও প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে অসংখ্য কবি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা-বৈচিত্র্য অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন। যেমন,—

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙা বাস পরে,
যেমতে যোগিনী পারা॥"

চণ্ডীদাস রচিত শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগের এই পদ বৃন্দাবন-বিলাসিনী নীল-বসনা শ্রীরাধার চেয়ে শ্রীচৈতন্যের সজল আঁখি ও তাঁর গৈরিক বসনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বেশী। এই ধরনের পদগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে অনেকটা উন্নীত হলেও এগুলির মধ্যেও আমরা যে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ পাই তাঁরা রক্তমাংসে গঠিত মানুষ। তাঁদের গোলকবিহারী হরি ও মহাভাবস্বরূপিণী লক্ষ্মীরূপা শ্রীমতীর রূপকে আবৃত করার চেষ্টা বৃথা।

সাধারণ রসগ্রাহী পাঠকের কাছে কিন্তু এর রহস্য ও বিস্ময় মণ্ডিত কাব্যের দিকটিই প্রধান এবং এদিক দিয়ে বৈষ্ণব পদাবলীকে রোম্যাণ্টিক প্রেম-কাব্য বলা অসঙ্গত হবে না। আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই 'বৈষ্ণব কবিতায়' বলেছেন,- "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান" নহে,--

"......এই প্রেম গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে,—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।..."

বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনায় এগিয়ে যাবার আগে কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

বৈষ্ণব গীতিকাব্য বিভিন্ন কবির দ্বারা বিভিন্ন কালে খণ্ড খণ্ড ভাবে রচিত হ'লেও পূর্ব্বরাগ, রূপানুরাগ, মান, দান, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ,

বিরহ, মিলন, নিবেদন, প্রার্থনা প্রভৃতি ধারাবাহিক ভাবে সন্নিবেশিত ও গীত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে গীতিমাল্যের আকারে একটি নিবিড় যোগসূত্র দেখা যায়;—সেজন্য এগুলিকে খণ্ড কবিতা না বলে খণ্ড-কাব্য বলাই ভাল মনে হয়। তাছাড়া, পদাবলী বাঙলার নিজস্ব উচ্চাঙ্গের গান ত বটেই।

পদাবলীতে মোটামুটি তিন রকম ছন্দ দেখা যায়,—মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের মিশ্রিত ছন্দ।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে মুখ্য রস পাঁচটি। যথা,—(১) শান্ত (২) দাস্য (৩) সখ্য (৪) বাৎসল্য এবং (৫) মধুর। পদাবলী এই পঞ্চরসের সমবায়ে রচিত। পদাবলীর মধ্যে শেষোক্ত মধুর বা উজ্জ্বল রসের পদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। শ্রীভগবানের প্রেম বিষয়ক এই গীতাবলীতে অপ্রাকৃত আদিরসকেই বৈষ্ণবগণ মধুর বা উজ্জ্বল রস নামে অভিহিত করেছেন। মধুর রস আবার দু'ভাগে বিভক্ত,—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। আবার বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের চারটি প্রধান রূপ এবং প্রতি রূপের আট বিভাগ; এইভাবে বত্রিশটি অবস্থান্তর দেখা যায়।

বৈষ্ণব কাব্যে ও অলঙ্কার শাস্ত্রে স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমকে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কারণ স্বকীয়ার চেয়ে পরকীয়া প্রেমে তীব্রতা, প্রগাঢ়তা, আবেগ ও অতৃপ্তি বেশী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণের এই পরকীয়া প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দেওয়া হ'য়েছে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার জীবন্ত বিগ্রহরূপে কল্পনা করে। যেমন পরপুরুষে আসক্তা কোন নারী সংসারের শত কর্ম্মে রত থেকেও সর্ব্বক্ষণই তার দয়িতের কথা চিন্তা করে, মিলনের প্রতীক্ষায় থাকে, অভিসারের সুযোগ খোঁজে—সকলের নিন্দা তিরস্কার ও সকল অখ্যাতিকে অগ্রাহ্য করে,—সেই রকম সংসারে সমস্ত আবিলতার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও জীবাত্মাকে আত্মস্থ থাকতে হবে, ধ্যানস্থ থাকতে হবে, সর্ব্বদা পরমাত্মার চিন্তায় বিভোর থাকতে হবে। তাঁর উদ্দেশ্যে অভিসারের জন্য প্রস্তুত হতে হবে লোকচক্ষুর অগোচরে, আত্মনিবেদন করতে হবে তাঁর কাছে, সংসারের সব কিছু বিস্মৃত হয়ে একাত্ম হতে হবে তাঁর সঙ্গে। এ বিষয়টিকে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় অল্প কথায় বলেছিলেন,—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তনবসঙ্গমরসায়ণম্ ॥"

বৈষ্ণব পদাবলী-কারগণ সামান্য পদকর্ত্তা বা কবি হিসাবে বিবেচিত হন্ না। ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে তাঁরা মনশ্চক্ষুতে শ্রীরাধা-মাধবের অপূর্ব্ব প্রণয়-লীলার দ্রষ্টা। তাই তাঁরা ঋষি অথবা মহাজনরূপে গণ্য হন। তাঁদের রচিত পদাবলীকে মহাজন-পদাবলী বলা হয়। পদাবলী-কীর্ত্তন ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বৈষ্ণব মহাজনগীতির রস আস্বাদন করে ভাবে বিভোর হতেন। তিনি রাধা-কৃষ্ণের ঐক্যাবতাররূপে পূজিত হন। তিনিই এই লোক-সঙ্গীতকে ধর্ম্ম-সঙ্গীতের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। এই সমস্ত কারণে এবং পদাবলী কীর্ত্তন গানের আরম্ভে শ্রোতাগণের অন্তরকে নিষ্কলুষ করে উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে মহাজন পদাবলী শ্রবণ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র করে তোলার জন্য শ্রীগৌরচন্দ্রের নাম স্মরণ করে কিছু পদ রচিত হয়েছিল। যেমন যদুনাথদাসের,—

"আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম।
ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ॥"

অথবা গোবিন্দদাসের,

"নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধনী তীরে উজোর॥" ইত্যাদি।

কীর্ত্তন গানের আসরে এই ধরনের গৌরাঙ্গ-বিষয়ক গানের অবতারণা করে পদাবলী কীর্ত্তন করার বিধি। এই প্রস্তাবনা বা ভূমিকা-গীতকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। পালা বা লীলা-কীর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন লীলায় তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা দেখা যায়। মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে অনুষ্ঠিত খেতুরীর মহোৎসবের সময় থেকে এই পদ্ধতি চলে আসছে। আর মিলনের গান অথবা ঝুমর গেয়ে পালা শেষ করার বা স্থগিত রাখার নিয়ম।

আগেই বলা হ'য়েছে, বৈষ্ণব কাব্যের মূল বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই কাব্যে আমরা যে অনুপম সুন্দর চিত্রটি পাই তা সাধারণ

দৃষ্টিতে হ'ল এই যে, একটি সুন্দরী নায়িকা তার প্রিয়তমের প্রেমে ও স্বপ্নে বিভোর। সে তার নায়ককে দেখেছে হয়ত' শুধু এক ক্ষণিকের দৃষ্টিতে,—কিন্তু সেই ক্ষণিকের দেখার কাছে তার সংসার, সমাজ, সংস্কার, গুরুজনের রক্তচক্ষু, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের নিন্দা-তিরস্কার, লোকলজ্জা ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের বাধা সব তুচ্ছ হ'য়ে গেছে। এই দয়িতকে না পাওয়া পর্য্যন্ত তার বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই;—শান্তিও নেই, শ্রান্তিও নেই। তার সঙ্গে বিচ্ছেদে যেমন অসহনীয় দুঃখ, মিলনেও তেমনি চির-অতৃপ্তি। এ প্রেম যেন বিষামৃত।

বৃন্দাবনের কেলি-কদম্ব-মূলে রাখালের হাতে বাঁশী চিরদিনের মত নীরব হ'য়ে গেছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের প্রাণের বাঁশীতে মেঠো সুরে একদিন যে গীতধ্বনি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল তার অনুরণন আমরা আজও শুনতে পাই। 'সেই সুর আমাদের মানস-মাধবী-কুঞ্জে প্রাণ-রাধিকাকে চিরদিনই ব্যাকুল করে তুল্‌বে'।

## বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ

অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ মহাশয় লিখেছেন,—"নিভৃত গিরিকন্দরে বারিরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, একদিন সেই পাষাণ বেষ্টনী ভেদ করিয়া বারিরাশি নিম্ন অভিমুখে ছুটিয়া চলে অমৃত প্রপাতরূপে। সেইরূপ ভাগবতের অপূর্ব্ব কাব্যরস লৌকিক ভাষায় নামিয়া আসিল প্রথম বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীতে। প্রেরণা যেমন প্রবল, প্রতিভাও তেমনই প্রদীপ্ত। এইরূপে শুভযোগেই বৈষ্ণব পদাবলীর জয়যাত্রা সুরু হইয়াছিল"।

অসংখ্য বৈষ্ণব কবির কাকলিতে একদিন বাঙগলার কাব্য-কুঞ্জ মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল। প্রায় দেড় শতেরও অধিক পদকর্ত্তা বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা এবং মুসলমান কবিও আছেন।

আদি মধ্যযুগ বা প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবিদের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এবং অন্ত্য মধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস সমধিক প্রসিদ্ধ। আমরা এখানে এই চারজন শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তার কাব্য আলোচনা ক'রব।

## চণ্ডীদাস*

### (পরিচয়)

চণ্ডীদাস প্রাচীন বাঙলার শ্রেষ্ঠতম কবি। তিনি হলেন মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের আদি কবি। তাঁর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তারও ঐতিহাসিকত্য নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। চণ্ডীদাস কারও নাম অথবা চণ্ডীসেবকদের উপাধিমাত্র তাও বলা শক্ত। তিনি আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। তাঁর আর এক নাম অনন্ত এবং তিনি বড়ু উপাধি ব্যবহার করতেন। তিনি মহাপণ্ডিত, সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ও সুগায়ক ছিলেন এবং তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনের দল ছিল বলে শোনা যায়। তিনি সম্ভবত গণেশাদি পঞ্চ দেবতার উপাসক ছিলেন। বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের কাছে নান্নুর ও বাঁকুড়া জেলার ছাতনা এই উভয় স্থানেই চণ্ডীদাসের ভিটা প্রভৃতি দেখা যায় এবং বহু জনপ্রবাদ শোনা যায়। হয়ত একাধিক চণ্ডীদাস ছিলেন বলেই এ রকম হ'য়েছে। যাই হোক, তিনি খাঁটি বাঙলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন। চণ্ডীদাসের ভণিতা থেকে জানা যায়, যে তিনি বাসলী দেবীর বরে কাব্য রচনা করেছিলেন। বাগীশ্বরী (সরস্বতী) শব্দ হ'তেই উচ্চারণ-বৈষম্যে বাসরী বা বাসলী কথাটির উৎপত্তি হ'য়েছে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, বজ্রযান বৌদ্ধদের কল্পিত বজ্রসত্ত্ব নামে ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধের শক্তিরূপা বজ্রেশ্বরী (বজ্রধাত্বেশ্বরী) দেবীর নাম থেকেই বাসলী বা বাসুলী দেবীর উদ্ভব হ'য়েছে। বাসুলীর ধ্যান মন্ত্র থেকে তাঁকে ও মঙ্গলচণ্ডীকে অভিন্না মনে হয়।

বৈষ্ণব সমাজে মহাকবি চণ্ডীদাস গুরু স্থানীয়। মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের

---

* চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একটা সংশয় অনেক দিন থেকেই ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানি আবিস্কৃত হওয়ার পর চণ্ডীদাস-সমস্যা জটিলতর হ'য়ে উঠেছে। চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন (চৈতন্যপূর্ববর্ত্তী বড়ু চণ্ডীদাস এবং পরবর্ত্তী দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাস) এ কথা আজকাল অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এক রকম স্বীকার করে নিচ্ছেন। একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব নিয়ে পণ্ডিতগণের তর্কে-বিতর্কে ধূম্রজাল সমাচ্ছন্ন চণ্ডীদাস-সমস্যার গ্রন্থি-মোচন হওয়া দূরে থাক সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আমরা সে অমীমাংসিত সমস্যার আলোচনা করলাম না। এখানে চণ্ডীদাস প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাস। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, —"আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ"। চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও এই কথা হয়ত বলা চলে।

কাব্য পাঠে আনন্দে বিভোর হ'তেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ থেকে জানা যায়,--

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥" (মধ্যের দ্বিতীয়ে)

অন্যত্র,—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥" (মধ্যের দশমে)
"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শেলাক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে শেলাক পড়িয়া।
শেলাকের অর্থ করেন (প্রভু) প্রলাপ করিয়া॥"

(অন্ত্যের সপ্তদশে)

সহজিয়ারা* সম্ভবত স্বীয় সমাজের গৌরব বৃদ্ধির মানসে প্রচার ক'রে থাকেন যে চণ্ডীদাস সহজ-ভজন আশ্রয় করেছিলেন। অনেক পরবর্ত্তীকালে

* "খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম শাখা সহজযানের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সহজ-শাস্ত্রে দুঃখের নিয়ম পালনের ব্যবস্থা নাই। উহাতে বলে,—'যদি তোমার বোধিলাভের বাসনা থাকে, তবে গুরুর উপদেশ গ্রহণ কর এবং পঞ্চকাম উপভোগ করিতে থাক। কেবলই আনন্দ কর।' উপভোগের অবস্থাভেদে আনন্দ চতুর্ব্বিধ,—আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দানুভবের পর গ্রাহ্য, গ্রাহক ও গ্রহণাভিমানরহিত পরম সুখের উপলব্ধিকে সহজানন্দ বলে। অনন্তর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি সুখভোগ করিয়াছি, এইরূপ বিকল্প অনুভূতি অথবা প্রথম তিন প্রকার সুখত্যাগ দ্বারা যে আনন্দ অনুভব হয়, তাহাকে বিরমানন্দ কহে। বিরমানন্দই মহাযানের শূন্যতা বা নির্ব্বাণপদ। উপরোক্ত সহজযানের সাধনপ্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহজ ভজন আখ্যা পাইয়া থাকিবে। সহজ-ভজনে নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়, এই পাঁচ প্রকার আশ্রয়ের উল্লেখ আছে। শেষ দুইটি আশ্রয়ই উত্তম। রস, নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-স্বরূপ। উহা স্বকীয়া ও পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধ। সহজ-সাধনে পরকীয়া-রসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। সহজ-সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারী উত্তম আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া আপনাদিগকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অথবা তাঁহার অনুগত সখী জ্ঞানে বৃন্দাবনলীলার অনুরূপ বিবিধ রসলীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন।" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন; শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদকীয় বক্তব্য।)

সহজ-সাধক বৈষ্ণবেরা চন্ডীদাসকে 'নব রসিক'এর অন্যতম করে নিয়েছেন। চন্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তিনি বাসুলীর দেয়াসিনী রামি বা রামমণি নামে এক বিধবা রজকীর অনুরাগী ছিলেন। সাধন-সঙ্গিনী এই রজক-ঝিয়ারীর অনুপ্রেরণায় তিনি নাকি তাঁর অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, এই রজকিনী মানবী নহেন সাধন-রূপক মাত্র। যাই হোক, এই রামি সম্বন্ধে চন্ডীদাসের নামাঙ্কিত অনেক পদ পাওয়া যায়। যেমন,—

"রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চন্ডীদাস গায়॥"

অন্যত্র,—

"শুন রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি॥
তুমি রজকিনী, আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন,
তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী॥" ইত্যাদি।

প্রবাদ আছে মিথিলার কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে চন্ডীদাসের সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনারও যথার্থ প্রমাণাভাব। চন্ডীদাসের তিরোভাব সম্বন্ধেও অসংখ্য গল্প ও পদ প্রচলিত আছে। কিন্তু এগুলির প্রামাণিকতা বিষয়েও সন্দেহ করার কারণ আছে।

## বিদ্যাপতি

### (পরিচয়)

বিদ্যাপতি মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু এই মিথিলার কোকিলের পঞ্চমস্বরে বাঙালীর চিত্ত মুগ্ধ। বিগত শতাব্দীতেও বিদ্যাপতি বাঙালী বলেই পরিচিত ছিলেন। খাস মিথিলার পন্ডিত সমাজও বিদ্যাপতির

সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। গ্রিয়ারসন্ সাহেব মিথিলায়, বহু অনুসন্ধান করে, মাত্র ৮২টি বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। সেগুলিতেও আবার অনেক পাঠ-বিকৃতি দেখা যায়। বিদ্যাপতি মৈথিল ছিলেন এ কথা স্থির হওয়ার পর বিহার অঞ্চলে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে ও সেখানে আজকাল অনেকগুলি নূতন পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পি-এইচ-ডি, সি-আই-ই, মহাশয় নেপাল দরবারের গ্রন্থাগার থেকে বিদ্যাপতির একটি পুঁথি আবিস্কার করেন। এতে পাঠ বিকৃতি অল্পই আছে। কবি মৈথিলী হ'লেও বাঙলা দেশেই তাঁর সমাদর সবচেয়ে বেশী এবং তাঁর কাব্যের সঙ্গে বাঙালীর অন্তরের ও মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের যোগ থাকায় আমরা তাঁকে বাঙালী করে নিয়েছি। এ দেশের রসিক, ভক্ত, কবি ও গায়কগণ ঐকান্তিক আগ্রহে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলি সংগ্রহ ক'রে কালের কবল হ'তে রক্ষা ক'রেছেন। প্রধানত আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেই তাঁরা এরূপ করেছিলেন। 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদে বাংলা দেশ মজিয়াছিল। এই যুগ্ম নাম বহুদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।' বিদ্যাপতির কাব্য বহু বৈষ্ণব-কবিকে কাব্য রচনায় প্রেরণা দিয়েছে, ছন্দ দিয়েছে, ভাষা ও ভাব পর্য্যন্ত দিয়েছে। বিদ্যাপতির অনেক অসম্পূর্ণ ও কালপ্রবাহে লুপ্ত পদের পাদপূরণ করে গৌরবান্বিত হ'য়েছেন কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বাঙালী পদকর্ত্তা। গোবিন্দদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিগণ বিদ্যাপতির উদ্দেশ্যে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। 'বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।' তাই বিদ্যাপতির উপর আমাদেরও কিছু দাবী আছে,—এ দাবী শুধু ভালবাসার। এখানে বঙ্গদেশ ও মিথিলার মধ্যে মৈত্রী ও সংস্কৃতিগত কিছু আলোচনা সংক্ষেপে করে কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

বঙ্গদেশ ও মিথিলার মধ্যে গভীর যোগসূত্র বহুদিন হ'তে অবিচ্ছেদ্য ভাবে রয়েছে। উভয় প্রদেশই উভয়ের নিকট নানাভাবে ঋণী —,এ ঋণ ভ্রাতৃত্বের। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে শশাঙ্কের সময় থেকে আরম্ভ করে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত – অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত—মিথিলার রাজসভা গৌড়ের সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করত এবং মিথিলায় বহুকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গলিপি ও মৈথিলি লিপিমালার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। সেন-রাজবংশের

পতনের পর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র মিথিলায় স্থাপিত হয়। বাঙ্গলার বহু ছাত্র মিথিলার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও কয়েক শতাব্দী ধরে ভাবের আদান প্রদান চলে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণির সময় বঙ্গদেশে আবার বীণাপাণির পীঠস্থান গড়ে ওঠে। বঙ্গীয় সেন রাজাদের প্রভাব তখনও মিথিলায় যথেষ্ট ছিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে ধর্ম্ম ও সমাজ গঠনের প্রয়োজনে লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিতগণের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, শৈবসর্ব্বস্বসার প্রভৃতি গ্রন্থের অনুকরণে মিথিলার পণ্ডিতগণও, এমনকি, স্বয়ং কবি বিদ্যাপতিও, ঐ জাতীয় গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ ক'রেছিলেন। গৌড়ের সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মিথিলার রাজ-সভাকবি বিদ্যাপতি 'নব জয়দেব' উপাধিতে ভূষিত হ'য়েছিলেন। মিথিলায় প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের পদ এবং তাঁদের বেনামীতে আদিরসাত্মক লীলা বর্ণনার রীতি বহু প্রাচীন কালে বঙ্গদেশেই প্রথম উদ্ভূত হ'য়েছিল। সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের পিতামহ "সকল ত্রিপতি পতি" বিজয়সেনের সভাকবি 'চন্দ্রচূড়-চরিত' প্রণেতা কবি উমাপতি ধর এই বৈষ্ণব কাব্যের একজন আদি কবি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের সময়েই অথবা তাঁর পরবর্ত্তীকালে মিথিলায় রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গীতি-কবিতা রচয়িতা হিসাবে কয়েকজন কবির নাম পাওয়া যায়। যেমন, জয়ানন্দ, চতুর্ভুর্জ, নন্দীপতি, চক্রপাণি, কবিশেখর, ভঞ্জন প্রভৃতি। বাঙ্গলা দেশের মত রাধাকৃষ্ণের পদের সঙ্গে অন্তরের গভীর যোগ না থাকলেও গৌড়ের লক্ষ্মণসেনের রাজসভার অনুকরণে মিথিলার রাজসভাতেও সভা-কবিগণের দ্বারা রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে শৃঙ্গার রসাত্মক পদ রচনা করার ধারা সেদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। রাজা সুন্দরসিংহের (আ ১৬৪২-৬২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রিয় কবি সরসরাম, রাজা প্রতাপসিংহের (আ ১৭৬২-৭৬) সভায় কবিদ্বয় মোদনারায়ণ এবং কেশব, রাজা মহেশ্বরসিংহের (আ ১৮৫০-৬০) সভাকবি ভানুনাথ প্রভৃতি এই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

বিদ্যাপতির নিবাস স্থান—

মিথিলার দ্বারভাঙ্গা জেলা প্রাচীনকাল থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত। এই জেলায় সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত জরৈল পরগণায়—কমতৌল রেল স্টেসন থেকে দুক্রোশ দূরে—বিস্পী (বিস্ফী) নামে এক গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এই স্থান গড়বিস্পী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই গ্রামেই মহাকবি বিদ্যাপতির নিবাস ছিল। রাজা শিবসিংহ

বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্যে ও অসাধারণ কবিত্ব শক্তিতে প্রীত হ'য়ে তাঁকে এই গ্রাম দান করেছিলেন। তাম্রশাসন পত্রে এর উল্লেখ আছে। এখানে বিদ্যাপতির কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীর মন্দির এখনও বিদ্যমান। কবির বংশধরগণ প্রায় পাঁচ ছয় পুরুষ যাবৎ ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করে মধুবনী মহকুমার সন্নিকটে সৌরাঠ গ্রামে বাস ক'রছেন।

কবির পূর্ব্বপুরুষগণ ও তাঁর বংশলতিকা—

মিথিলায় কুল পঞ্জী এবং পঞ্জিকারের উদ্ভব হয় রাজা হরিসিংহদেবের সময়। পঞ্জীর আরম্ভে যে সংস্কৃত শ্লোক আছে তা থেকে জানা যায়, যে ১২১৬ শকাব্দে (১২৯৪ খৃীষ্টাব্দে) হরিসিংহদেবের জন্ম হয় এবং তার বত্রিশ বৎসর পরে কুলপঞ্জী রচনা আরম্ভ হয়। এই পঞ্জীতে বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণের এবং তাঁর বংশাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। (পৃ ২০৫ দ্রষ্টব্য।) বিদ্যাপতির রচিত পদে জানা যায় তাঁর স্ত্রীর নাম মন্দাকিনী 'ভনই বিদ্যাপতি সুনু মন্দাকিনী জগতে এহন বিধান...') কন্যার নাম দুল্লহি? (দুল্লহি তোহর কতয় ছথি মায়...') কবির পুত্রের (মতান্তরে ভ্রাতুষ্পুত্র) নাম হরপতি এবং পুত্র-বধূর নাম চন্দ্রকলা। লোচন-পণ্ডিতের 'রাগতরঙ্গিণী' নামে সংগীত-শাস্ত্রা-লোচনার একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে একটি গানের ভণিতায় লেখা আছে, "চন্দ্রকলা হে বচন করসী। মানিনি মাধব মনুসরসী'॥" এই গানের শেষে টীকায় র'য়েছে,— "ইতি শ্রীবিদ্যাপতিপুত্রবধ্বাঃ।" অনেকে মনে করেন এই টীকা স্বয়ং লোচন কৃত। এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি রচিত মৈথিল গীতও আছে। কিন্তু আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ ক'রেছেন যে, লোচন-পণ্ডিত বল্লালসেনের সমকালে ১১৬০ খৃীষ্টাব্দে রাগতরঙ্গিণী রচনা করেছিলেন। বিদ্যাপতি এবং তাঁর পুত্রবধূ রচিত পদ তাহলে নিশ্চয় অনেক পরবর্ত্তীকালে এই গ্রন্থে সংযোজিত হ'য়েছিল।

বিদ্যাপতির জীবনী---

বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে (১৩৫৮ খৃীষ্টাব্দ?) বিদ্যাপতির জন্ম হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীহরিমিশ্র ছিলেন তাঁর অধ্যাপক এবং হরিমিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রীপক্ষধর মিশ্র ছিলেন তাঁর সহপাঠি। পক্ষধর মিশ্র সম্ভবত তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। পক্ষধর মিশ্রের স্বহস্ত (?) লিখিত বিষ্ণু-

বিষ্ণুঠাকুর
হরাদিত্যঠাকুর
—ওড়বিসপী নিবাসী মহামাত্য (রাজমন্ত্রী) ত্রিপাঠী—
কর্ম্মাদিত্যঠাকুর
—সন্ধিবিগ্রহিক (মন্ত্রী)—
দেবাদিত্যঠাকুর
—মহামহত্তক—
বীরেশ্বরঠাকুর
ইনি রাজা শক্রসিংহ এবং হরসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত ছান্দোগ্য দশকর্ম্মপদ্ধতি এঁরই রচিত। এই পদ্ধতি অনুসারেই অদ্যাবধি মিথিলায় বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্ম হয়ে থাকে।)
—মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক—
চণ্ডেশ্বরঠাকুর
(ইনি সপ্তরত্নাকর কৃত্যচিন্তামণি এবং মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে ছিলেন।)
—মহাবার্ত্তিক নৈবন্ধিক—
ধীরেশ্বরঠাকুর
জয়দত্তঠাকুর
(পূজার্চ্চনা ও ধর্ম্মকর্ম্মে লিপ্ত থাকার জন্য ইনি যোগীশ্বর নামে খ্যাত ছিলেন।)
গণপতিঠাকুর
(ইনি দেবসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং শিবসিংহের জ্যেষ্ঠতাত রাজা গণেশ্বরের মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামে সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা।)
মহাকবি বিদ্যাপতিঠাকুর
গণেশ্বরঠাকুর
(ইনি রাজা হরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। আহিরেশ্বর গঙ্গাপত্তলক সুগতিসোপান প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।)
জটেশ্বরঠাকুর
হরদত্তঠাকুর

পুরাণ পাওয়া গেছে। তাতে রচনাকাল সম্বন্ধে নির্দ্দেশ আছে ৩৫৪ লক্ষ্মণাব্দ (১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)। বিদ্যাপতি তাঁর পিতার সঙ্গে রাজা গণেশ্বরের রাজসভায় যাওয়া আসা করতেন। গণেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কীর্ত্তিসিংহ রাজা হন। অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বিদ্যাপতি কীর্ত্তিসিংহের দরবারে আসন লাভ করেন। এই সময় তিনি 'কীর্ত্তিলতা' রচনা করেন। কীর্ত্তিসিংহের কোন সন্তান না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পিতামহের ভ্রাতা ভবসিংহ্ রাজা হন। ভবসিংহের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। কিন্তু বিদ্যাপতির 'বিভাগসার' এবং 'পুরুষপরীক্ষা' থেকে মনে হয় ভবসিংহ রাজা হয়েছিলেন। হয়ত তাঁর রাজ্যকাল অল্পস্থায়ী ছিল। ভবসিংহের পর তাঁর পুত্র দেবসিংহ (গরুড়নারায়ণ) রাজা হন। এঁর আদেশে বিদ্যাপতি 'ভূপরিক্রমা' রচনা করেন। দেবসিংহ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। দেবসিংহের দুই পুত্র,—শিবসিংহ ও পদ্মসিংহ। দেবসিংহের রাজত্বকালে শিবসিংহ (রূপনারায়ণ) যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। দেবসিংহ নামে মাত্র রাজা থাকলেও রাজ্যের সকল ভার অশেষ গুণবান শিবসিংহের হাতেই ন্যস্ত ছিল। এমনকি, তিনি মহারাজ বলেও কথিত হতেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে, স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিস্কৃত, তর্কাচার্য্য শ্রীধর ঠাকুর বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ-বিবেক' নামে যে পুঁথি আছে তার শেষে দেখা যায়, সেটি বিদ্যাপতি ঠাকুরের আজ্ঞায় মিথিলার তখনকার রাজধানী গজরথপুর নগরে দেবশর্ম্মা এবং প্রভাকর কর্তৃক লংসং ২৯১ কার্ত্তিক বদি ১০ তারিখে (১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিত হয়েছিল। এই পুঁথি থেকে জানা যায়, 'শ্রীমৎশিবসিংহদেব' সেই সময়েই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কবি বিদ্যাপতি এবং বিদগ্ধ শিবসিংহের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি ছিল। 'পুরুষপরীক্ষা' শিবসিংহের আদেশে রচিত হলেও এই গ্রন্থ থেকে অবগত হওয়া যায়, সে সময়ে দেবসিংহই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ("ভাতি যস্য জনকো রণজেতা দেবসিংহনৃপতিগুণরাশিঃ—" পুরুষ-পরীক্ষা। এখানে 'ভাতি' শব্দে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ রয়েছে।) বিদ্যাপতি রচিত শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ বর্ণনার নিম্নলিখিত পদটি থেকে জানা যায়, দেবসিংহ ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে) চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গারোহণ করেন এবং শিবসিংহ রাজা হন।

"অনল রন্ধ্র কর লক্‌খণ ণরবই সক্ক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।
চৈত কারি ছঠি জেঠা মিলিঅো বার বেহপ্পই জাউলসী॥

দেবসিংহ জং পুহমী ছড ডই অদ্ধাসন সুররাঅ সরু।
দুহু সুরতান নিদৈ অব সোঅউ তপনহীন জগ ভরু॥
দেখহুও পৃথিমীকে রাজা পৌরুস মাঁঝ পুন্ন বলিও।
সতবলে গংগা মিলিতকলেবর দেবসিংহ সুরপুর চলিও॥
একদিস জবন সকল দল চলিও একদিস সেঁা জমরাঅ চরু।
দুহুএ দলটি মনোরথ পূরও গরুএ দাপ সিবসিংহ করু॥
সুরতরুকুসুম ঘাল দিস পুরেও দুন্দুহি সুন্দর সাধ ধরু।
বীরছত্র দেখনকো কারণ সুরগণ সোভেঁ গগন ভরু॥
আরম্ভীঅ অন্তেট্টি মহামখ রাজসূঅ অশ্বমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ যাচককাঁ ঘর দান কহাঁ॥
বিজ্জাবই কইবর এহু গাবএ মানত মন আনন্দ ভও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইট্ঠৌ উছবৈ বিসরি গও॥"

(পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৭)

মৃত্যুপথযাত্রী দেবসিংহকে গঙ্গাতটে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠিক সেই সময়েই যবন সেনা এসে শিবসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দেবসিংহ গঙ্গালাভ করেন এবং শিবসিংহ যবন সেনাকে পরাজিত করে, সম্ভবত ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে, সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর চার মাস পরে শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী বৃহস্পতিবার শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিস্‌পী গ্রাম দান করেন,—তাম্রপত্রে এই উল্লেখ দেখা যায়। শিবসিংহ মাত্র সাড়ে তিন বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। মিথিলার রাজপঞ্জী অনুসারে রূপনারায়ণ-পদাঙ্কিত শিবসিংহ ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বিদ্যাপতিকে ভূমিদান পত্রের কাল ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) দেখা যায়। এ কি করে সম্ভব হ'ল? আজকাল অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি রাজপঞ্জীর তারিখের মধ্যে কিছু ভ্রান্তি আছে মনে করেন। বর্ত্তমানে ভূমিদান পত্রের যে তাম্রলিপিটি দেখা যায় সেটিও সন্দেহ উদ্রেক করে। এই সনন্দের শেষে লক্ষ্মণাব্দ ২৯৩ ছাড়া হিজরি সন ৮০০, বিক্রমসম্বৎ ১৪৫৪, শালিবাহন শকাব্দ ১৩২১ লেখা আছে। একাধিক সনের উল্লেখ প্রাচীন পুঁথি অথবা তাম্র ও প্রস্তর ফলকে আর কোথাও দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত হিজরি সনের উল্লেখ বিষয়টিকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে। সম্রাট্ আকবর ঐ সনের প্রবর্ত্তক বলে আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখেছেন। কিন্তু ভূমিদান-পত্র আকবরের বহু পূর্ব্বের। এ ছাড়া ঐ তাম্রপত্র দেবনাগরী হরফে লিখিত। ঐ যুগের

অধিকাংশ পুস্তক এবং তাম্রফলকে মিথিলাক্ষর ব্যবহৃত দেখা যায়। এরূপ নানা অসঙ্গতির জন্য স্যার গ্রিয়ারসন্ এই তাম্রলিপিখানিকে জাল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। আরও অনেকে তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অন্য ভাবে বিচার ক'রে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা ক'রেছেন। মুঘল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে রাজা টোডরমল্লের নির্দ্দেশে সমস্ত রাজ্যের জরিপ হয়। বিদ্যাপতির বংশধরগণ যে তাম্রশাসনের বলে বিস্‌পী গ্রাম দখলে রেখেছিলেন তার এক প্রতিলিপি তাঁদের কাছে থাকা অসম্ভব নয়। সম্ভবত মূল তাম্রশাসন অযত্নে হারায় এবং তারপর রাজকর্ম্মচারীদের কাছ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য এই বর্ত্তমান তাম্রপত্র নির্ম্মাণ করা হয় মূল সনন্দের প্রতিলিপির সাহায্যে। খুব সম্ভব এই কারণেই, অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য, সম্রাট্ আকবর প্রবর্ত্তিত সন এবং আরো দু'টি সনের উল্লেখ এতে দেখা যায়। বিস্‌পী গ্রাম যে বিদ্যাপতি দান স্বরূপ পেয়েছিলেন তার নজির তাঁর পদেই রয়েছে। শুধু রাজকর্ম্মচারীগণের দ্বারা স্বীকৃতি লাভের জন্যই এই নূতন তাম্রশাসন প্রচলিত সমস্ত সনগুলি সহ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত করার প্রয়োজন হ'য়েছিল এ কথা মনে করা অযৌক্তিক হবে না। এই সনন্দের বলে কবির বংশধরগণ ব্রিটিশ আমলেও কিছুদিন ঐ গ্রাম নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন। তাঁদের রাজকর দিতে হত না। সন ১২৫৭ ফসলীতে দ্বারভাঙ্গা জেলায় জমির বন্দোবস্ত হয়। সেই সময় এই সনন্দকে ইংরাজ সরকার অগ্রাহ্য ক'রে কবির বংশধর ভৈয়া ঠাকুরের কাছ থেকে বিস্‌পী গ্রাম ছিনিয়ে নেন।

শিবসিংহ রাজা হওয়ার পর অথবা যুবরাজ থাকা কালেই মধুবনী (দ্বারভাঙ্গা) মহকুমার দক্ষিণে পতৌল গ্রামে এক বৃহৎ দীঘি খনন করান— যার নাম 'রজোখরি'। এ সম্বন্ধে মিথিলায় আপামর সকলের মধ্যেই নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি প্রচলিত আছে,--

"পোখরি রজোখরি ঔর সব পোখ্‌রা।
রাজা শিবসিংহ ঔর সব ছোক্‌রা॥"

অর্থাৎ কেবল রজোখরিই পুষ্করিণী পদবাচ্য, বাকী সব ডোবা। কেবল এক শিবসিংহই রাজা নামের যোগ্য বাকী সকলেই অর্ব্বাচীন বালক মাত্র।

শিবসিংহের ন্যায় অশেষ গুণবান ও কাব্য-রসিক নরপতি লাভ ক'রে বিদ্যাপতি শৃঙ্গার রসের কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। বিদ্যাপতির কাব্য রাজ-

সভা অতিক্রম করে অন্তঃপুরেও যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রাজারাণীর সমক্ষে সুগায়িকা দাসীরা বিদ্যাপতির শৃঙ্গার রসের কবিতা (যার ভণিতায় রাজারাণীর নাম থাকত) গান করত'। সম্ভবত এই জন্য উৎসাহিত হ'য়ে কবি রাজা-রাণীর নাম সম্বলিত বহু পদ রচনা করেন। তাঁর বহু পদে রাণী লছিমা বা লখিমাদেবীর নাম পাওয়া যায়। এ থেকেই বোধকরি বাঙলাদেশে এই ধারণা প্রচলিত হয় যে বিদ্যাপতি এবং লছিমাদেবী পরস্পরের প্রতি প্রেমানুরক্ত ছিলেন এবং লছিমাদেবীর দর্শন ব্যতীত কবির কাব্য স্ফুরণ হ'ত না। নরহরি বলেছেন,—

"লছিমা রূপিণী রাধা ইষ্ট বস্তু আর।
যারে দেখি কবিতা স্ফুরয়ে শতধার॥"

আবার, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের মতে লছিমা দেবী শিবসিংহের মহিষী নন্, কন্যা, "লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সক্তো বিদ্যাপতিস্ততঃ"। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও সহজিয়াদের মধ্যে এ রকম বহু কবিতা ও গল্প প্রচলিত আছে। প্রেমমার্গীয় সহজ ধর্ম্ম অথবা বৈষ্ণব সহজিয়াদের উদ্ভব হ'য়েছিল মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগে এবং বিদ্যাপতির তিরোভাবের অনেক পরে। অতএব এই গল্প ও প্রবাদগুলি যুক্তিসঙ্গত নয় এবং ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। সম্ভবত সহজ সাধন সম্প্রদায়ের লোকেরা স্ব-সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামে এরূপ গল্প প্রচার ক'রেছেন। বিবর্ত্তবিলাস এবং অপর কয়েকটি সহজিয়া গ্রন্থে মহাপ্রভু ও তাঁর ঋষিকল্প পার্ষদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নামে এই রকম বহু কাল্পনিক গল্প প্রচার করে তাঁদের সহজ সাধক প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা দেখা যায়। এই ভাবেই বিদ্যাপতি ও লছিমাদেবীর অবৈধ প্রেমকাহিনীও প্রচারিত ও লোকমুখে পল্লবিত হ'য়েছে। এই সিদ্ধান্তের কারণ স্বরূপ বলা যায়, -(১) পরম ধার্ম্মিক বিদ্যাপতি ছিলেন রাজা শিবসিংহের একান্ত বিশ্বাসী সুহৃদ ও রাজপণ্ডিত। যদি তিনি লছিমাদেবীর প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে এই পদগুলি রচনা করতেন তাহলে রাজা অবশ্যই তাঁকে দণ্ডিত করতেন সমাদরের পরিবর্ত্তে। সহজিয়ারা রাজরোষে বিদ্যাপতির যে মৃত্যুর গল্প প্রচার করেছেন তা সম্পূর্ণ উদ্ভট কল্পনা মাত্র। (২) কবিতায় পতির সঙ্গে পত্নীর নাম যোগ করার প্রথা ভারতবর্ষে প্রাচীন। যেমন,—"বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন, কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভব-রোহিণীরমণেন"। "জয়তিপদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি-ভারতী-ভণিতমতিশাতম্॥" অথবা "পদ্মা-

বতী-চরণচারণচক্রবর্ত্তী......" (গীতগোবিন্দম্)। বিদ্যাপতি অন্য রাজার নামের সঙ্গেও তাঁর রাণীর নাম যোগ দিয়ে লিখেছেন,—"হাসিনি দেই পতি গরুড় নারায়ণ দেবসিংঘ নরপতি"। এ ছাড়াও বিদ্যাপতির পদে মেধাদেবী, মধুমতী-দেবী, রূপিনীদেই প্রভৃতি এবং রাজা শিবসিংহের সুখমা দেই প্রভৃতি অন্যান্য মহিষী, অপরাপর রাজা-রাণী, অমাত্য ও অমাত্য-পত্নীর নামও পাওয়া যায়। (৩) শিবসিংহের দেহাবসানের পর লছিমাদেবী ও বিদ্যাপতি অনেক কাল জীবিত ছিলেন এবং কবি আরও বহু গ্রন্থ ও পদ রচনা করেছেন কিন্তু এগুলির কোনটিতেই আর লছিমাদেবীর নাম পাওয়া যায় না। (৪) একটি কবিতায় কবি নিজ পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "জনম দাতা মোর, গণপতি ঠাকুর
> মৈথিল দেশে করু বাস।
> পঞ্চগৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ,
> কৃপা করি লেউ নিজপাশ॥
> বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে
> রহতহি রাজ সন্নিধান।
> লছিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে
> বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥ (পদসমুদ্র)

শেষ পদটি লক্ষ্য করলে অনুমান করা কি অসঙ্গত হবে, যে কবি এখানে যেমন রাজার সঙ্গে রাণীর নাম উল্লেখ ক'রে তাঁদের স্তুতি করেছেন তেমনি কৌশলে ইঙ্গিত করেছেন, যে তিনি বেতনভোগী রাজপণ্ডিতরূপে লছিমা অর্থাৎ ধনদায়িনী কমলার সেবায় রত থেকে কাব্য রচনা ক'রছেন? (৫) খাস মিথিলায় বিদ্যাপতি ও লছিমাদেবীর প্রণয়কাহিনীমূলক কোন গল্প বিশেষ পাওয়া যায় না,—আজকাল অবশ্য সিনেমার কল্যাণে কিছুটা হ'য়েছে।

মুসলমান ও হিন্দু রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ মাঝে মাঝে হ'ত। কয়েকবার শিবসিংহ মুসলমান সেনাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেন বলে শোনা যায়। রাজ্যাভিষেকের সাড়ে তিন বৎসর পরে যবন সেনার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কিন্তু প্রাচীন কিম্বদন্তী থেকে জানা যায়, তিনি নিহত হন্‌নি, পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করেন। দ্বাদশ বৎসর তাঁর কোন সংবাদ না পেয়ে রাণী লছিমাদেবী নাকি শিবসিংহের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন এবং নিজে সেই চিতায় সহমৃতা হন। এর পর শিবসিংহের অনুজ পদ্মসিংহ

রাজা হন। যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে শিবসিংহ স্বীয় পরিজনবর্গকে বিদ্যাপতির তত্ত্বাবধানে রাজা পুরাদিত্যের আলয়ে প্রেরণ করেছিলেন। মিথিলায় জনকপুরের (বর্ত্তমানে নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত) নিকটে রাজাবনৌলী নামে এক গ্রাম আছে। এখানেই ছিল পুরাদিত্যের রাজধানী। 'অর্জ্জুনসিংহ-বিজয়ী' রাজা পুরাদিত্যের আজ্ঞায় বিদ্যাপতি 'লিখনাবলী' রচনা করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এই স্থানেই কবি সহস্তে শ্রীমদ্ভাগবত নকল করেছিলেন। এই ভাগবতের অন্তে লক্ষ্মণাব্দ ৩০৯ লেখা আছে। অনুমান করা হয়, ভাগবত নকল করার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি 'লিখনাবলী' রচনা ক'রেছিলেন। এই স্থানে কবি একটি দীঘি খনন করান, তা আজও বর্ত্তমান রয়েছে। শিবসিংহের মৃত্যুর পর কবি শৃঙ্গার রসের কাব্য রচনা করা ত্যাগ করেন। প্রিয় বন্ধু বিয়োগে কিছুদিন মনস্থির করার জন্য লিখনাবলী প্রভৃতি রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। অনন্তর তিনি স্বীয় উপাস্য দেবতা ( ? ) শিব, তদীয় অর্দ্ধাঙ্গিণী দুর্গা এবং শিব-জটাবলম্বিনী গঙ্গা সম্বন্ধে যথাক্রমে 'শৈবসর্ব্বস্বসার' 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' এবং 'গঙ্গাবাক্যাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শিবসিংহের মৃত্যুর বা নিরুদ্দেশের বত্রিশ বৎসর পরে, লক্ষ্মণাব্দ ৩২৮ সালের মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে বিদ্যাপতি শিবসিংহকে স্বপ্নে দেখেন। শিবসিংহ গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন সেজন্য তাঁর উপনাম ছিল রূপনারায়ণ। কিন্তু স্বপ্নে দেখা শিবসিংহ কৃষ্ণবর্ণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্বপ্নাধ্যায়ে বলা হ'য়েছে যে এরূপ স্বপ্ন আসন্ন মৃত্যু সূচক। এই স্বপ্ন সম্বন্ধে কবির রচিত অথবা কবির-ভণিতাতে সপন নামে পদ পাওয়া যায়, –

"সপন দেখল হম সিবসিংঘ ভূপ।
বতিস বরস পর সামর রূপ॥
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
আব ভেলহুঁ হম আয়ু-বিহীন॥"

মিথিলার প্রথানুযায়ী আসন্ন মৃত্যু লোকদের গঙ্গাতীরে অথবা কাশীধামে নিয়ে যাওয়া হয়। বিদ্যাপতিকে গঙ্গাতটে নিয়ে যাওয়া স্থির হ'ল। বিদ্যাপতির গঙ্গাবন্দনার পদ (" . ভণই বিদ্যাপতি সমদওঁ তোহি। অন্ত কাল জনু বিসরহ মোহি॥") থেকে জানা যায় যে, তিনি অনেক আগে থেকেই গঙ্গাতটে দেহত্যাগের অভিলাষ পোষণ ক'রতেন। পুত্র-কন্যাদের উপদেশ দিয়ে, বন্ধুদের কাছে চির বিদায় নিয়ে, কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম ক'রে

বিদ্যাপতি গঙ্গাতটাভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। তিনি সদলে বাজিতপুর (ও. টি রেলওয়ে ষ্টেসন) পৌঁছলেন। সন্ধ্যা সমাগতা। কবি তাঁর সঙ্গীদের ঐ স্থানে পাল্‌কি নামাতে অনুরোধ ক'রে বল্লেন যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে ও অসুস্থ শরীরে এতদূর এসেছেন আর গঙ্গাদেবী তাঁর জন্যে কি বাকী পথটুকু এগিয়ে আসবেন না? সকলেরই মনে হ'ল মৃত্যু সন্নিকট হওয়ায় তাঁর প্রলাপ আরম্ভ হ'য়েছে। কিন্তু সকলকে আশ্চর্য্য করে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে গঙ্গানদী নাকি নিজ ধারা পরিবর্ত্তন করে সেই স্থানে এগিয়ে এসেছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত নাকি দেখা যায় গঙ্গার ধারা সেখানে বাঁকা রয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি কন্যাকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন,—

> "দুল্লহি তোহর কতএ ছথি মায়।
> কহুন ও আবথু এখন নহায়॥
> বৃথা বুঝথু সংসার বিলাস।
> পল পল নানা তরহক্ ত্রাস॥"

তারপর কন্যাকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেন,—

> "মায় বাপ জোঁ সদ্‌গতি পাব।
> সন্ততি কোঁ অনুপম সুখ আব॥
> বিদ্যাপতিক্ আয়ু অবসান।
> কাতিক ধবল ত্রয়োদসি জান॥"

এই জনশ্রুতি অনুযায়ী বিদ্যাপতির তিরোধান হয় লক্ষ্মণাব্দ ৩২৯ সালের কার্ত্তিক মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স নাকি ৯০ বৎসর হ'য়েছিল। শোনা যায় বিদ্যাপতির চিতার উপর এক শিবলিঙ্গ প্রকট হ'য়ে ওঠেন। বর্ত্তমান কালেও সেখানে সেই শিবের মন্দির আছে এবং প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সেখানে মেলা হয়।

মিথিলায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—

প্রাচীন কবি এবং ভক্তদের সম্বন্ধে বহু চমৎকার ও অলৌকিক গল্প শোনা যায়। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, জয়দেব, চন্ডীদাস, সুরদাস, তুলসী-দাস, কবীর, মীরা বাঈ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির নামে বহু অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে। কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধেও এর ব্যতিক্রম

হয়নি। এগুলি থেকে হয়ত' তাঁর জীবন ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে অনেক তথ্যের উপর আলোকসম্পাত হ'তে পারে। নিম্নে কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধৃত করা গেল।

(১) মিথিলায় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পরিচিত একটি গল্প এই যে, স্বয়ং শিব বিদ্যাপতির ভক্তিতে প্রসন্ন হ'য়ে তাঁর গৃহে ভৃত্যরূপে বাস ক'রতেন। এই ভৃত্যরূপ শিবের নাম ছিল 'উদ্‌না' অথবা 'উগ্‌না'। পরে শিব কবির কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু সর্ত্ত ছিল যে আর কারও কাছে এই কথা তিনি প্রকাশ করতে পাবেন না। একদিন সামান্য অপরাধে কবির স্ত্রী ঐ উগ্‌নাকে প্রহার করতে থাকায় কবি বিচলিত হ'য়ে উগ্‌নার পরিচয় প্রকাশ ক'রে ফেলায় উগ্‌না অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। কবি ক্ষোভে দুঃখে উন্মাদের ন্যায় হ'য়ে পড়েন।

"উদ (গ্) না হে মোর কতয় গেলা।

* * *

বিদ্যাপতি ভণ উদ (গ্) না সোঁ কাজ।
নহি হিতকর মোর ত্রিভুবন রাজ॥" ইত্যাদি।

এই ধরনের কয়েকটি পদে উগ্‌না বিহনে বিদ্যাপতির বিলাপ পাওয়া যায়। মিথিলায় অনেকের মুখেই এই গানগুলি শোনা যায়। বিদ্যাপতির জবানীতে এগুলি কার রচিত বলা কঠিন। সে অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস এগুলি সয়ং বিদ্যাপতি রচিত। কিন্তু সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। বাঙ্গলা দেশে যেমন চণ্ডীদাসের মৃত্যুতে রামির নামাঙ্কিত কয়েকটি বিলাপ সূচক পদ পাওয়া যায়, বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত এই পদগুলিও কতকটা ঐ ধরনের। (২) বিদ্যাপতির মৃত্যুকালে গঙ্গানদী কবির কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। (৩) কবিত্ব শক্তিতে সুলতানকে প্রসন্ন করে বিদ্যাপতি বন্দী শিবসিংহকে মুক্ত ক'রে এনেছিলেন। সুলতানের চিত্ত বিনোদনের জন্য তিনি যে পদটি রচনা ক'রেছিলেন বলে প্রবাদ আছে, তাতে রাধা-কৃষ্ণ অথবা অপর কোন দেবদেবীর নাম নেই। কবিতাটির ভণিতা এইরূপ,

"দস অবধান ভণ পুরুস পেম গুনি
প্রথম সমাগম ভেলা।
আলম সাহ পহু ভাবিনি ভজি রহু
কমলিনি ভ্রমর ভুললা॥"

(৪) বি. এন্. ডবল্যু রেলওয়ে পথ নির্ম্মাণের সময় কবির চিতার উপর যে গাছটি আছে তার শাখা ছেদন করায় রক্তপাত হয়। সেজন্য স্থানীয় অধিবাসীদের অনুরোধে রেলপথ কিছু ঘুরিয়ে একটু দূরে তৈরী হয়। (৫) বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র বিদ্যাপতির অতিথিশালায় অবস্থান কালে কবির সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা ও হাস্য পরিহাস। (৬) বাঙলা দেশে যেমন প্রাক্-তুর্কী আমল থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকমুখে প্রচলিত গ্রাম্য প্রবাদ-বাক্যগুলি ডাক ও খনার বচনে পরিণত হ'য়েছে, মিথিলাতেও তেমনি, বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তার জন্য, কতকগুলি অর্ব্বাচীন প্রবাদ বাক্য কবির নামাঙ্কিত হ'য়ে রয়েছে। যেমন,—

"ভণএ বিদ্যাপতি, সুনহ বাঁশক্ টোটা।
জেহন জেকর বাপ ম্যা, তেহন তেকর বেটা॥"

বঙ্গদেশে প্রচলিত জনশ্রুতি—

(১) বিদ্যাপতি ও রাণী লছিমা পরস্পরের প্রতি প্রেমানুরক্ত ছিলেন। (২) বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গঙ্গাতীরে মিলন হ'য়েছিল। এ বিষয়ে তিনটি পদ পাওয়া যায়। একটি পদ বিদ্যাপতির এবং একটি পদ রূপ-নারায়ণের নামাঙ্কিত। আর একটি পদের ভণিতায় রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহের নাম পাওয়া যায়। এই পদগুলি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণব দাস কর্ত্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রীপদ-কল্পতরুতে আছে। অনেকে মনে করেন এই প্রবাদ নিছক কবি-কল্পনা। (৩) ঈশান নাগর কৃত 'অদ্বৈত-প্রকাশ' গ্রন্থে বিদ্যাপতির সঙ্গে বৃদ্ধ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সাক্ষাৎ বর্ণিত হ'য়েছে। এই গ্রন্থটিকেও কেহ কেহ অপ্রামাণিক মনে করেন। (৪) গৌড়ের সম্রাট্ নসির শাহ বিদ্যাপতিকে সমাদর ক'রেছিলেন।

বিদ্যাপতির নাম ও উপাধি- -

(১) অভিনব জয়দেব অথবা নব-জয়দেব। (২) কবিশেখর ('কহ কবি-সেখর কী কর লাজ,. ... ' অথবা 'কবি সেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি... .' রাগতরঙ্গিণী)। (৩) কবিরঞ্জন ('চণ্ডীদাস কবিরঞ্জন মিলল ... ...' অথবা 'কহে কবিরঞ্জন সুন বরনারি, প্রেম-অমিঞারসে লুবধ মুরারি)। (৪) কবি-কণ্ঠহার ('ভনই বিদ্যাপতি কবি-কণ্ঠহার, কোটি হু ন ঘট দিবস-অভিসার'

অথবা 'ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার, রস বুঝ সিবসিংহ সিব অবতার')। (৫) কবিরাজ ('কহ বিদ্যাপতি সুনু কবিরাজ, আগি জারি পুণি আগিক কাজ'। এখানে বিদ্যাপতির উপনাম কবিরাজ অথবা তিনি অপর কবিকে সম্বোধন করে বল্‌ছেন সে অর্থ সুস্পষ্ট নয়)। (৬) দশ অবধান (দস অবধান ভন পুরুস পেম গুনি, প্রথম সমাগম ভেলা')। (৭) রাজপণ্ডিত ('বইরিহু এক অপরাধ ছেমিঅ রাজপণ্ডিত ভান অথবা 'সকল পাতক পাপ বিচ্যুতি রাজপণ্ডিত কৃতস্তুতি'.........)।

উপরোক্তগুলি ছাড়া আরও উপনাম শোনা যায়। কিন্তু যে উপনামগুলি পদের মধ্যে পাওয়া যায় না, সেগুলির উল্লেখ এখানে করা হ'ল না। তাম্রশাসনে 'অভিনব-জয়দেব' উপাধি দেখে অনুমান করা হয় যে, গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের গৌরবময় নামের অনুকরণে এই উপাধি মিথিলার রাজদরবার প্রদত্ত। শোনা যায়, 'দশ অবধান' উপাধি কবি দিল্লীর বাদশাহের নিকট লাভ করেছিলেন। আর আর উপনামগুলি কবে এবং কি ভাবে কবি পেয়েছিলেন তা জানা যায় না।

বিদ্যাপতির সম্প্রদায়--

বাঙগলা দেশে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিরূপে পরিচিত। মহাপ্রভু বিদ্যাপতির কাব্য-রস আস্বাদন ক'রে আনন্দিত হতেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবেই এ দেশে বিদ্যাপতির সমাদর যে কোন দেশের চেয়ে অনেক বেশী। তিনিও চণ্ডীদাসের ন্যায় নব-রসিকের অন্যতম প্রধান এবং বৈষ্ণব মহাজনরূপে বন্দিত হ'য়েছেন। বাঙগলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি তাঁর ভাবশিষ্য। কিন্তু বিদ্যাপতির স্বদেশে -মিথিলায়- শৈব-কবিরূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি। সেখানে লোকের মুখে মুখে এবং বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে কবির শিব-গীতিই প্রচলিত; রাধা-কৃষ্ণের পদ খুব কম শোনা যায়। এই শিব-সঙগীতে আমরা হর-গৌরীর বিবাহের যে চিত্র পাই তা কতকটা বঙগদেশে প্রচলিত শিবায়নের কাহিনীর শিব-বিবাহ অংশের সঙেগ মেলে। অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ, মহাশয় লিখেছেন,-- "রাধাকৃষ্ণ পদাবলীতে কবি যে রস-প্রবাহ বহাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার কাব্য প্রতিষ্ঠার মুখ্য অবলম্বন। কাব্য হিসাবে দেখিতে গেলে হর-গৌরীর-পদাবলীতে একটি মাত্র সুর--বুড়া শিব, জীর্ণ শীর্ণ বৃষভে আরূঢ় হইয়া নবনীতকোমল গৌরীকে বিবাহ করিতে চলিয়াছেন, আর গৌরীর মাতা মেনকা

তজ্জন্য আক্ষেপ করিতেছেন; অন্য রমণীরা শিবের দেহলগ্ন সাপের ফোঁস-ফোঁসানিতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছেন ইত্যাদি। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে।" কবির পৃষ্ঠপোষক রাজারা শিব ও শক্তি উপাসক ছিলেন। বিদ্যাপতির পূর্ব্ব-পুরুষগণও শিব ও শক্তির আরাধনা করতেন। তাঁদের কুলদেবী বিশ্বেশ্বরী এবং কবির প্রতিষ্ঠিত শিব বর্ত্তমান। তাঁর চিতার উপরও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। কবির একটি পদেও দেখা যায়, চন্দ্রাদি দেবগণ ও কমলাসন হরিকে পরিত্যাগ ক'রে তিনি ভক্তবৎসল বাণমহেশ্বরের শরণ নিয়ে তাঁর সেবার ভার গ্রহণ ক'রেছেন,—

"আন চানগণ হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভক্ত বছল প্রভু বান মহেসর
ঈ জানি কইলি তুঅ সেবা॥
বিদ্যাপতি ভন পুরহ হমর মন
ছাড়ও যমক তরাসে।
হরহ হমর দুখ তথিহু তোহর সুখ
সব হোয় তুঅ পরসাদে॥"

মিথিলার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, মধুবনীর সন্নিকটে হরিনগর গ্রাম নিবাসী, শ্রীযুত নিরসন মিশ্র মহাশয়কে বিদ্যাপতির সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন যে, বিদ্যাপতি পরম শৈব ছিলেন। উপাস্য দেব-দেবীর প্রণয়-লীলা বর্ণনা করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হওয়ায় বিদ্যাপতি তাঁর আরাধ্য দেবতা—মাতা-পিতা স্থানীয়—হর-গৌরীর পরিবর্ত্তে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অবলম্বন ক'রে শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য রচনা ক'রেছেন। কিন্তু পরম শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতজীর এই মত মেনে নেওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট বাধা আছে। বিদ্যাপতির হর-গৌরীর প্রণয়-মূলক শৃঙ্গার রসের পদও দুর্লভ নয়। যেমন,—

"জখনে হেরলি হরে তিনহু নয়নে।
তাহি অবসর গোরি পিড়লি মদনে॥
করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িআউ।
বিপুল পুলক তনু বসন ঝঁপাউ॥

ভল হর ভল গোরি ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দূর গেল মদন বিকারে॥
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাবে।
হর দরসনে গোরি মদন সঁতাবে॥"

তাছাড়া, কবির অন্তরে হরি-হরের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। একটি পদে তিনি লিখেছেন,—

"ভল হর ভল হরি ভল তুঅ কলা।
খন পিত বসন খনহি বঘছলা॥
খন পঞ্চানন খন ভুজ চারি।
খন সংকর খন দেব মুরারি॥
খন গোকুল ভএ চরাইঅ গায়।
খন ভিখি মাঁগিএ ডমর বজায়॥
খন গোবিন্দ ভএ লিঅ মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁখ বোকান॥
এক সরীর লেল দুই বাস।
খন বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত বানি।
ও নারায়ণ ও সুলপানি॥"

এই 'বিপরীত বাণী' কথাটি থেকে মনে হয়, সে সময়ে মিথিলার সমাজে হরি-হরের মধ্যে পার্থক্য করা হ'লেও কবির দৃষ্টিতে এই উভয় দেবতা অভিন্ন।

জয়দেব 'গীতগোবিন্দম্'এ যমুনাকূলে রাধা-মাধবের বিজন-কেলি-বিলাসকে উপলক্ষ্য ক'রে আদি রসের অবারিত স্রোত প্রবাহিত করলেও মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কৃষ্ণই ভগবান হরি এবং দশ-অবতার স্তোত্রে সেই ভগবান কেশবকে সভক্তি প্রণাম জানিয়েছেন। বিষ্ণুর দশ অবতারের সমন্বিত ও বিধিবদ্ধ রূপ সর্ব্বপ্রথম দেখা যায় গীতগোবিন্দেই। জয়দেবের গীতগোবিন্দে যে বিলাস-কলাপূর্ণ মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর সূচনা বিদ্যাপতির কবিতায় তারই পূর্ণতর বিকাশ। বিদ্যাপতিও রাধামাধবের শৃঙ্গার রসের কবিতা সৃষ্টির মাঝে মাঝে কৃষ্ণকে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে বর্ণনা ক'রেছেন এবং ঐশ্বর্য্য-ভাব মণ্ডিত জগৎ-তারণ ত্রিভুবন-নাথ মাধবকে ইষ্ট দেবতার ন্যায় বন্দনা ক'রেছেন। তাঁর প্রার্থনার পদগুলিতে ভক্ত বৈষ্ণবের

গভীর আত্মসমর্পণের সুর ধ্বনিত হয়। এখানে তাঁর প্রার্থনার একটি প্রসিদ্ধ পদ উদ্ধৃত করা হ'চ্ছে। এতে দেখা যাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁর হতে সাগর তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হ'য়ে পুনরায় তাঁর মধ্যেই বিলীন হ'য়ে যায় সেই মাধবকেই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা জেনে কবি তাঁর শরণ নিয়েছেন,—

তাতল সেকত বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণি সমাজ।
তোহে বিসরি মন তাহে সমরপল
অব মঝু হব কোন কাজ॥
মাধব, হম পরিণাম নিরাসা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহরি বিসবাসা॥
আধ জনম হম নিঁদে গমাওল
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবন রমণি-রভস-রঙ্গ মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুঅ আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥
ভনই বিদ্যাপতি সেস সমন ভয়
তুঅ বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কহাওসি অব
তারণ ভার তোহারা॥"

বিদ্যাপতি বৃদ্ধ বয়সে (লক্ষ্মণাব্দ ৩৪৯) সহস্তে ভাগবত নকল করেছিলেন। (তালপত্রে কবির স্বহস্ত লিখিত সটীক শ্রীমদ্ভাগবত বর্ত্তমানে সকরি রেল স্টেসন থেকে কয়েক মাইল দূরে তরৌণী গ্রামে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে সযত্নে রাখা আছে শোনা যায়।) এটিও কবির বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রীতিরই অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়। তাঁর রচিত ভক্তিরসের উৎস স্বরূপ রাধাকৃষ্ণের পদগুলিই শ্রেষ্ঠ ও প্রসাদগুণে ভরা। তাঁর পদাবলী ভাগবতের রসনির্ঝরে সিক্ত এবং প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রদীপ্ত। বিদ্যাপতি কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন এ

রহস্যের সমাধান করা বর্ত্তমান কালে কঠিন। তবে খুব সম্ভব তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষগণ শিব ও শক্তি উপাসক ছিলেন এবং তিনি নিজে ছিলেন পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। যেমন,—লিখনাবলীতে গণেশের, পুরুষপরীক্ষায় আদ্যাশক্তির, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে দুর্গার, শৈবসর্ব্বস্বসারে শিবের এবং দানবাক্যাবলীতে বিষ্ণুর বন্দনা পাওয়া যায়। তাঁর চক্ষে সমস্ত দেবতাই ছিলেন একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে কবির অন্তরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখেছেন,—"তিনি (বিদ্যাপতি) বাহিরে যাহাই থাকুন, তাঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুকূলে ছিল, এ কথা বোধ হয় দ্বিধাশূন্য হইয়া বলা যাইতে পারে"।

বিদ্যাপতি রচিত গ্রন্থাবলী—

কীর্ত্তিলতা অবহট্‌ঠ অথবা শৌরশেণী অপভ্রংশ ভাষায় গদ্য-পদ্যে রচিত। কীর্ত্তিপতাকা—অপভ্রংশ এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কীর্ত্তিকৌমুদী; ভূপরিক্রমা গরুড়নারায়ণ ওরফে রাজা দেবসিংহের আজ্ঞায় রচিত। পুরুষ-পরীক্ষা—এটি শিবসিংহের আদেশে লিখিত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ শ্রেণীর সংস্কৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গৌড়ের সঙ্গে গুজরাটের বাণিজ্য সম্পর্কের ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। বিভাগসার, রুক্মিণীসয়ম্বর, গয়াপত্তলক, বর্ষকৃত্য, উচিতী ও যোগ, মণিমঞ্জরী নাটিকা। শৈবসর্ব্বস্বসার ও গঙ্গাবাক্যা-বলী—এই গ্রন্থ দুটি পদ্মসিংহের মহিষী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞাক্রমে রচিত হয়েছিল। দানবাক্যাবলী-বীরসিংহের মহিষী ধীরমতির আজ্ঞায় রচিত। লিখনাবলী রাজা পুরাদিত্যের আজ্ঞায় রচিত। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রাজা দর্পনারায়ণের সুযোগ্য পুত্র যুবরাজ হরিনারায়ণ ওরফে ভৈরব সিংহের উৎসাহে কবি সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রাজা দর্পনারায়ণ আনুমানিক ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই গ্রন্থটিই সম্ভবত কবির শেষ রচনা। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া বিদ্যাপতি কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, গঙ্গা, প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রার্থনার কয়েকটি পদ এবং শৃঙ্গার রসাত্মক রাধা-কৃষ্ণের পদাবলী নিজ মাতৃভাষায় রচনা করেছিলেন।

বিদ্যাপতির ভাষা ও ব্রজবুলী—

বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কবির মাতৃভাষা ছিল মৈথিলি এবং তিনি বহু ভাষাবিৎ ছিলেন।

তবে আজকাল এক রকম প্রমাণিত হ'য়েছে যে, বিদ্যাপতি তৎকালীন মৈথিল ভাষায় পদ রচনা ক'রেছিলেন। কালক্রমে সেই পদগুলি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে কিছুটা স্থানীয় ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়েছে, যুগে যুগে অজ্ঞ লিপিকার ও কীর্ত্তন গায়কের মুখে রূপান্তরিত ও বিকৃত হয়েছে। আজকের দিনে এই পদগুলি সংশোধন করে আদি রূপটি ফিরিয়ে আনা দুরূহ। গ্রিয়ার্সন সাহেব, প্রাচীন পুঁথির অভাবে, খাস মিথিলায় লোকমুখে প্রচলিত যে ৮২টি পদ সংগ্রহ ক'রেছিলেন সেগুলিতেও যথেষ্ট পাঠ-বিকৃতি দেখা যায়। নেপালে সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথিতেও তরাই অঞ্চলের মোরঙ্গ ভাষার ছাপ বিদ্যমান। আর বাঙগলা দেশে বিদ্যাপতির যে পদগুলি প্রাচীন সঙ্কলন গ্রন্থ-গুলিতে পাওয়া যায়, সেগুলিতে মৈথিল, বাঙগলা ও সামান্য পশ্চিমা হিন্দীর মিশ্রণে এক অদ্ভুত রূপ দেখা যায়। এই রূপান্তরিত ভাষার নাম হ'য়েছে ব্রজবুলী। এই ভাষা কথ্য ভাষা নয়। ব্রজবুলী অর্থাৎ যে ভাষায় রাধাকৃষ্ণের ব্রজের লীলা বর্ণনা করা হ'য়েছে। এই ব্রজবুলী ভাষা কোথা থেকে এল? কেহ কেহ মনে করেন, ব্রজবুলী প্রাচীন মিথিলার—বুদ্ধদেবের সমকালের—বৃজ্জি নামে এক ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা। কিন্তু এই মত অলীক কল্পনা বলে পরিত্যক্ত হ'য়েছে। এই ভাষাকে মাগধী প্রাকৃতের রূপান্তরও বলা যায় না। আবার অনেকে যেমন ব্রজবুলীকে ব্রজধাম বা মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের ভাষা মনে করেছেন সে অনুমানও গ্রহণ যোগ্য নয়। এই ব্রজবুলী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,—"......বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় রচিত গান বাঙগালায় আইসে। ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত বাঙগালায় মিথিলায় বেশ যোগ ছিল। বাঙগালী বিদ্যার্থীরা মিথিলায় সংস্কৃত পড়িতে যাইতেন। মৈথিল গান বাঙগালীদের ভাল লাগায় তাঁহারা উহা গাহিতেন। কিন্তু মৈথিলের ব্যাকরণ-চর্চ্চা করিয়া ঐ গানগুলির ভাষা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কাহারও আবশ্যকতা ছিল না। ফলে বাঙগালীর মুখে অল্প কালের মধ্যে মৈথিলের বিশুদ্ধি রহিল না; মৈথিলে বাঙগালার সংমিশ্রণ ঘটিল এবং এই মিশ্র ভাষায় দুই চারিটী অবহট্‌ঠ ও পশ্চিমা-হিন্দীর রূপও আসিল। এই সংমিশ্রণে বিদ্যাপতির পদের যে রূপ দাঁড়াইল, তা না-মৈথিল-না-বাঙগালা। ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব-প্রভাবে যখন বিদ্যাপতির গানের আদর বাড়িয়া গেল, তখন বাঙগালা দেশের লোকের কাছে এই মিশ্র-ভাষার একটী নাম-করণ হইল;

ব্রজ-মণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা লইয়া এই পদ, এই জন্য ইহার নাম হইল "ব্রজবুলী"। তখন কেহ ইহার মৈথিল মূলের খোঁজ করেন নাই। পশ্চিমা-হিন্দীর রূপ-ভেদ ও মথুরা আগরা অঞ্চলে প্রচলিত 'ব্রজভাষা' হইতে এই ব্রজবুলী হিন্দী নয়, 'ব্রজভাষা'ই হিন্দী; 'ব্রজবুলী' প্রাকৃত-প্রভাবে জাত বাঙগালার রূপ-ভেদ নয়, ইহা মৈথিলি বাঙগালায় মিশাইয়া এক অতি সুমধুর সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা।"

যাই হোক, এই মিশ্র ভাষার কল্যাণে শুধু মিথিলাই নয় বাঙগলা ও অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও সমান ভাবে বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব কাব্যরস আস্বাদনের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করে। এবং এই অপরূপ ভাষার মিষ্টত্বে মুগ্ধ হ'য়ে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত, বাঙগলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি এই তথাকথিত ব্রজবুলী ভাষায় কবিতা রচনা ক'রেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলীতে এই ভাষার পুনঃ-প্রবর্ত্তন করেছিলেন। বাঙগালী পদকর্ত্তাদের মধ্যে যশোরাজ খানই সর্ব্বপ্রথম ব্রজবুলীতে পদ রচনা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রণেতা মালাধর বসুর কিছু পরবর্ত্তী। প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে বড়ু চণ্ডীদাসের বাঙগলা পদের পরেই যশোরাজ খানের ব্রজবুলী ভাষার পদ। নিম্নোদ্ধৃত পদটি কবির শ্রীকৃষ্ণমঙগল কাব্যে নিবদ্ধ ছিল এবং এইটি ব্রজবুলী পদের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

"এক পয়োধর চন্দন-লেপিত,
আর পয়োধর গোর।
হিম-ধরাধর কনক-ভূধর
কোরে মিলল জোর॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ-পদচারি করত সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে
চাঁদ পূজল কাম॥

শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান॥" (পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী গ্রন্থে উদ্ধৃত)

গৌড়াধিপতি সুলতান হোসেন শাহের* রাজত্বকালে এই পদটি সম্ভবত তাঁর কোন কর্ম্মচারী যশোরাজ খানের দ্বারা রচিত। হোসেন শাহের রাজত্ব কাল ১৪৯৩-১৫১৯ খৃীষ্টাব্দ। অতএব অনুমান করা যেতে পারে, এই পদটিও ঐ সময়ের মধ্যেই রচিত হ'য়েছিল। যশোরাজ খান্ শ্রীখন্ড নিবাসী এবং জাতিতে বৈদ্য ছিলেন; তাঁর কৌলিক উপাধি সেন।

## বিদ্যাপতি-চন্ডীদাস

"বিদ্যাপতির কবিতা স্বর্ণহার, চন্ডীদাসের কবিতা রুদ্রাক্ষমালা, বিদ্যাপতির গান মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকন্ঠগীতি, চন্ডীদাসের গান সায়াহ্ন-সমীরণের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস।" (বঙ্কিমচন্দ্র)

বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস গুরু স্থানীয়। উভয়েই সম-সাময়িক (?)। উভয়েই প্রবল প্রেরণায় ও প্রদীপ্ত প্রতিভায় শ্রীমদ্ভাগবতের

---

* অলাউ-দ্-দীন মুজফ্ফর হুসৈন শাহের রাজত্ব কাল বাঙলা দেশে স্মরণীয় যুগ। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে সুলতানদের দুর্ব্বলতার সুযোগে হাবসী ক্রীতদাসেরা প্রবল হ'য়ে বাঙলা দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করে। হোসেন শাহ দেশের লোকের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করে রাজ্যে শৃঙ্খলা আনেন। তাঁর সুশাসনে দেশে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপিত হয় এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হতে থাকে। তিনি রূপ, সনাতন, যশোরাজ খান প্রমুখ অনেক হিন্দু গুণী ব্যক্তিকে রাজ্যের উচ্চপদে নিয়োগ ক'রেছিলেন এবং বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির পোষকতা ক'রেছিলেন। তাঁর যশ বহুদূর বিস্তৃত হ'য়েছিল। হোসেন শাহ অভিজাত কুলোদ্ভব ছিলেন না। প্রথম জীবনে তিনি গৌড়-অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী রচিত চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখা যায়,—

"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী॥
দিঘী খোদাইতে তারে মন্সীব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো বহু বাড়াইল॥"

অপূর্ব্ব লীলা-মাধুরী লৌকিক ভাষায় বর্ণনা ক'রেছেন। উভয়েই বৈষ্ণব-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধুর রসাত্মক লীলামৃতের বিভিন্ন রসপর্য্যায়ের পদ রচনা ক'রেছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে এই কবিদ্বয়ের কাব্য-রস আস্বাদন ক'রে ভাবে বিভোর হ'তেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,--

"বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥"

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যে ভাবের দিক দিয়ে সমধর্ম্মিতা থাকলেও উভয়ের শ্রীরাধার চরিত্র চিত্রণ, দক্ষতা ও শিল্প-প্রতিভার মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট রয়েছে। চণ্ডীদাসের কাব্যে ভাবের গভীরতা বেশী, বিদ্যাপতির পদে ভাষার চাতুর্য্য ও ছন্দ-বিন্যাস অধিক। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্য আলোচনা ক'রলে মনে হয়, চণ্ডীদাসের কাব্য ভাবের রত্নাকর এবং বিদ্যাপতির কাব্য ভাষার তাজমহল। বিদ্যাপতি উচ্ছ্বসিত ও স্পন্দিত মহাসমুদ্রের উপরিভাগের মত উর্ম্মি-চঞ্চল, চণ্ডীদাস সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় গভীরতায় স্তব্ধ। বিদ্যাপতি আত্মবিহ্বল, চণ্ডীদাস আত্মসমাহিত। বিদ্যাপতির কাব্য যেন দেহ আর চণ্ডীদাসের কাব্য যেন প্রাণ। একে অপরকে অবলম্বন করে আছে। একে অপরের পরিপূরক বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

মিথিলার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজসভায় বসে বিদ্যাপতি যখন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ভাষা, ভাব, শব্দ, ছন্দ, এবং অলঙ্কারের খনি থেকে রত্নরাজি চয়ণ ক'রে অপূর্ব্ব চারুতার সঙ্গে একটির পর একটি শ্লোক সাজিয়ে শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি ও রূপ বর্ণনা করতে ব্যস্ত ছিলেন,--

"সৈসব জৌবন দরসন ভেল।
দুহুঁ পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
মদনক ভাব পহিল পরচার।
ভিন জন দেল ভীন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন অওক অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তহিক লেল॥

চরণ-চপল-গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতল জাব॥
নব কবিশেখর কি কহইতে পার।
ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার॥”

* * *

“হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥”

* * *

“নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥”

* * *

“লোচন জনু থির ভৃঙ্গ-আকার।
মধু-মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঙুক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন-ধনু॥”

* * *

“মাধব, কি কহব সুন্দরি রূপে।
কতেক জতন বিহি আনি সমারল
দেখলি নয়ন সরূপে॥
পল্লবরাজ চরণ-জুগ সোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনক-কদলি পর সিংহ সমারল
তাপর মেরু সমানে॥
মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি
তৈঁ নহি কমল সুখাঈ॥”

* * *

সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝে কাল-ভুজঙ্গিনি
শ্রীযুত-খঞ্জন-খেলা॥
নাভি-বিবর সঞে লোম-লতাবলি
ভুজগি নিশ্বাস-পিয়াসা।
নাসা-খগপতি-চঞ্চু-ভরম-ভয়ে
কুচ-গিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবনে
অবধি রহল দউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহারি নয়ানে॥"

তখন এদিকে চণ্ডীদাস অল্পকথায় সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগের যে সুন্দর সর্ব্বত্যাগী গরিমাময় মূর্ত্তিটি ফুটিয়ে তুলছিলেন তা সত্যই অপূর্ব্ব,—

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে,
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পৈহ্রে
যেন যোগিনীর পারা॥"

বিদ্যাপতি সংস্কৃত রস-শাস্ত্রের আদর্শে ধীরে ধীরে বয়ঃসন্ধির কিশোরী চঞ্চলা রাধিকাকে শব্দ-তুলিকাস্পর্শে বিবিধ বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, মান প্রভৃতি প্রতিটি স্তরে 'মুগ্ধা' ও 'মধ্যাবস্থা'র নায়িকারূপে চিত্রিত ক'রতে ক'রতে বিরহ ও ভাবসম্মিলনে 'প্রগল্ভা' দশায় 'শাশ্বত রসিকচিত্ত-বলভীর প্রৌঢ় পারাবতী' এবং পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণব সাহিত্যের 'মহাভাবস্বরূপিণী' শ্রীরাধায় পরিণত ক'রেছেন। তখন কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে প্রিয়তমের বিরহে রাধার,—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥"

শ্রীমতী বলেন,—

"নয়ানক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সংগ দুখ মঝু পাস॥"

তাইতো রাধার,—

"জীবন লাগ মরণ সম,
মরণ সোহাবন রে।"

তারপর অনুক্ষণ প্রিয়তমের চিন্তায় বিভোরা রাধিকাকে দিব্যোন্মাদের দশায় দেখি,—

"অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মাধাই।"

বিদ্যাপতির গানের যেখানে শেষ, প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের সেখানে আরম্ভ। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা যেন 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' পরিণত নায়িকারূপে কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা। তিনি আজন্ম কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। কৃষ্ণের চিত্র দর্শনে রাধা মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েন। তারপর মধুর কৃষ্ণনাম শুনে তিনি বলে ওঠেন,—

"সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

শুধু তাই নয়, রাধা বলেন,—

"শুনগো মরম সই।
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই॥"

তারপর কৃষ্ণ এসে তাঁকে স্পর্শ করা মাত্র সদ্যোজাতা রাধিকা চোখ মেলে চেয়েছিলেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদে অমিল শুধু ভাব ও বর্ণনায়, ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায় নয়, রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতেও।

বিদ্যাপতি সৌন্দর্য্য পিয়াসী শিল্পীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে লীলাময়ী রাধাকে দেখেছেন, আর, চণ্ডীদাস সাধকের গভীরতা ও তন্ময়তা নিয়ে যোগমগ্না রাধিকাকে উপস্থিত ক'রেছেন। চণ্ডীদাসের হাতে ছিল বৈরাগীর একতারা—

তার সুর যেমন উদাস, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। আর বিদ্যাপতির করায়ত্ত ছিল সপ্ততন্ত্রী বীণা—বহু বিচিত্র সুর-তরঙ্গের মাদকতায় তা ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে।

উপমা-প্রয়োগ-নৈপুণ্য বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাপতির এই বৈশিষ্ট্যের মূলে মহাকবি কালিদাসের দান উপেক্ষণীয় নয়। এতে একদিকে যেমন তাঁর বক্তব্য ও ভাব স্পষ্ট, রসস্নিগ্ধ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হ'য়েছে, অপরদিকে তেমনি সর্ব্বদা প্রশংসার্হ হয়নি। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের গভীরতাকে উপমার সাহায্যে বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,—

> "টুটইতে নহি টুটে প্রেম অদভূত।
> জৈসন বাঢ়এ মৃণালক সুত॥"

চণ্ডীদাস কিন্তু উপমার বিশেষ পক্ষপাতী নন্। উপমা দিয়ে তিনি বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর অনুপম প্রেমকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে খর্ব্ব করেন নি, কারণ সে প্রেমের যে তুলনা নেই।

> "এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
> পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
> দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
> তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
> জল বিনে মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
> মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
> ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
> হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
> চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
> সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
> কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
> না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
> কি ছার চকোর চাঁদ—দুহুঁ সম নহে।
> ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥"

গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের ন্যায় বিদ্যাপতির রাধার দেহের অংশ অধিক, হৃদয়ের অংশ কম। উভয়েই আড়ম্বরপূর্ণ রাজদরবারের ছত্রচ্ছায়ায়

কাব্য রচনা ক'রেছেন। বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদে রাধার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। সেখানে কামিনী, ধনী, নাগরী, সুন্দরী প্রভৃতি কথা ব্যবহৃত হ'য়েছে। আবার অনেক জায়গায় রাধা-কৃষ্ণ উপলক্ষ্য মাত্র—আদিরসাত্মক বর্ণনা এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কবির প্রধান লক্ষ্য। চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতির রাধা সর্ব্বত্র বৃন্দাবনের রাধা নন্; শাশ্বত কালের কলা-কুতূহলপূর্ণা রহস্যময়ী নায়িকার নিখুঁত প্রতিমূর্ত্তিটি তাঁর রাধার ছদ্মবেশে যাওয়া আসা করে। "বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক-অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।......আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না।...... বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে।......কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।" (রবীন্দ্রনাথ)

"বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক। এইজন্য ছন্দ সংগীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য-সুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা।" (রবীন্দ্রনাথ)

বিদ্যাপতির প্রেমে বেদনার চেয়ে বিলাস বেশী - গভীরতার চেয়ে প্রসারতা অধিক। 'চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।' চণ্ডীদাস অন্তর এবং বিদ্যাপতি বাহির। বিদ্যাপতির রাধা ('ভাবোল্লাস'এ) বলেন,—

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়-কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥

কদলি রোপব হাম গরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণি সুঝম্প॥
নিশি দিশি আনব কামিনি ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদকি হাট॥"

*　　　১　　　*

"আলিপন দেওব মোতিম-হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচ-ভার॥
সহকার-পল্লব চুচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি॥
ধূপ দিপ নৈবেদ্য করব পিয়া-আগে।
লোচন-লোরে করব অভিষেকে॥"

রাধা এখানে যৌবনলাবণ্যময় ললিতদেহের সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে অধীরভাবে প্রিয়-মিলনের প্রতীক্ষা ক'রে আছেন। কবি চমৎকার ছবিটি এঁকেছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্‌ভ্রান্ত বাহ্যসৌন্দর্য্যের উপচার ও বাসরশয্যাতেই প্রেমের পরম গৌরব, চরম সৌন্দর্য্য নেই। অপর দিকে চণ্ডীদাসের রাধা মদন বিকারকে 'বেদনার হোম-বহ্নি'তে দগ্ধ ক'রে সার্থক প্রেমের প্রতীক্ষা ক'রে আছেন, -

"আমার বাহির দুয়ারে　　কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া　　আয় লো সজনি
আঁধার পেরিয়া আলা॥"

'ভাব-সম্মিলনে' বিদ্যাপতির নবীনা চপলা রাধার কণ্ঠে আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে বেজে উঠল',-

আজু রজনি হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
 আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকুল হোয়ল
 টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
 লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
 মলয় পবন বহু মন্দা॥
অবহন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত
 তবহুঁ মানব নিজ দেহা।"

ঠিক সেই সময়ে, বিরহান্তে মিলনে, চণ্ডীদাসের বৈরাগিনী প্রেম-প্রৌঢ়া রাধা অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা নিয়ে কৃষ্ণকে সম্বোধন ক'রে বলেন,—

"বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা-নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম ক্রোড়ে॥"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা মূলক আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতি অনুরাগ।"

চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও ভাব-সম্মিলন এবং বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি, রূপবর্ণনা, প্রেম-বৈচিত্র্য, মান, ভাবোল্লাস, বিরহ-মাথুর ও প্রার্থনার পদের সমকক্ষ গীতি-কবিতা শুধু ভারতীয় সাহিত্যে কেন বিশ্ব-সাহিত্যেও দুর্লভ। চণ্ডীদাসের সরলতা, আন্তরিকতা ও ভাবগভীরতা যেমন বিদ্যাপতির মধ্যে পাওয়া যায় না, তেমনি আবার বিদ্যাপতির পদগুলির সূক্ষ্ম শিল্প-চাতুর্য ও অপূর্ব্ব সংগীত লহরী চণ্ডীদাসের মধ্যে পাওয়া যায় না। পূর্ণতার দিক দিয়ে উভয়েই তুল্য মর্য্যাদা লাভের অধিকারী।

বিদ্যাপতির নব নব ভাবোল্লাসের শেষ ও সেই সংগে অশেষ কথা,—

"সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নিহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।

*　　　*　　　*

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়ে জুড়ন না গেলি॥"

আর, পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমের মোহানায় দাঁড়িয়ে চণ্ডীদাস (আক্ষেপানুরাগে) প্রেম সম্বন্ধে তাঁর শেষ কথা বলে গেছেন,

"চণ্ডীদাস বাণী　　　শুন বিনোদিনি,
পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া　　　পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা॥"

**জ্ঞানদাস**

জ্ঞানদাসের পরিচয় সামান্যই জানা যায়। সিউড়ী ও কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী কাঁদড়া গ্রামে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণকুলে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। এই কাঁদড়া গ্রাম বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত এবং কাটোয়া মহকুমা ও কেটি থানার অধীন। জ্ঞানদাস পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস ও বলরামদাস এবং 'পদসমুদ্র' সংকলন-

কর্ত্তা মনোহরদাসের সমসাময়িক। জ্ঞানদাস ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত খেতুরীর বিখ্যাত মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন, এ বিষয়ে সমকালীন গ্রন্থাদিতে সাক্ষ্য আছে। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর কাছে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতএব তিনি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। তিনি ছিলেন একাধারে সাধক ও কবি। তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে তাপসের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মন্দির বর্ত্তমান। পৌষ মাসে পূর্ণিমায় সেখানে প্রতি বৎসর উৎসব ও মেলা হয়।

শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী অপরাপর বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের ন্যায় জ্ঞানদাসও মহাপ্রভুর 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' অপরূপ প্রেমমূর্ত্তিখানিকে আদর্শ ক'রে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার চিত্র অঙ্কন ক'রেছেন। তাই তাঁর পদগুলিতে গভীর আধ্যাত্মিকতার সুর ধ্বনিত হয়।

জ্ঞানদাস চন্ডীদাসের ভাষার স্বল্পতা ও ভাবগভীরতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন এবং তিনি চন্ডীদাসের অনুগামীদের মধ্যে অগ্রণী। ব্রজবুলী পদে বিশেষ দখল থাকলেও তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসপ্রধান বাঙলা পদগুলিই অধিকতর প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর। চন্ডীদাসের ন্যায় রচনা ও ভাবের সরলতা ও স্বাভাবিকতায় জ্ঞানদাস তাঁর কাব্যে এমন গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ ক'রেছেন যা সহজেই মর্ম্মস্পর্শ করে।

আক্ষেপানুরাগের,—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥"

অথবা বিপ্রলব্ধ বা খন্ডিতার,—

"সই, কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙিগনা দিয়া॥"

প্রভৃতি জ্ঞানদাসের কতকগুলি প্রসিদ্ধ পদ চন্ডীদাসের ভণিতাযুক্তভাবেও পাওয়া যায়। ভাষা, ভাব, আবেগ ও সুর-সামঞ্জস্যের জন্যই এরূপ লিপিকার-প্রমাদ হ'য়ে থাকবে। তাছাড়া, কীর্ত্তন-গায়ক ও লিপিকরগণ ইচ্ছাকৃতভাবে

গোলযোগ ক'রে জ্ঞানদাসের অনেক উৎকৃষ্ট পদ চণ্ডীদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছেন,—এরূপ সন্দেহ করারও কারণ আছে।

চণ্ডীদাসের মতই জ্ঞানদাসের রাধাও কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী বা অপর কোন নায়িকার কুঞ্জে গেছেন সন্দেহ ক'রে, সেই নায়িকার উদ্দেশ্যে অন্য কোন অভিসম্পাত না দিয়ে, শুধু এইটুকু বল্‌ছেন,—

"বন্ধুর হিয়া এমন করিল
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন—
এমনি হউক সে॥"

এর চেয়ে বড় অভিসম্পাত চণ্ডীদাসের বা জ্ঞানদাসের রাধার জানা নেই।

জ্ঞানদাস কোথাও কোথাও প্রেমকে বোঝাতে গিয়ে উপমা ব্যবহার ক'রেছেন। যেমন রসোদ্গারে,—

"সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম॥"

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের মতই বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর অসীম প্রেমকে তুলনার গণ্ডীতে ছোট ক'রে রাখতে না পেরে বলেছেন,—

"জাগিতে ঘুমাইতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরিতি
আর কি জগতে আছে॥"

জ্ঞানদাসের বয়ঃসন্ধির ও পূর্ব্বরাগের কয়েকটি পদে বিদ্যাপতিরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন (বয়ঃসন্ধির)—

"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচকাই॥"

এই পদের প্রথম দুই পংক্তি বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদেও পাওয়া যায়।

জ্ঞানদাসের কোন কোন পদে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির প্রভাব থাকলেও পূর্ব্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, মান, নিবেদন ও মুরলীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক পদগুলিতে তিনি নিজস্ব সৃজনী-প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন। এই সমস্ত পর্য্যায়ের পদে চৈতন্যোত্তর কালের আর কোন বৈষ্ণব কবি তাঁর সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন না।

পূর্ব্বরাগে,—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

আক্ষেপানুরাগে,—

"বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ সেখানে রাখিয়া দিব।"

মানে,—

"সুন্দরি, কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহার চরণ ধরি শপথ করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥"

শ্রীরাধার নিবেদনে,—

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।"

কিম্বা, উভয়ের নিবেদনে,—

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননেতে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥

* * *

তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।"

এই পদগুলিতে সহজ কথায় অন্তরের যে সর্ব্বত্যাগী গভীর প্রেম প্রকাশিত হ'য়েছে তার সমকক্ষ কবিতা সহস্রপাদ বৈষ্ণব পদাবলীতেও দুর্লভ।

নিম্নে জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদ উদ্ধৃত করা হ'ল। এই পদটিতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই বাঁশিটী বাজাতে শিখতে চাইছেন, যে মুরলীর ধ্বনির ইন্দ্রজালে অসম্ভব সম্ভব হয়, অকাল বসন্ত দেখা দেয়, আর তার অপরূপ সুরের আহ্বানে মুগ্ধা-কুরঙ্গীর ন্যায় রাধা স্বয়ং আত্মবিস্মৃতা হ'য়ে সমাজ-সংসার ইহকাল-পরকাল বিসর্জ্জন দিয়ে ঐ অপূর্ব্ব সুর-স্রষ্টার পদতলে নিজেকে উৎসর্গ করার দুর্নিবার আকুলতা নিয়ে ছুটে আসেন।

"মুরলী করাও উপদেশ।

কোন্ রন্ধ্রে কোন ধ্বনি বাজে জানাহ বিশেষ—
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটেহে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে-ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহএ হাসি হাসি—
'রাধে মোর' বোল বাজিবেক বাশী॥"

অমর্ত্ত্যলোকের এই বাশীর আহ্বান আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হ'য়ে চলেছে। কোন এক অসতর্ক পরম মুহূর্ত্তে যখন এর সুর মানবাত্মার মরমে পশে তখন তাকে সমস্ত বন্ধন ভয় কাটিয়ে সেই চিরসুন্দরের দুস্তর অভিসারে যেতেই হয়।

## গোবিন্দদাস

"ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি' দরবে শিলা—
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্ব-গুণ,
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥"

পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্বন্ধে কবি বল্লভদাসের এই উক্তিটি অতিশয়োক্তিত ত' নয়ই বরং ভাবের গভীরতা, ভাষার চারুতা, শব্দ-সঙ্গীতের মাধুর্য্য, ছন্দ ও অলঙ্কারের পারিপাট্য এবং অননুকরণীয় প্রসাধন-কলা-সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, গোবিন্দদাস অনেকাংশে বিদ্যাপতির চেয়েও শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতির পদে অনুভবের গাঢ়তা ও উদ্দীপনা বেশী কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে আত্মত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক। যে দৃঢ়তা, পবিত্রতা, সুগভীর তন্ময়তা ও বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা বৈষ্ণব প্রেম-কাব্যের প্রথম ও প্রধান গুণ গোবিন্দদাসের কাব্যে তা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। এইদিক দিয়ে বিচার ক'রলে শুধু বিদ্যাপতিই নয়, সকল বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যেই তিনি নিঃসন্দেহ প্রাধান্য লাভ ক'রবেন।

বিদ্যাপতির রচনার সঙ্গে কালিদাসের রচনার সাদৃশ্য আছে। গোবিন্দদাসের কাব্য মাঘ ও শ্রীহর্ষের লক্ষণাক্রান্ত।

গোবিন্দদাসের আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইনি চৈতন্যদেবের সহচর, কুমারনগর নিবাসী চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈদ্য জাতীয়, চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। কবির মাতার নাম সুনন্দা। কবির পত্নীর নাম মহামায়া এবং পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। গোবিন্দদাসের মাতামহ ছিলেন বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নিবাসী, ষোড়শ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত কবি, দামোদর সেন। দামোদর সম্বন্ধে গোবিন্দদাস সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'সঙ্গীত-মাধব'এ লিখেছেন,—

"পাতালে বাসুকির্ব্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥"

ভক্তিরত্নাকরেও উল্লিখিত হ'য়েছে,—

"দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেহোঁ মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥"

গোবিন্দদাসের অগ্রজের নাম রামচন্দ্র। ইনি বিখ্যাত চিকিৎসক এবং ঐ যুগের একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হ'য়ে তাঁকে সাদরে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রতে সাহায্য করেন। রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছিলেন এবং তিনি খেতুরীর নরোত্তমদাস ঠাকুরের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন।

গোবিন্দদাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মাতামহের প্রভাবে ইনি প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিব-শক্তি উপাসক ছিলেন। সে সময়েও তিনি পদ রচনা ক'রতেন। সে সময়ে রচিত অর্দ্ধনারীশ্বরের বর্ণনামূলক একটি পদের ভণিতা এই রকম,—

"ন দেব কামুক ন দেব কামুকী
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরীশঙ্কর-- চরণকিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস॥" (প্রেমবিলাস)

কবি এর পর শাক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং গুরুর আদেশে জীবনের অবশিষ্ট কাল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনায় যাপন করেন। তিনি এজন্য বৈষ্ণব সমাজের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কবিত্ব-শক্তিতে প্রীত হ'য়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। কবির পদগুলিতে মুগ্ধ হ'য়ে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্র এবং বৃন্দাবনস্থ ষট্-গোস্বামীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে পরম সমাদর ক'রতেন। গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠকালে কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে মীমাংসার জন্য শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে পত্র ব্যবহার ক'রতেন এবং নূতন পদগুলি রচনা ক'রে বৃন্দাবনে তাঁর নিকট বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃতির জন্য প্রেরণ ক'রতেন। এই পত্রগুলির একটিতে শ্রীজীব কবিকে লিখেছিলেন,—"সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনাময়স্বীয়গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বমপি যানি, তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তাবর্ত্তামহে। পুনরপি নূতন তত্তদাশয়া মহুবতৃপ্তিণ্ড লভামহে।"

বৈষ্ণবদ্বেষী রক্ষণশীল সমাজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের অভিলাষে, রামচন্দ্র এবং গোবিন্দদাস পৈতৃক বাসস্থান কুমার-নগর পরিত্যাগ ক'রে খেতুরীর সন্নিকটে তেলিয়াবুধরি গ্রামে বাস করেন। এই

গ্রামে কবি শেষ জীবনে স্বরচিত পদগুলি নির্ব্বাচনে ব্যস্ত ছিলেন। ভক্তি-রত্নাকরের চতুর্দ্দশ তরঙ্গে উল্লেখ আছে—

"নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদরত্ন গনে।
করেন একত্র অতি উল্লাসিত মনে॥"

গোবিন্দদাস রচিত প্রায় সাড়ে পাঁচ শতেরও অধিক পদ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। শোনা যায়, তিনি একবার পশ্চিমে তীর্থযাত্রা ক'রে গৃহে ফেরার পথে বিদ্যাপতির নিবাস স্থান বিস্‌ফী গ্রামে গমন ক'রে বিদ্যাপতির অনেক পদ সংগ্রহ ক'রেছিলেন। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনেক অসম্পূর্ণ পদের পাদ-পূরণ ক'রে দিয়েছিলেন। যেমন, 'বেনন সঞে যব বসন উতারলুঁ' এই পদটি অসম্পূর্ণ পেয়ে শেষাংশ সংযোজিত ক'রেছিলেন,—

"এত কহি বিষাদ ভাবি রহুঁ মাধব
রাই-প্রেমে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর॥"

আবার কোন কোন পদে বিদ্যাপতির ভণিতার পরে স্বীয় ভণিতা যোগ দিয়ে বিদ্যাপতির পদের উত্তর দিয়েছিলেন। যেমন,—

"বিদ্যাপতি কহ— নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর॥"

পদাবলী ছাড়া গোবিন্দদাস সংস্কৃত ভাষায় 'সঙ্গীত-মাধব' নামে নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামে একখানি কাব্য রচনা ক'রেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কোন সময়ে প্রায় ৭৬ বৎসর বয়সে গোবিন্দদাসের তিরোভাব ঘটে।

অধুনা গোবিন্দদাস কবিরাজের ব্রজবুলী পদগুলি বর্ত্তমান দ্বার-বঙ্গাধিপের পূর্ব্বপুরুষ মৈথিল-কবি গোবিন্দদাস ঝা (ঠাকুর) এর নামে প্রচার করার ব্যর্থ প্রয়াস দেখা দিয়েছে। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ১৩৩১ সালের 'বসুমতী' পত্রিকার কার্ত্তিকের সংখ্যায় 'মিথিলার কবি গোবিন্দদাস' শীর্ষক প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাস কবিরাজের উৎকৃষ্ট পদগুলি মিথিলার কবির রচিত বলে প্রমাণ

করার বৃথা চেষ্টা করেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩৩৩ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় এবং তাঁর সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে নগেন্দ্রবাবুর ভ্রান্ত মত যুক্তি দ্বারা একে একে খণ্ডন ক'রেছেন। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর উক্ত প্রবন্ধের সুযোগ নিয়ে মিথিলার কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি গোবিন্দদাস কবিরাজের শ্রেষ্ঠ পদগুলি মৈথিল কবির রচিত বলে দাবী করেছেন। এবং কেহ কেহ গোবিন্দদাস কবিরাজকেই মৈথিল বলে প্রমাণ করার জন্য তৎপর হ'য়ে উঠেছেন। দ্বারভাঙগা জেলার শুভংকরপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভোলা ঝা কর্ত্তৃক মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে সংকলিত 'মিথিলা-গীত-সংগ্রহ' পুস্তকে গোবিন্দদাস কবিরাজের কয়েকটি পদ সংগৃহীত হ'য়েছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন ভাইস্-চান্সেলার মহামহোপাধ্যায় ডক্টর ৺গঙগানাথ ঝা মহাশয় তাঁর সম্পাদিত 'গোবিন্দ-গীতাবলী'তে বাঙগালী কবি গোবিন্দদাস কবিরাজের কতকগুলি পদ মৈথিল কবি গোবিন্দের নামে প্রচার করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৈথিলি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বাবুয়াজী মিশ্র জ্যোতিষাচার্য্য মহাশয়ও একদিন আলোচনা প্রসঙেগ আমাদের কাছে মন্তব্য করেন, "তোমরা তো আমাদের মৈথিল কবি গোবিন্দদাসকে চুরি ক'রে বাঙগালী বলে চালিয়েছ"।

বঙগদেশে গোবিন্দ নামধারী একাধিক (গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দদাস কবিরাজ) পদকর্ত্তা ছিলেন। মিথিলাতেও ঐ নামের কবি থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কিন্তু বাঙগলা ও ব্রজবুলী ভাষায় পদকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস কবিরাজ যে বাঙগালী ছিলেন সে সম্বন্ধে সংশয় মাত্র নেই। ভক্তি-রত্নাকর, ভক্তমাল, প্রেমবিলাস, সারাবলী, অনুরাগবল্লী, শ্রীনিবাসচরিত, মুক্তা-চরিত, নরোত্তমবিলাস, কর্ণানন্দরস প্রভৃতি গ্রন্থে গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। গৌর-পদ-তরঙিগণী ও পদকল্পতরুতে নরহরি চক্রবর্ত্তী, বল্লভদাস ও বৈষ্ণবদাস রচিত গোবিন্দদাস কবিরাজের বন্দনার পদ পাওয়া যায়। তাছাড়া, বঙগীয় পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে একমাত্র বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কোন মৈথিল কবির পদ স্থান লাভ করেনি। মহাপ্রভু বিদ্যাপতির পদ গান করতে ও শ্রবণ ক'রতে ভালবাসতেন সেই জন্যই তাঁর পদগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দ্বারা সাদরে সংগৃহীত হ'য়ে কালের কবল হতে রক্ষা পেয়েছে। গোবিন্দদাস কবিরাজ রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত বিদগ্ধমাধব নাটক, উদ্ধব-সন্দেশ ও হংসদূত কাব্য এবং উজ্জ্বলনীলমণি অলঙকার গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকের তাৎপর্য্যানুবাদ ক'রেছেন এবং রূপ গোস্বামীর অলঙকার শাস্ত্র

প্রদর্শিত পথে কাব্য রচনা ক'রেছেন। মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শ্রীরাধার সখী বা সখীর অনুগারূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করা। গোবিন্দদাসের সমস্ত পদগুলিতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই বিশেষত্ব প্রকাশিত হ'য়েছে। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদে কবি সয়ং সখী বা সখীর অনুগারূপে শ্রীরাধা-মাধবের নিভৃত-লীলায় সেবা করার ভার গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর 'দাস' পদবীও বৈষ্ণব-সুলভ অকিঞ্চনতা জ্ঞাপক। এ সমস্তগুলিই কবির বাঙ্গালীত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্বই প্রমাণ করে।

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর কালের কবি। সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেবের দেবোপম চরিত্রের প্রভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব তাঁর রাধাকৃষ্ণের চরিত্রে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস লিখেছেন,—

"'রা' কহি 'ধা' পহু কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি লোটাই ধরণী পুনি
কো কহ আরতি ওর॥"

এই পদে যে চিত্রটি আমরা পাই সেটি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা নবদ্বীপ-চন্দ্র শ্রীচৈতন্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বেশী। অথবা,

"আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া -
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া।"

শ্রীরাধার এই চিত্রটি মহাপ্রভুর 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' প্রেমমূর্ত্তির ছায়া পাতে অঙ্কিত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদে প্রেমেরই প্রাধান্য। প্রেম ছাড়া কথা নেই- প্রেম ভিন্ন অন্য ভাব নেই। কিন্তু গোবিন্দদাসের কবিতায় প্রেমের সঙ্গে মিশেছে ভক্তি। চৈতন্যোত্তর যুগের সকল পদকর্ত্তার কাব্যেই এই লক্ষণ অল্প-বিস্তর দেখা যায়। তাঁরা এই সত্যটি উপলব্ধি ক'রেছিলেন যে, নারীর প্রেম স্বাভাবিক চরম পরিণামে ভক্তি ও পূজায় এসে ঠেকে। গোবিন্দদাসের রাধা বলছেন,—

"যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥"

যে-স্থানের উপর দিয়ে প্রভু চরণ ফেলে চলে যান, আমার দেহ যেন সেই স্থানের মাটি হ'য়ে থেকে তাঁর চরণ-স্পর্শ লাভে ধন্য হয়। শ্রীরাধার এই ঐকান্তিক কামনা, সংসারের আবিলতায় ভরা ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়ার বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, বৃহৎ উপাসনার আকারে অনন্তের দিকে উৎসারিত হ'য়েছে।

গোবিন্দদাস মুখ্যত রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলা বিষয়ক পদ রচনায় অধিক যত্নবান হ'য়েছেন এবং এই রচনার জন্য তিনি উজ্জ্বলনীলমণিকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সুমধুর ব্রজবুলী পদ রচনায় অগ্রণী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও কাব্য থেকে তিনি বহু উপকরণ সংগ্রহ ক'রেছিলেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অনুপ্রাস ও শ্লেষের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বাগ্‌বিন্যাসের গাঢ়বন্ধতায়, ভাব-বৈচিত্র্যে এবং অপরূপ পদ-লালিত্যে ও ছন্দ-মাধুর্য্যে গোবিন্দদাসের কাব্য নিখুঁত শিল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নিম্নে গোবিন্দদাসের ঋতু-উৎসব (শরৎকালীয় পূর্ণিমায় মহারাস উপলক্ষ্যে অভিসার) বর্ণনার শব্দ-চিত্রময় ছন্দোসংগীতের অপূর্ব্ব কলাকৌশল ও শিল্পের চারুতার নিদর্শনস্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হ'ল,—

"শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত-মধুকর-ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত চোরণি॥
শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল ডোলনি॥

শিথিল-ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি।
ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুল-চন্দ
গোবিন্দদাস গাওনি॥"

সন্দেহ নেই, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুবর্ত্তী ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিলেন। কিন্তু সম্যক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রচনার লালিত্যে, ভাবের প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনায় ও ছন্দের ঝঙ্কারে, শ্রুতিমধুর ব্রজবুলী মাত্রা-ছন্দের সঙ্গে প্রচুর তৎসম ও তদ্ভব শব্দ, অনুপ্রাস যমক শ্লেষাদি বিবিধ বিচিত্র অলঙ্কার সম্ভারে মণ্ডিত হ'য়ে তাঁর কাব্য ভাষার গতি ও ভাবের দ্যুতিতে বিদ্যাপতির কাব্যকে অতিক্রম ক'রেছে। চরিত্র চিত্রণ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি অপেক্ষা নিপুণ চিত্রকর। উভয় কবির বিরহ-খণ্ডের রাধিকাকে দেখা যাক্। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবেন, বিরহের সম্ভাবনাতে বিদ্যাপতির রাধা বলেন,—

"জকর পরশ-বিসলেষ জর আগি।
হৃদয়ক মৃগমদ শোভ নহি লাগি॥
সে জদি দূরহি করতহি বাস।
হা হরি সুনতহি লাগ তরাস॥"

পদটিতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু রাধা এখানে যথেষ্ট পরিমাণে সজীব ও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠতে পারেন নি এবং এই বেদনাও যেন হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উত্থিত হয়নি,—এ যেন বিরহের একটা বিলাস। কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধা আসন্ন-বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে যখন কেঁদে ওঠেন,—

"যাহুক লাগি গুরুগঞ্জনে মন রঞ্জনু
দুরজনে কিয়ে নাহি কেল।
যাহুক লাগি কুলবতী বরত সমাপল,
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥

সজনি, জানলুঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি—
শুনইতে নহি বহিরান॥"

বিরহিণীর সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করা এই সকরুণ ক্রন্দন, এই দুঃসহ বেদনা অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ ক'রে আলোড়িত ক'রে তোলে। এর পিছনে হৃদয়ের এমন একটা সত্যকার আ-বেগ আছে, যার প্রবল স্পন্দন দুর্নিবার বেগে বিশ্ব-স্পন্দনের সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে যেতে চেয়েছে।

সখীর নিষেধ না শুনে, অবিবেচনার কার্য্য ক'রে, রাধা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয় নিবেদন ক'রেছেন। পরপুরুষের প্রতি কুলাঙ্গনার প্রেমে এই প্রাণান্তকর যাতনা দেখে সখী রাধাকে বল্‌ছেন,—

"শুনইতে কানু মুরলি-রব-মাধুরি
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়বি
জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি
জিবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সীঁচহ
কহতহি গোবিন্দ দাসে॥"

একটু লক্ষ্য ক'রলেই দেখা যায়, বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে এক একজন কবি এক বা একাধিক বিষয় বর্ণনায় বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন ক'রেছেন। চণ্ডীদাস পূর্ব্ব-রাগ, আক্ষেপানুরাগ, ও ভাব-সম্মিলনে; বিদ্যাপতি বয়ঃসন্ধি, বিরহ-মাথুর,

রসোল্লাস ও প্রার্থনায়; জ্ঞানদাস মান ও নিবেদনে এবং গোবিন্দদাস গৌর-চন্দ্রিকা, রূপবর্ণনা, রাস এবং অভিসারের পদে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন ক'রেছেন। গোবিন্দদাসের শ্রীমতীর অভিসার বর্ণনার প্রত্যেকটি পদ অপূর্ব্ব ও অনবদ্য। সেগুলি যেমন মনোরম, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। তিনি অভিসারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে বিভিন্ন অভিসার ও অবস্থার বর্ণনায় বৈচিত্র্য সম্পাদনে গোবিন্দদাস তুলনা-রহিত। গ্রীষ্মকালে শ্রীমতীর দিবাভিসারে,—

"মাথহিঁ তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
নোনিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার॥"

অন্ধকার অভিসারে,—

"ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ছাপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ॥

*　　*　　*

যো পদতল থল-কমল-সুকোমল
ধরণি-পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সংকট বাটহি
আয়ত যায়ত নিশঙ্ক॥"

আবার বর্ষাভিসারে দুর্য্যোগময়ী তিমিরান্ধকারে বিপদসঙ্কুল কর্দ্দমাক্ত বন্ধুর পথে প্রেমিকা অভিসারে যাত্রা ক'রছেন। আকাশ ঘোর কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন, মুহুর্ম্মুহু তড়িৎ আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে দিচ্ছে, ঘন-ঘন বজ্রপাত ও অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণে বিশ্ব-চরাচর শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে,—

"মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥

*　　*　　*

ঘন-ঘন ঝন-ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥"

সখী ব্যাকুল-হৃদয়ে জিজ্ঞাসা ক'রছেন,--

"সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনি পার॥
*　　*　　*
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥"

শ্রীমতী তখন সখীর প্রশ্নের উত্তরে বল্‌ছেন,—

"কুল-মরিযাদ　　কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ --　　সিন্ধু সঞে পঙরলু
তাহে কি তটিনি অগাধা॥
*　　*　　*
কোটি কুসুম-শর　　বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।
প্রেম-দহন-দহ　　যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ　　জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুবোধ।'

কুলবতী হ'য়ে কুলের মর্য্যাদারূপ কঠিন কপাট যিনি উদ্‌ঘাটন ক'রে ফেলেছেন, সামান্য কাঠের কপাট তাঁর অভিসারে কি বাধা সৃষ্টি ক'রতে পারে? আত্ম-মর্য্যাদারূপ সমুদ্র যিনি অবলীলাক্রমে গোষ্পদের ন্যায় অতিক্রম ক'রেছেন, ক্ষুদ্র তটিনী তাঁর অভিসারে কি বাধা দিতে পারে? সর্ব্বদা যাঁর তনু পুষ্পধন্বার কোটি শাণিত শরে জর্জ্জরিত, সামান্য বৃষ্টির জলে কি তাঁর ক্লেশ বোধ হয়? প্রেমানলের দহন জ্বালা যিনি হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ সহ্য ক'রছেন, অশনির অগ্নি তাঁর কাছে কতটুকু? যাঁর চরণতলে বাধা নিজ জীবন সমর্পণ ক'রে দিয়েছেন তাঁর জন্য অভিসারে কি তুচ্ছ দেহের ভাবনা মনে আসে।

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনির অমোঘ-আহ্বান যে শুনতে পেয়েছে তাকে যে দুস্তর-পথে যেতেই হয়। তাই তো শ্রীমতী,—

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি॥..."

গভীর নিশীথে কণ্টকাকীর্ণ, সর্পসঙ্কুল, অনিশ্চিত পিছল বনপথে তাঁকে দয়িতের উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে অভিসারে যেতে হবে। তাই রাজনন্দিনী গৃহে রাত্রি জাগরণ ক'রে সেই দুস্তর পথ যাওয়ার অভ্যাস ক'রছেন সকলের নিন্দা-তিরস্কারকে হাসিমুখে অগ্রাহ্য ক'রে।

বেদনায় সমুজ্জ্বল, দুঃখে মহীয়সী শ্রীরাধার এই তপস্যা মহাযোগিনীর তপস্যা,—পঞ্চতপা পার্ব্বতীর সাধনার চেয়েও এ সাধনা কঠিন। প্রেমের জন্য কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে এই যে দুঃসহ ত্যাগ স্বীকার এর তুলনা কোথায়?

এইখানে গোবিন্দদাসের অভিসারানুরাগের একটি সুন্দর পদ মনে পড়ছে,—

"......একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন-আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূর গেল॥
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণ— হুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দ দাস॥"

বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পর, পথের অনেক ভয় বাধা অতিক্রম ক'রে, রাধা তাঁর চির-আকাঙ্খিত দয়িতের দর্শন লাভ ক'রেছেন; সার্থকতার আনন্দে ও পরিতৃপ্তিতে তিনি বিগত সব দুঃখ-বেদনা ভুলে গেছেন।

যে-প্রেম অন্তরে অনন্তের স্পর্শ এনে দেয়, যে-প্রেমকে বোঝান যায় না, যা শুধু বেদনার মধ্য দিয়ে—ত্যাগের মধ্য দিয়ে—সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি ক'রতে হয়, কবি সেই প্রেমেরই গান গেয়েছেন,—তাকে বন্দনা জানিয়েছেন। এই প্রেম হ'চ্ছে,—"The worship of the heart that Heaven rejects not."

এই মানুষী প্রেম ভূমির মধ্যে ভূমা, দেহের মাঝে দেহাতীত, রূপের মাঝে অরূপ আর সীমার মাঝে অসীমের উদাত্ত-গম্ভীর সুর শুনতে পেয়েছে।

"The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow."

আমাদের এই ধূলোমাটি ভরা জগতে মানুষকে কেন্দ্র ক'রেই এই প্রেম গড়ে উঠেছে। কিন্তু একাগ্রতা, দুশ্চর তপস্যা, বেদনা ও বৈরাগ্যের হোম-বহ্নিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে এই মানুষী পার্থিব প্রেম অপার্থিব আনন্দলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রেছে,—"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"।

## বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ

১। ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি—এই সর্ব্বপ্রাচীন সঙ্কলন গ্রন্থখানি সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষদিকে পদকর্ত্তা হরিবল্লভ বা বল্লভ দাস (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) কর্ত্তৃক ভক্ত বৈষ্ণবগণের উপাসনার জন্য সম্পাদিত হ'য়েছিল। এই গ্রন্থে মাত্র ৩১৫টি পদ আছে। এই গ্রন্থে চন্ডীদাস-নামাঙ্কিত একটিও পদ দেখা যায় না।

২। গীতচন্দ্রোদয় -ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের প্রণেতা ঘনশ্যাম (নরহরি চক্রবর্ত্তী) কর্ত্তৃক অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে সঙ্কলিত। গ্রন্থটি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

৩। পদামৃতসমুদ্র—এই সংগ্রহ গ্রন্থটি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা নন্দকুমারের

গুরু পদকর্ত্তা আচার্য্য রাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক সংকলিত। এই গ্রন্থে মোট ৭৪৬টি পদ আছে।

৪। পদকল্পতরু—এটি চারটি শাখায় বিভক্ত এবং এতে কিঞ্চিদধিক দেড়শ' বৈষ্ণব পদকর্ত্তার মোট ৩১০১ পদ আছে। যদিও মুদ্রিত পুস্তকে মাত্র ৩০৩০ পদ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এই গ্রন্থটি পদকর্ত্তা বৈষ্ণব দাস (গোকুলানন্দ সেন) কর্ত্তৃক সংকলিত হ'য়েছিল। বৈষ্ণব দাস রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। এই সংগ্রহ গ্রন্থটি সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় এবং ব্যবহারের পক্ষেও ভাল। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়, এম্-এ মহাশয়ের সম্পাদনায় এই বিরাট্ গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির থেকে প্রকাশিত হ'য়েছে।

৫। কীর্ত্তনানন্দ—গৌরসুন্দর দাস সংকলিত।

৬। সংকীর্ত্তনামৃত—পদকর্ত্তা দীনবন্ধু দাস সংকলিত এই পুঁথিখানি 'দেশবন্ধু' ৺চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের গ্রন্থাগারে ছিল। স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'য়েছে। এই গ্রন্থেও চণ্ডীদাসের পদ পাওয়া যায় না।

৭। পদ-রস-সার—নিমানন্দ দাস সংকলিত।

৮। পদ-রত্নাকর—কমলাকান্ত দাস সংকলিত।

৯। পদকল্প-লতিকা—গৌরমোহন দাস সংকলিত। এটি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক, পদসংখ্যা মাত্র ৩৫১টি।

১০। পদ-রত্নাবলী—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক সংকলিত।

১১। পদচিন্তামণিমালা—প্রসাদ দাস সংকলিত।

১২। রসমঞ্জরী—পীতাম্বর দাস সংকলিত।

১৩। পদ-সমুদ্র—এই বিরাট্ গ্রন্থে পদসংখ্যা প'নের হাজার ছিল বলে শোনা যায়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে এটি আউল বাবা মনোহর দাস কর্ত্তৃক সংকলিত। তিনিই বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী সর্ব্বপ্রথম সংগ্রহ করেন। তিনি পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের বন্ধু ছিলেন। হুগ্লী জেলার বদনগঞ্জে তাঁর সমাধি আছে। ঐ স্থান নিবাসী ৺হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের নিকট নাকি এই পুঁথিখানি ছিল। বর্ত্তমানে পুঁথিটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেকে এই পুঁথির অস্তিত্বেও সন্দেহ প্রকাশ ক'রেছেন।

# বৈষ্ণব জীবনচরিত সাহিত্য

প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে বাঙগলাভাষায় জীবনচরিত লেখার প্রচলন ছিলনা। পৌরাণিক্ ও ছদ্ম-পৌরাণিক উপাখ্যান এবং নানা সাম্প্রদায়িক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের ছলে সাহিত্য সৃষ্টি, শাস্ত্রের অনুবাদ, টীকা প্রভৃতি ছাড়া অপর কোন বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ধারার প্রবর্ত্তন হয়নি। সংঘশক্তিহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষাজর্জ্জরিত মধ্যযুগের সমাজে কোন মর্ত্ত্যবাসীর জীবনচরিত লেখার কল্পনাও ছিল সুদূরপরাহত।

নবদ্বীপ তখন শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হ'লেও দেশের জনসাধারণের সংগে সে শিক্ষার যোগ ছিল অতি ক্ষীণ। ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন শিক্ষক এবং ব্রাহ্মণ সন্তানেরাই শিক্ষার সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা পেতেন। আচার অনুষ্ঠান পালন এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য ছুৎমার্গের আশ্রয় তাঁরা নিয়েছিলেন। তান্ত্রিকতার প্রভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ শাক্তদের মধ্যে মদ্যমাংসাদি সেবনই ধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছিল। উৎপীড়িত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একদিকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের জুলুম ও মুসলমান শাসনের উপদ্রবে দলে দলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করছিল। অপরদিকে জীর্ণপ্রায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশিষ্ট বহুসংখ্যক ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ হিন্দুদের দ্বারা উৎপীড়িত হ'য়ে ঘৃণিত ও পতিতভাবে অত্যন্ত হীন অবস্থায় নানা বিকৃতি ও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। সমাজ-বিপর্য্যয়ের এই চরম সংকট মুহূর্ত্তে শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হন। তাঁর বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাপেক্ষাও মৃদু চরিত্র, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং তার প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের আদর্শ ও প্রচেষ্টা, এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়গুলিকে এক সূত্রে গেঁথে, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে উচ্চ নীচ সকলকেই সমান আসন ও মর্য্যাদা দিয়ে এক বিরাট্ সাম্য-সংস্থাপনের মন্ত্রে বাঙগলা তথা ভারতকে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে,- বলদৃপ্ত রাজশক্তি এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের প্রবল বিদ্বেষ ও প্রতিকূলতার মধ্যে। আত্ম-বোধের ঋষি শ্রীচৈতন্য জাতির নব জন্ম-পত্রিকা উন্মুক্ত করেন। তাঁর প্রভাবে প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বাঙগালী ও বাঙগালাদেশ বহির্বাঙগলার সংগে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পায়। নব ধর্ম্ম প্রচারের সংগে ব্রাহ্মণের অহমিকা চূর্ণ হ'য়ে বংশগত এবং আর্থিক কৌলিন্যের পরিবর্ত্তে জ্ঞান ও ভক্তিমার্গে শিক্ষার কৌলিন্য সমাদর ও মর্য্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। সমাজে

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, উন্নত রুচি, ত্যাগ, বিনয়, দয়া, ভক্তি, সরলতা পরমতসাহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও যুগান্তর আসে। বঙ্গভাষার প্রতি অবহেলা ও অনাদর দূর হ'তে থাকে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয়ে উন্নততর আদর্শে একদিকে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের কূলপ্লাবনী বন্যা আসে, অপরদিকে পৌরাণিক অলৌকিক চরিত্র-গুলি অপেক্ষা মহৎপুরুষদের বাস্তব জীবন অধিক আকর্ষণীয় হওয়ায় জীবন-চরিত সাহিত্য রচনার ধারা প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে রাজাদের কাহিনী নিয়ে চরিতকাব্য-রীতির প্রচলন হ'য়েছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকেই। হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, রামচরিত প্রভৃতি এই জাতীয় পুস্তক। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে এই রীতির প্রবর্ত্তন হয় শ্রীচৈতন্যকে নিয়েই। শ্রীচৈতন্য-দেবের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, উদারতা ও দেবোপম চরিত্র-মাধুর্য্যই এই জীবন-চরিত রচনার প্রতি শক্তিশালী বৈষ্ণব কবি-সাহিত্যিকদের প্রেরণা জোগায় এবং তাঁর জীবনকাহিনী নিয়েই বাঙলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব্ব ও আধুনিকযুগের লক্ষণযুক্ত জীবনীসাহিত্যের সূত্রপাত হয়। মহাপ্রভুর সমস্ত চরিত-কাব্যগুলির মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দপ্রভূর চরিত উল্লিখিত দেখা যায়। অদ্বৈতপ্রভুর চরিতেরও প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায়। অলৌকিকতা অপেক্ষা ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যের প্রতি চরিতকারদের লক্ষ্য ছিল বেশী;—যদিও তাঁরা সর্ব্বত্র অলৌকিকতার প্রভাব হ'তে মুক্ত হ'তে পারেননি। এর কারণ অলৌকিক-লীলা এবং অবতারবাদের প্রতি এদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই আকর্ষণ থেকে গেছে আবহমান কাল থেকে। এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শুধু এদেশে বৈষ্ণব যুগেই নয় - সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই এই অলৌকিকতা এবং অবতারবাদের অবতারণার প্রয়োজন অনুভূত হ'য়েছে। সেই সঙ্গে একথা ভুল্‌লে চলবে না, যাঁরা বৈষ্ণব চরিত-সাহিত্যগুলি রচনা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। সেই জন্য এগুলি তাঁদের জীবন ও কর্ম্মাবলীর নিছক ফটোগ্রাফ অথবা বাস্তব ঘটনার সমষ্টি না হ'য়ে ভক্তি ও দর্শন মিশ্রিত অপরূপ চরিতাখ্যানে পরিণত হ'য়েছে; এবং এর বিচার ক'রতে হবে সে কথা স্মরণ রেখেই। চরিতাখ্যান, অনুবাদ, কাব্য, নাটক, দার্শনিক তত্ত্ব, ব্যাখ্যা এবং সন্দর্ভগ্রন্থাদি মিলিয়ে বৈষ্ণবদের সর্ব্বসমেত 'তিন লাখ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ' বলে প্রসিদ্ধি আছে।

পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবদের গ্রন্থগুলি শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণব দর্শনের ছায়ায় রচিত হ'ত এবং সাধারণে প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে

বৃন্দাবনের বিখ্যাত 'ষট্ গোস্বামীর' দ্বারা সমর্থিত হওয়ার প্রয়োজন হত। এই ছয়জন গোস্বামী বা ঋষিপ্রতিম বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ছিলেন Board of Censors এর ন্যায়। এঁদের সমর্থন না পেলে কোন গ্রন্থই ভক্ত বৈষ্ণব সমাজে প্রামাণিক এবং পাঠযোগ্য বলে স্বীকৃত বা সমাদৃত হ'ত না। তিন প্রভু—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর লীলাবসানের পর বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী মহাপ্রভুর ঋষিকল্প পার্ষদ, পরম ভক্ত বৈষ্ণব, মহাপণ্ডিত, প্রতিভাসম্পন্ন কবি, দার্শনিক, রসবেত্তা, শাস্ত্রকৃত এবং স্বসমাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলে বিবেচিত হ'তেন। চৈতন্যোত্তর কালের বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বিরাট্ বৈষ্ণব সাহিত্য এঁদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর মুহ্যমান ও বিহ্বল বৈষ্ণব ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যকে প্রকৃত পক্ষে এঁরাই জাগিয়ে তুলেছিলেন। অবশ্য এঁরা বিভিন্ন বিষয়ে যে অমূল্য গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছিলেন সেগুলি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সেজন্য এঁরা যথার্থ ভাবে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নন্। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজে তিন প্রভুর পরেই এঁদের আসন। বাঙলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব চরিত-সাহিত্যগুলিতে এঁদের কিছু না কিছু বৃত্তান্ত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণিত দেখা যায়। চৈতন্যোত্তর কালের বৈষ্ণব সাহিত্যে এঁরা দিগ্‌দর্শক। এঁদের ত্যাগ, ভক্তি, কবিত্ব, রসজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য যে কোন দেশের পক্ষেই শ্লাঘার বিষয়। সেজন্য আমরা এই গ্রন্থে এঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ করে যাব। তা ছাড়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছয়টি কেন্দ্রেরও উল্লেখ করে যাব। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্যকে বুঝতে হ'লে এগুলির সঙ্গেও অন্তত কিছু পরিচয় থাকা দরকার।

## শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

"বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে।" দীনেশবাবু এই কথাটি যাঁর সম্বন্ধে ব'লেছেন তিনি প্রেমাবতার মহাত্মমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। ১৪৮৬ খৃীষ্টাব্দে (১৪০৭ শকাব্দে) ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। তাঁর পিতা মহা-

পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্র জাতিতে বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যার যাজপুর হ'তে মহারাজ কপিলেন্দ্র-দেবের (ভ্রমরের) ভয়ে শ্রীহট্টে এসে বাস করেন। জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে আগমন করে অধ্যয়ন সমাপন করার পর সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। শচীদেবীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং দুইটি পুত্র জন্মলাভ করে। কন্যাগুলির অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ যোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভর (নিমাই) পাছে আজীবন শাস্ত্র-চর্চ্চার লোভে অগ্রজের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এই আশঙ্কায় জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে মূর্খ করে রাখতে মনস্থ করলেন।

বাঙলার আঙিনায় যে সমস্ত অশান্ত শিশু খেলা করে গেছেন নিমাই তাঁদের অন্যতম প্রধান। শীঘ্রই এই দুরন্ত ও অশিষ্ট শিশুর অত্যাচারে নবদ্বীপবাসিগণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন। জগন্নাথ মিশ্র সকলের নিত্য নানা অভিযোগে চিন্তিত হ'য়ে এবং নিমাই-এর আগ্রহে তাঁকে পড়াশোনার জন্য টোলে প্রেরণ করলেন।

অসাধারণ অধ্যবসায় ও একাগ্রতায় প্রায় বিশ বৎসর বয়সে নিমাই ব্যাকরণ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হ'য়ে উঠলেন এবং স্বয়ং নবদ্বীপে একটি টোল স্থাপন করে অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করলেন। অচিরে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল। বৈয়াকরণিক হ'লেও কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রেও তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। কেশব-কাশ্মীর নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তিনি পরাস্ত করে তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ করলেন। কিন্তু তবুও তাঁর শৈশবের দুরন্তপনা এবং রহস্যপ্রিয়তা এতটুকু হ্রাস হ'ল না। বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারিগুপ্ত, গদাধর পণ্ডিত ও আরও অনেক বড় বড় পণ্ডিতকে পথের মাঝে পেয়ে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতেন এবং পরাজিত করে তীক্ষ্ন শ্লেষ প্রয়োগ করতেন। শ্রীহট্টবাসিগণকে ব্যঙ্গের দ্বারা ক্রোধে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলে আনন্দ অনুভব করতেন। কেউ ধর্ম্মের কথা বল্‌তে এলে তিনি পরিহাস করে সে কথা উড়িয়ে দিতেন।

নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যটন করে গৃহে ফিরে এসে শুনলেন যে, সর্পদংশনে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হ'য়েছে। মাতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি সনাতন মিশ্রের ও মহামায়া দেবীর কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে বিবাহ করলেন, কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর বিয়োগ তাঁর অন্তরে সংসার-বৈরাগ্য এনে দিল। ..

নিমাই গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে দাঁড়ালেন। এই মুহূর্ত্তের অমৃত-লগ্নে জাতির এক বিরাট্ কল্যাণ-সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল। নিমাই-এর মনে কি এক অদ্ভুত ভাবোদয় হ'ল। তিনি পূর্ব্বরাগের প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর তিনি সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মথুরায় যেতে উদ্যত হ'লেন কিন্তু বহুকষ্টে তাঁকে বাড়ী ফিরিয়ে আনা হল। কিন্তু সেই রহস্য-প্রিয় শিক্ষাভিমানী উদ্ধত নিমাই আর নেই। এখন তিনি অনুক্ষণ 'কোথা কৃষ্ণ' 'কোথা কৃষ্ণ' ব'লে ক্রন্দন করেন। কিছুদিন পর চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ ক'রে সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন। শীঘ্রই নিত্যানন্দপ্রভু এবং অদ্বৈতপ্রভু তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'লেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর দু'জন বাঙ্গালী শিষ্য—কেশবভারতী ও ঈশ্বরপুরী। উভয়েই শ্রীচৈতন্যের গুরু। এ জন্য চৈতন্যদেবকে মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয়।

এর পর তাঁর বাহ্যজ্ঞানহীন সদা প্রলাপবাদময় দিব্যোন্মাদের চিত্র বর্ণনা করা অসাধ্য। তিনি কখনও তমালবৃক্ষকে কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করেছেন, কখনও মেঘ দেখে আত্মহারা হ'য়েছেন, কদম্ববৃক্ষ দেখে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছেন। আবার কখনও যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন। কীর্ত্তনানন্দে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েন এবং আবার হরিনামামৃত শ্রবণ করে তাঁর জ্ঞানসঞ্চার হয়। তাঁর জীবন এইভাবে একটি সুমধুর গীতিকবিতার আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। বৈষ্ণব কবিগণ মহাপ্রভুর এই দিব্য ভাব-জীবনের রূপ-রস -এই শ্বেত-কমলের সুবাস পদাবলীর শ্রীরাধার চরিত্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর অপরূপ সুন্দর উজ্জ্বল গৌরকান্তি ও প্রেমাশ্রুসিক্ত মুখখানি দর্শন করে লোকে মুগ্ধ ও বিস্মিত এবং সেইসঙ্গে ভক্তিতে আপ্লুত হ'য়েছে। একটি অন্তরের স্পর্শে সমস্ত জাতি জেগে উঠেছে, এক প্রদীপের ছোঁয়ায় জ্বলে উঠেছে লক্ষ লক্ষ প্রাণের প্রদীপ। তাঁর সংস্পর্শে কত বিষয়ী বিষয় ভুলেছে, কত হিসাবীর হিসাবে ভুল হ'য়ে গেছে বুঝে, না বুঝে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁর সঙ্গে নাম-সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়েছে। কত দস্যু তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়েছে, কত বারাঙ্গনা তাঁর চরণে শরণ নিয়ে অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। কত জ্ঞানী-গুণী, কত মহাপণ্ডিত অহমিকা বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভক্তি-মার্গের পথিক হ'য়েছেন। তিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হ'তে আচণ্ডালকে এবং রাজা-বাদশা হ'তে পথের ভিক্ষুককে সমান ভাবে কোলে টেনে নিয়েছেন।

দেশব্যাপী অগাধ জড়ত্বের মাঝে শ্রীচৈতন্য এক বিরাট্ আলোড়ন তুল্লেন,—মরা-নদীতে এলো জোয়াড়। বাঙলা দেশ যেন সুদীর্ঘ কাল তাঁরই আবির্ভাব-লগ্নের প্রতীক্ষা ক'রে বসে ছিল।

চৈতন্যদেব ছ' বৎসরে দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গৌড় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ শেষ করে শ্রীক্ষেত্র নীলাচলে কাশীমিশ্রের বাটীতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থান করেন। এই স্থানে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবারে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে।

তাঁর তিরোভাব সম্বন্ধে সকল বৈষ্ণব চরিতকারগণ নীরব। এমন কি কবিরাজ গোস্বামী—ঐতিহাসিক তথ্য এবং বাস্তব সত্যের প্রতি যাঁর অনুরাগ প্রবল ছিল এবং যিনি চৈতন্যচরিতামৃতে মুখ্যত শ্রীচৈতন্যের মধ্য ও অন্ত্যলীলা বর্ণনার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন— তিনিও অকস্মাৎ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। একমাত্র জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোধান বর্ণিত দেখা যায়। কিন্তু এই গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজের দ্বারা স্বীকৃত ত নয়ই বরং নিন্দিত হ'য়েছে। এর কারণ কি? ঁদীনেশবাবু প্রকৃত তথ্য নিরূপণের বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করেন—কিন্তু তাতে বৈষ্ণব সমাজ গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন। বৈষ্ণবেরা দুঃখদায়ক কঠোর বিষয়গুলি—যাতে কারো মনে আঘাত লাগার সম্ভাবনা—এড়িয়ে চলেন। কথাবার্ত্তা বা আচারে ব্যবহারেও তাঁরা এই রীতি মেনে থাকেন। সেজন্য সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ন্যায় হৃদয়-বিদারক ঘটনা বর্ণনা করাকে তাঁরা সম্ভবত পাপ বলে মনে করেছিলেন। অথবা, অবতারবাদের মোহে তাঁরা এই ঘটনাকে অলৌকিক ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রচার করেছেন। কথিত হয় মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহে (মতান্তরে শ্রীটোটাগোপীনাথের বিগ্রহে) লীন হ'য়ে যান কিন্তু তাঁর নিত্য-লীলার অবসান হয়নি।

অলৌকিকতা বর্জ্জন করলেও এই ব্যঞ্জনার যথেষ্ট মূল্য আছে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের দ্বারা যিনি অমরত্ব লাভ ক'রেছেন তাঁর লীলাবসান কোন দিনই হয়না।

শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে জ্ঞান, প্রেম, দয়া ও ভক্তির সঙ্গে বীরোচিত বিনয় ও অনমনীয় দৃঢ়তা মিশ্রিত হ'য়েছে। পুরুষ ও প্রকৃতির সমস্ত সদ্‌গুণগুলি তাঁর মধ্যে বিরাজিত দেখা যায়। তাঁর ধর্ম্মতত্ত্ব শুষ্ক উপদেশের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিলনা,—তিনি স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করে জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন। সমস্ত রকম গোঁড়ামি ও উৎপীড়ক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, সমাজ-ব্যবস্থার

সংস্কার করার জন্য তিনি জাতিভেদের অসারতা দেখিয়েছেন এবং জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ধনী-দরিদ্র উন্নত-অনুন্নত সকলকেই উদার সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। শাসন-অবরুদ্ধ-কণ্ঠ বাঙলা দেশে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন,—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ"।

শ্রীচৈতন্য কাউকে দীক্ষা দিতেন না। সংভাবে জীবন যাপনের জন্য মোটামুটি কয়েকটি নির্দ্দেশ দিয়ে কলিযুগের নবগায়ত্রী হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে বলতেন। তাঁর উপদেশ মাত্র আটটি শ্লোকেই নিবদ্ধ ছিল। এগুলি 'শিক্ষাষ্টক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

## শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত

শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনী-কাব্য মুরারি গুপ্ত রচিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত"। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রে ঈশ্বরত্ব আরোপ ক'রে তাঁর আদিলীলা বিষয়ক সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছে। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ। মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ও আদ্যলীলায় সহচর ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে অনেক কথা আছে। মুরারি গুপ্তের কড়চা ছাড়া মহাপ্রভুর পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর লিখিত কড়চা; প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী; কবি-কর্ণপুর (পরমানন্দ সেন) রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃতে লেখা। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া অবশিষ্ট চৈতন্য-জীবনীগুলি বাঙলা ভাষায় রচিত।

নিম্নে বাঙলা ভাষায় রচিত শ্রীচৈতন্যের জীবনী-কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল।

### ১। গোবিন্দদাসের কড়চা—

কড়চা শব্দের অর্থ 'নোট' বা রোজনামচা। চৈতন্যদেবের কোন কোন সঙ্গী তাঁর জীবন সম্বন্ধে নোট রেখে গেছেন। এই কড়চার মধ্যে জীবন-চরিত রচনার উপযোগী অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মুরারিগুপ্ত এবং স্বরূপ-দামোদরের কড়চা পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি এখানে আমাদের আলোচনার অন্তর্গত নয়। বাঙলা ভাষায় কড়চা

লেখকগণের মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগরবাসী শ্যামদাস কর্ম্মকার ও মাধবী দেবীর পুত্র গোবিন্দদাস কর্ম্মকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি সম্ভবত চৈতন্যদেবের একজন ভক্ত ও ভ্রমণ-সহচর ছিলেন। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে (চৌদ্দশ' ত্রিশ শক) গোবিন্দদাস স্ত্রী শশিমুখীর কটূক্তিতে গৃহত্যাগী হ'য়ে মহাপ্রভুর পরিচর্য্যার জন্য ভৃত্যরূপে দু' বৎসর সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে অবস্থান করেছেন এবং অবসর মত চাক্ষুষ ঘটনাগুলিকে চরিতকথার আকারে লিপিবন্ধ করে রেখেছেন। বইটির ভাষা যেমন সংযত তেমনিই সরল ও আধুনিক এবং কোথাও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দেখা যায় না। বহু ভ্রান্তি ও অসংগতি থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থের মধ্যে অনেক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণ এবং সুন্দর নৈসর্গিক বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ এতে আছে যা এই জাতীয় অপর কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। এটিকে সাধারণত মহাপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে একটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে গণ্য করা যায়। তবে এতে মহাপ্রভুর জীবনের মাত্র কয়েক বৎসরের ঘটনা বর্ণিত হওয়ায় এবং তাঁর চরিত্রে ঈশ্বরত্ব আরোপিত না হওয়ায় অনেক ভক্ত বৈষ্ণব এই গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান। পুস্তকটি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী থেকে শান্তিপুর নিবাসী জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর দ্বারা সম্পাদিত এবং ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রকাশিত গোবিন্দদাসের কড়চার নূতন সংস্করণের ভূমিকায় প্রতিপক্ষগণের যুক্তি খণ্ডনের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেছেন। আবার 'গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য' বইটিতে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় দীনেশবাবুর মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। যাইহোক, পুস্তকটি সম্পূর্ণ জাল একথা জোর করে এখনও বলা চলে না, তবে এতে পরবর্ত্তীকালে অনেক কারসাজী হ'য়েছে এ নিঃসন্দেহ।

**২। বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্যভাগবত—**

বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের স্থান অতি উচ্চে। শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের পর যখন ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁকে বিষ্ণুর অবতার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছিলেন এই গ্রন্থ সেই সময় লেখকের গুরু নিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে রচিত। কবি নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু ও অপরাপর চৈতন্য পারিষদগণের নিকট হ'তে চৈতন্য জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

বৃন্দাবনদাস সম্ভবত ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোধকরি মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করতে পারেননি(?) তাই বারম্বার আক্ষেপ ক'রে লিখেছেন, "হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখন" (চৈ ভা.)। বৃন্দাবনদাসের মাতার নাম নারায়ণী। তিনি (শ্রীরামের) নলিন আচার্য্যের কন্যা এবং শ্রীবাসের (যাঁর বিখ্যাত অংগনে মহাপ্রভু পার্ষদগণসহ নাম সংকীর্ত্তন করতেন) ভ্রাতুষ্পুত্রী। কুমারহট্ট নিবাসী বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর সহিত নারায়ণীর বিবাহ হয়। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণী বিধবা হন এবং এর আঠার মাস পরে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, বৈশাখী কৃষ্ণ-দ্বাদশীতে, বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দপ্রভুর আশীর্ব্বাদে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব হয় এবং এ সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু অ-বৈষ্ণবগণ এই অপ্রাকৃত কাহিনীতে আস্থা স্থাপন না করে এত বেশী কুৎসা প্রচার করতে আরম্ভ করে যে শ্রীবাসের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী ও তাঁর শিশু পুত্রকে নবদ্বীপে নিজের বাড়ীতে রাখতে সাহস করলেন না। এক বৎসরের শিশুকে নিয়ে নারায়ণী অসহায় অবস্থায় নবদ্বীপের সন্নিকটে মামগাছি গ্রামে বাস করেন। বাসুদেব দত্ত নামে একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী সৎসাহসের বশে তাঁদের স্বগৃহে আশ্রয় দেন এবং বালক বৃন্দাবনদাসের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরবর্ত্তীকালে বৃন্দাবনদাস বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন দেনুড় গ্রামে বসবাস করেন। এই স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বর্ত্তমান। এখানে তিনি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন এবং গভীর জ্ঞান, অপূর্ব্ব ভক্তি ও মহান চরিত্র মাধুর্য্যে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জ্জন করেন।

বৃন্দাবনদাস সে যুগের ঋষি 'ব্যাসদেব' ব'লে কথিত হন। সম্ভবত পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ভক্তিপূর্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাখ্যান রচনার জন্য এবং হয়ত' বেদব্যাসের ন্যায় তাঁরও জন্ম-সংক্রান্ত রহস্য থাকায় বিশেষভাবে তাঁকে এই উপাধি মণ্ডিত করা হয়। তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং তাঁকে খেতুরীর বিখ্যাত মহোৎসবে (আনুমানিক ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৬০২ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে) উপস্থিত দেখা যায়। ভক্তিরত্নাকরে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে।

খুব সম্ভব চৈতন্যভাগবত ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দেনুড় গ্রামে রচিত হয়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৯৮ শকাব্দ) কবি-কর্ণপুর লিখিত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়' দেখা যায় যে চৈতন্যভাগবত তখন বিখ্যাত গ্রন্থ। আদি, মধ্য ও

অন্ত্য—তিনখণ্ডে বিভক্ত, সহজ ভাষায় আবেগের সঙ্গে বর্ণিত, ভক্তিরসের উৎস স্বরূপ এই সুন্দর কাব্যখানি শ্রীমদ্ভাগবতের আধারে লিখিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতের লীলার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের লীলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মিল রাখতে যত্নবান হ'য়েছেন। তাই এই গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও যুগাবতার শ্রীচৈতন্য অভিন্ন হ'য়ে পড়েছেন। নানা অলৌকিক কাহিনীতেও এই গ্রন্থ মাঝে মাঝে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে। এজন্য শুধু কবিকে দায়ী করা সমুচিত হবে না—দায়ী অপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাসী সেই যুগ এবং নবপ্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করার প্রয়োজন। কিন্তু নানা অদ্ভুত ঘটনা থাকা সত্ত্বেও এই পুস্তকটি নিঃসন্দেহে একখানি ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক চরিত-কাব্য। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার চিত্র এতে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থটি মহাপ্রভুর অন্যতম Standard চরিতাখ্যানরূপে পূজিত হয়। কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় মহাজন ব্যক্তি বারম্বার সবিনয়ে ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই গ্রন্থটির উল্লেখ করে বলেছেন,—"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবন-দাস"॥......"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥ বৃন্দাবনদাস পদে কোটি নমস্কার। ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিল সংসার॥" এবং স্বরচিত চৈতন্যচরিতামৃতকে এই গ্রন্থের Supplement বা পরিপূরক মাত্র ব'লে নিবেদন করেছেন। চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর শেষজীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। লেখক শেষ দিকে নিত্যানন্দপ্রভুর জীবন চরিত রচনায় ব্যাপৃত থেকেছেন। গ্রন্থের এই অভাব পূর্ণ করার জন্যই বিশেষভাবে কবিরাজ গোস্বামী ব্রতী হ'য়েছিলেন।

চৈতন্যভাগবতকার গভীর আবেগ ও সতোস্ফূর্ত্ত কবিত্বের সঙ্গে কাব্য রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা ও মানবীয় আবেদন আছে সুপ্রচুর। মহাপ্রভুর বাল্য ও যৌবনলীলা এবং শ্রীধরের উপাখ্যান অত্যন্ত মনোরম। এই পুস্তকের কাব্যাংশের যৎসামান্য নিদর্শনস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা অংশ থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল,—

"রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে নিবার ছলায়॥

আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোন্যে কহে কৃষ্ণকথন মঙ্গল॥

*　　　*　　　*

প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটিচন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥
দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥ ১-৬॥"

(চৈতন্যভাগবত)

রাঢ় ও বঙ্গদেশের তৎকালীন দেবদেবী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দলাদলি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বহু অমূল্য তথ্য চৈতন্য-ভাগবতে নিবদ্ধ আছে।

এই বিরাট্ পুস্তক রচনা কালে বৈষ্ণবদ্বেষীগণের দ্বারা বৃন্দাবনদাসের জন্মরহস্য সম্বন্ধে এবং নিত্যানন্দপ্রভু প্রমুখ ঋষিকল্প বৈষ্ণব মহাজনগণ সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার ও বিষোদ্গীরণের বিরাম হয়নি। বিপক্ষদলের এই হীন আচরণে মাঝে মাঝে বৃন্দাবনদাসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে এবং তিনি চৈতন্য-ভাগবতের স্থানে স্থানে এই পাষণ্ডীগণের প্রতি তীব্র কটুভাষা প্রয়োগ ক'রেছেন। যেমন, তাঁর জন্ম সম্বন্ধে অলৌকিকতায় অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ হ'য়ে তিনি বৈষ্ণবোচিত বিনয় বিস্মৃত হ'লে লিখেছেন,—

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে॥"

(চৈতন্যভাগবত)

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের পূর্ব্বনাম ছিল চৈতন্য-মঙ্গল। কবি এই গ্রন্থটি রচনা ক'রে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ও তাঁদের সহচর লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ গোস্বামীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা সকলে এই গ্রন্থটি পাঠ করে অপার আনন্দলাভ করেন আর ভাগবতের সঙ্গে অপূর্ব্ব ঐক্য

ও সঙ্গতি লক্ষ্য করে তাঁরা এই গ্রন্থখানির নাম পরিবর্ত্তন করে চৈতন্যভাগবত নামকরণ করেন। 'প্রেমবিলাসে' এ সম্বন্ধে বর্ণিত হ'য়েছে,—

"ভাগবতের অনুরূপ চৈতন্যমঙ্গল।
দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী ভকত সকল॥
চৈতন্যভাগবত নাম দিলা তার।" (প্রেম বিলাস)

চৈতন্যভাগবত ছাড়া বৃন্দাবনদাস ভক্তিচিন্তামণি, তত্ত্ববিলাস, বৈষ্ণব-বন্দনা, দধিখণ্ড ও নিত্যানন্দ-বংশ-বিস্তার প্রভৃতি পুস্তকগুলি রচনা ক'রে-ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর রচিত অনেকগুলি পদও পাওয়া যায়।

**৩। লোচনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গল—**

আনুমানিক ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় গুরু, মহাপ্রভুর পারিষদ, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের আদেশে লোচনদাস চার খণ্ডে সমাপ্ত চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। কাব্যটি মুখ্যত গান করার উদ্দেশ্যেই রচিত সেজন্য রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। এই বইটিতে তিনি বৃন্দাবনদাস ও তাঁর কাব্যের উল্লেখ করেছেন,—

"শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত-গীতে॥"

ঐতিহাসিক মূল্যের একান্ত অভাব থাকলেও অবাধ কল্পনা ও কবিত্বের সুরভি এবং রচনার সৌন্দর্য্যের জন্য লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল প্রায় পৌনে চারশ' বছর ধরে সমাদর লাভ করে এসেছে। এই পুস্তকে শ্রীচৈতন্যের জীবন-চরিত আদ্যান্ত দেবলীলায় রূপান্তরিত হ'য়েছে। নানা দেব-দেবীর বন্দনা, স্বকপোলকল্পিত অলৌকিক ঘটনা ও উপাখ্যানরাশির মধ্য হতে শ্রীচৈতন্যের দেবদুর্লভ প্রকৃত জীবন-কথা উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এই পুস্তকটিতে চরিতকথা বা চরিতকাব্যের চেয়ে 'মঙ্গলকাব্যের' লক্ষণই বেশী। গ্রন্থের প্রথম অংশে, আদি লীলায়, মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত চৈতন্যচরিতের (মুরারি গুপ্তের কড়চার) প্রভাব ও অনুবাদ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে মহাপ্রভুর শেষ জীবন বর্ণিত হয়নি। বৈষ্ণব সমাজে এটি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হ'লেও চৈতন্যজীবনী হিসাবে খুব উচ্চ স্থান লাভ করেনি। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, চৈতন্যদেবের অপর কোনও চরিতাখ্যান এত মনোরম ভাষায়, এত সুন্দর কবিত্বের সুষমায় মণ্ডিত হ'য়ে রচিত হয়নি। গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তার

ও সমাদর লাভের এটিই প্রধান কারণ। এই গ্রন্থে আর একটি বিষয় আছে যা অপর কোন চৈতন্য জীবনীতে নেই। সেটি চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর কিশোরী ভার্য্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রেম-সম্পর্কের কথা। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে পত্নীর প্রতি সপ্রেম আচরণ লোচনদাস করুণ-মধুর ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

লোচনদাস (ত্রিলোচন বা সুলোচন) বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৪৫ শকে) বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কমলাকর দাস ও মাতার নাম সদানন্দী। কবির "মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।" তাঁর মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। মাতৃকুল ও পিতৃকুলে একমাত্র পুত্রসন্তান হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আদর যত্নের মাঝে প্রতিপালিত হন। সেজন্য বাল্যকালে লেখাপড়া আদৌ হয়নি। কিন্তু পরে পরিণত বয়সে মাতামহের কঠিন শাসনে ও যত্নে তাঁর অক্ষর পরিচয় ও বিদ্যালাভ হয়। "পিতৃকুলে মাতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র। * * * যথা তথা যাই সে দুল্লীল করে মোরে। দুল্লীল লাগিয়া কেহো পঢ়াইতে নারে॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর। ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার॥ তাহার চরণে মুঞি করোঁ নমস্কার। চৈতন্যচরিত্র লিখি প্রসাদে তাহার॥" লোচনদাস আমোদপুরের সন্নিকটে কাকুট গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী একজন গুণবতী ও বিদুষী মহিলা ছিলেন।

উচ্চ-শিক্ষিত না হ'লেও লোচনদাস একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক তাঁর অনেক সুমিষ্ট পদ পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার ভাষা সরল ও স্বাভাবিক, সেই সঙ্গে ভাবের প্রগাঢ়তা আছে। তাঁর রচিত কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামেও চলে গেছে। লোচনদাস 'ধামালী' পদের প্রবর্ত্তক। ধামালী বা ঢামালী শব্দের অর্থ 'আনন্দে মাতামাতি'। লোচনদাসের ধামালী পদগুলি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। এই পদগুলির ভাষা বিশুদ্ধ ও গ্রাম্য স্বাভাবিক কথ্য-ভাষা। চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের বিবাহ-বাসরে নদিয়া-নাগরীর মুখে ধামালী ছন্দে,—

"আর শুন্যাছ আলো সই
গোরা-ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুল-বধূ
কান্দ্যা আকুল তথা॥

হলদি বাঁটিতে গোরী
বসিল যতনে
হলদি-বরণ গোরাচাঁদ
পড়্যা গেল মনে।
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন
কিসের হলদি বাঁটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল
ভাস্যা গেল পাটা।
উঠিল গৌরাঙ্গ-ভাব
সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাঁটন
গেল ছারে খারে॥"

অথবা "ব্রজপুরে রূপনগরে রসের নদী বয়" প্রভৃতি পদগুলি সরস ও সুন্দর।

লোচনদাস রায় রামানন্দ কৃত সংস্কৃত নাটক 'জগন্নাথ বল্লভ'এর বঙ্গানুবাদ করেন। তা ছাড়া তিনি বাঙলা ভাষায় 'দুর্লভসার', 'চৈতন্যপ্রেমবিলাস', 'রাগানুরালহরী', 'আনন্দলতিকা', 'বস্তুতত্ত্ববাসর', 'দেহনিরূপণ', 'প্রার্থনা' প্রভৃতি পুস্তকগুলি রচনা করেছেন। এই সমস্ত পুস্তকের কোন কোনটিতে রাগানুগাপদ্ধতি এবং সহজিয়া দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় পাওয়া যায়।

আনুমানিক ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লোচনদাসের তিরোধান ঘটে।

**৪। জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল—**

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচনার অনতিকাল পরেই জয়ানন্দ চৈতন্য-দেবের জীবনী রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। স্বরচিত পুস্তকে তিনি চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ ক'রেছেন। জয়ানন্দের গ্রন্থের নাম চৈতন্যমঙ্গল। এটি নয় খণ্ডে বিভক্ত এবং গান করার উদ্দেশ্যে রচিত হওয়ায় রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। কাব্যটিতে রচনা নৈপুণ্য ও ভাবাবেগের একান্ত অভাব। বিদ্বজ্জন সমাজে কাব্যটি সমাদর লাভ করতে পারেনি। এই কাব্যের প্রায় সমস্ত পুঁথিগুলিই পাওয়া গেছে বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) অঞ্চল থেকে।

জয়ানন্দ বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামের অধিবাসী ও শ্রীচৈতন্য-দেবের (?) শিষ্য সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র। তাঁর মাতার নাম রোদনী এবং

তিনি সম্ভবত নিত্যানন্দের শিষ্যা ছিলেন। কবি জয়ানন্দের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জয়ানন্দের জন্ম হয় সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে। বাল্যকালে কবির নাম ছিল গুহিআ (গুইঞা)। মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্র হতে বর্দ্ধমান প্রত্যাগমনের পথে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে পদার্পণ করেন এবং কবির নাম রাখেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দ অভিরাম গোস্বামীর (?) নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের অনুমতিক্রমে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে চৈতন্য-মঙ্গল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই গ্রন্থটি ছাড়া তাঁর রচিত 'ধ্রুব-চরিত্র' ও 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নামে দুটি পুস্তক পাওয়া যায়।

চৈতন্যমঙ্গলে এমন অনেক কথা ও ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে যা অপরাপর বৈষ্ণব ইতিহাসে প্রচলিত মত হ'তে স্বতন্ত্র। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব-পুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর গ্রাম হ'তে রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে এসে বাস করেন এই সংবাদ আমরা পাই জয়ানন্দের কাছে থেকেই,—

"চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ
আছিলা জাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পালাঞা গেল
রাজা ভ্রমরের ডরে॥"

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না;—যেটুকু পাওয়া যায় তাব অলৌকিকতাব আবরণ হতে প্রকৃত ঘটনা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কবিরাজ গোস্বামী—যিনি বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যের মধ্য ও অন্ত্যলীলা বর্ণনার জন্য বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন এবং যিনি ঐতিহাসিক সত্যকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিয়েছেন—তিনিও এ বিষয়ে অকস্মাৎ গভীর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। হয়ত এরূপ কঠিন হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনা করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু একমাত্র জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হ'তে জানা যায় যে, পুরীধামে আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময়—রথাগ্রে আনন্দে বিভোর হ'য়ে নৃত্য করার কালে—মহাপ্রভুর বামপদে ইষ্টক বিদ্ধ হয়। তৃতীয় দিবসে বেদনা বৃদ্ধি পায় ও তাঁর জ্বর হয়। শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং ষষ্ঠ দিবসে—রবিবার সপ্তমী তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দিক দিয়ে বিচার করলে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল একটি মূল্যবান গ্রন্থ। শোনা কথার উপর নির্ভর করে লেখার জন্য এটিতে কতকগুলি অসঙ্গতি আছে। সাধারণ লোকের উপযোগী করে লেখার জন্য কোথাও কোথাও প্রাকৃতজনোচিত কাহিনীর অবতারণা আছে। কিন্তু তবু এই কাব্যের অনেকগুলি ঘটনাকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করার পক্ষে কোন বাধা নেই। বোধকরি তিনি বৈষ্ণব সমাজের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অনুমোদন ব্যতিরেকেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। বৈষ্ণব সমাজের অনেকেই এটিকে প্রামাণিক ব'লে স্বীকার করতে এবং উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে নারাজ। কারণ লেখক সত্যপ্রিয়তার বশে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই তাঁর লেখনীকে আবদ্ধ রাখেননি। তাছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তিরোভাব সংক্রান্ত বাস্তব ঘটনা ব্যক্ত করার জন্যও জয়ানন্দ বিশেষভাবে তাঁদের বিরাগভাজন হ'য়েছেন।

জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভে পূর্ব্বগামী অপরাপর কবির সঙ্গে কৃত্তিবাসেরও বন্দনা করেছেন,—

"রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়ে।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥"

সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে আর কোথাও কৃত্তিবাসের উল্লেখ দেখা যায়-না।

**৫। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত চৈতন্যচরিতামৃত—**

আনুমানিক ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্য-বংশে চৈতন্যচরিতামৃত-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম সুনন্দা। কৃষ্ণদাসের বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মাতাও ইহলোক ত্যাগ

করেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাসকে সঙ্গে নিয়ে পিসীমার বাড়ীতে আশ্রয় নেন।

কৃষ্ণদাস আজীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে লালিত—দুর্ভাগ্য তাঁর চির-সঙ্গী। কিন্তু সাংসারিক সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে তিনি সংযত ভাবে অগ্রাহ্য ক'রেছেন। কৃষ্ণদাস দার-পরিগ্রহ করেন নি। একদা তিনি স্বপ্নে নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন যেতে আদিষ্ট হন। তিনি সংসার পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রলেন এবং দুস্তর পথ অতিক্রম ক'রে একদিন বৈষ্ণবের পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবন ধামে উপনীত হ'লেন। সেখানে তিনি রূপ-সনাতনের অনুগ্রহভাজন হ'য়ে শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মন্ত্র-শিষ্য হন। অচিরে তিনি বৈষ্ণব সমাজে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

বৃন্দাবন ধামের বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ ভক্তিভরে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত পাঠ ও শ্রবণ ক'রতেন। কিন্তু ঐ পুস্তকে শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবন বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত না থাকায় এই অভাব মোচনের জন্য বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনেব একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি স্থির ক'রে তাঁকে বিশেষভাবে শ্রীশ্রীমহাস্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণনা ক'রে একটি চরিতাখ্যান রচনা ক'রতে অনুরোধ ক'রলেন। কৃষ্ণদাস অনুরোধ এড়াতে না পেরে এবং সয়ং শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞামালা লাভ ক'রে যখন এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ ক'রলেন তখন তিনি অশীতিপর (?) বৃদ্ধ ও তাঁর দেহ নানা পীড়ায় জীর্ণপ্রায়। তিনি চৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবন দাসের অনুমতি গ্রহণ ক'রে গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করলেন। কিন্তু এই দুরূহ কার্য্য তিনি শেষ ক'রে যেতে পারবেন এ ভরসা তাঁর ছিল না।

"থাকে যদি আয়ুঃ শেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়।
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তভু লিখি এ বড় বিস্ময়॥

এই অন্ত্যলীলা সার, সূত্র মধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে নারিব তবে,
এই লীলা ভক্তগণ-ধন॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি ততদিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥ ২-২॥"

নয় বৎসর গভীর অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নামে বিরাট্ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল অজ্ঞাত। তবে এখন পর্যন্ত যতটা প্রমাণ সংগৃহীত হ'য়েছে তাতে মনে হয়, খৃীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষ দিকে কিংবা চতুর্থ পাদের প্রথম দিকে এই গ্রন্থটি রচিত হ'য়েছিল,—এই অনুমান করার সপক্ষে বহু যুক্তি আছে। পুস্তকটির উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি মূলত মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের সংস্কৃত কড়চা, কবি কর্ণপূর (পরমানন্দ সেন) রচিত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত অবলম্বন করেন এবং রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীদাস প্রভৃতি সুধীগণের কাছে শোনা শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর জীবন কাহিনীর উপর নির্ভর ক'রেছেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার পর তিনি তথ্যটির প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ ক'রেছেন,—

"চৈতন্যলীলারত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

* * *

স্বরূপ গোসাঞির মত রূপ রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥ ২-২॥

* * *

দামোদর-স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে॥ ২-৮॥

*　　*　　*

স্বরূপ- গোসাঞিঃ কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাস মুখে যে সব শুনিল॥
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য-কৃপায় লিখিল ক্ষুদ্রজীব হঞা॥ ৩-৩॥" ইত্যাদি।

গ্রন্থটিতে বহু সংস্কৃত পুস্তকের সার সঙ্কলন ও প্রমাণ স্বরূপ অসংখ্য গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করা হ'য়েছে।

চৈতন্যচরিতামৃত তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদ্যলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদ (শ্লোক সংখ্যা ২৫০০); মধ্যলীলায় ২৫ পরিচ্ছেদ (শ্লোক সংখ্যা ৬০৫১); অন্ত্য-লীলায় ২০ পরিচ্ছেদ (শ্লোক সংখ্যা ৬৫০০)। এই গ্রন্থে ভাষা সর্ব্বত্র খাঁটি বাঙগলা নয়। সংস্কৃত ও বৃন্দাবনী এই দুই ভাষা কোথাও কোথাও বাঙগলার সঙেগ মিশে আছে। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে প্রবাস হেতু লেখকের বাঙগলা ভাষা এ রকম সামান্য মিশ্রিত হ'য়েছে মনে করা যেতে পারে।

শ্রীচৈতন্যের চরিতাখ্যানগুলির মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত অতুলনীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নিঃসন্দেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটিতে একাধারে জীবন-চরিত, দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব অপূর্ব্ব লিপিকলায় বিবৃত দেখা যায়। এই পুস্তকে পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ অল্প হ'লেও যেটুকু আছে প্রসাদগুণে ভরা। সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে এটির সমকক্ষ গ্রন্থ বিরল।

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কবিরাজ গোস্বামীর যেমন ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞতা, সত্যনিষ্ঠা, ভক্তি ও রচনানৈপুণ্য তেমনই ছিল তাঁর অন্তঃকরণটি কুসুমের ন্যায় কোমল ও নিষ্পাপ। সাম্প্রদায়িক দলাদলি বা বিদ্বেষের কোন চিহ্নই তাঁর গ্রন্থ মধ্যে নেই। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রে-ছিলেন এবং জীবনে তার অনুশীলন ক'রেছেন। সর্ব্বোপরি তাঁর অপূর্ব্ব বিনয়—যা একমাত্র মহাপ্রভুর বিনয়ের সঙেগই তুলনীয়। তিনি এই গ্রন্থ রচনা ক'রলে বৃন্দাবন দাস ক্ষুণ্ণ হতে পারেন সেজন্য তিনি পূর্ব্বাহ্নে তাঁর অনুমতি গ্রহণ ক'রে রচনাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং পাছে চৈতন্যভাগবতের আদর কমে যায় এই জন্য বৃন্দাবন দাস যে ঘটনাগুলি বর্ণনা ক'রেছেন সেই অংশগুলি বিস্তারিত বর্ণনা না ক'রে কেবল মাত্র স্বীয় গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা দূর করার

জন্য শুধু সূত্ররূপে উল্লেখ ক'রে গেছেন। গ্রন্থমধ্যে তিনি বার বার সবিনয়ে বৃন্দাবন দাসের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ক'রেছেন,—

"বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস॥

* * *

প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তরি করিলা বর্ণন॥
সেই ভাগের ইহা সূত্রমাত্র যে লিখিব।
তাঁহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব॥
চৈতন্য লীলায় ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥"

এবং গ্রন্থ শেষে ভণিতায় লিখেছেন,—

"প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিতবর্ণন কৈল সমাপন॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলার নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥"

* * *

"চৈতন্যচরিতামৃত যেই জনে শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

এই অপরিসীম ভক্তি ও বিনয় কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিকেই শোভা পায়।

ঐতিহাসিকতার প্রতি গ্রন্থকারের দৃষ্টি সজাগ ছিল। জীবনী-সাহিত্য লেখকের এটি একটি প্রধান গুণ। তিনি নানা ভাবে তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ ক'রেছেন। কিন্তু তিনি গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি বজায় রাখতে পারেননি। ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভক্তির জন্য তিনি অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেন নি। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী সে যুগের প্রভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধন করা ছাড়াও তিনি নিজে ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্য তাঁর চক্ষে শুধু যুগ-প্রবর্ত্তক মহামানব নন্—তিনি অবতার। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে বর্ণনা ক'রেছেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী যখন রচনা আরম্ভ করেন তার পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর পার্ষদ ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক চৈতন্যাবতারের নূতন ব্যাখ্যা প্রচারিত হ'য়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রকারদের মতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-রস আস্বাদনের জন্য (তাঁর প্রেম শ্রীরাধিকা কি ভাবে অনুভব করেন এই তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য) শ্রীরাধার ভাবকান্তি-বর্ণ অঙ্গীকার ক'রে দ্বৈতাদ্বৈত অবস্থায় নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। অতএব তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঐক্যাবতার—একই দেহে তিনি রাধা ও কৃষ্ণ। তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর এবং তাঁর জীবনে রাধাভাব মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে অবতার তত্ত্বের এই নূতন ব্যাখ্যা গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

শ্রীরূপ গোস্বামী (বিদগ্ধমাধবে) লিখেছেন,—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং সভক্তিশ্রিয়ম্।" অর্থাৎ চির অনর্পিত মুখ্য উজ্জ্বল রসাশ্রিত যে ভক্তিসম্পদ তা প্রদান করার জন্য শ্রীচৈতন্য কৃপাবশে এই কলিযুগে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন।

তিনি অন্যত্র (শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চায়) বলেছেন,—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ, তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥" অর্থাৎ শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত প্রণয়-মাধুর্য্য আস্বাদন করেন সেই মধুরিমাই বা কিরূপ, এবং এইরূপে আমার অনুভব নিবন্ধন শ্রীরাধার হৃদয়ে যে সুখানুভূতি হয় তাই বা কি রকম,—এই তিনটি বিষয় অনুভব করে জানার লোভে রাধাভাব-সম্পন্ন হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হ'লেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতের আদ্যলীলার পয়ার সমূহে শ্রীরূপ গোস্বামীর উপরোক্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলির বিশদ ব্যাখ্যা ক'রে শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন বর্ণনা ক'রেছেন।

দিগ্বিজয়ী ও রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার এবং মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার 'ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ' প্রভৃতির বর্ণনা করা কৃষ্ণদাস ব্যতীত আর কারও দ্বারা সম্ভব ছিল না। অশেষ পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তিনি এই অংশগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বিচার ও বর্ণনা ক'রেছেন। প্রেমধর্ম্ম ও আরাধ্য-আরাধকের সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা অপরূপ সুন্দর হ'য়েছে।

নিম্নে চৈতন্যচরিতামৃতের রচনার সামান্য নিদর্শন দেওয়া হ'ল,—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম বেদধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করিব যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

চৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণবগণের দ্বারা দ্বিতীয় ভাগবতরূপে ভক্তিভরে পূজিত হয়। এই গ্রন্থের এতদূর আদর ও জনপ্রিয়তা হ'য়েছিল যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত—'সারার্থ দর্শনী' নামে ভাগবতের টীকা এবং 'সারার্থ বর্ষিণী' নামে ভগবদ্‌গীতার টীকাকার—দেবগ্রাম নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (পদকর্ত্তা হরিবল্লভ) সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থের একটি টীকা প্রণয়ন করেন। বাঙলা ভাষার প্রতি অনাদরের যুগে বাঙলা পুস্তকের সংস্কৃত টীকা রচনা বিস্ময়কর ব্যাপার! এ থেকেই এই পুস্তকের কতখানি সম্মান ও সমাদর হ'য়েছিল তার কিছুটা ধারণা করা যায়। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থের এই সমাদরের কথা জেনে যেতে পারেন নি। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ বৃন্দাবনের আচার্য্যগণ বাঙলা দেশে যে সমস্ত গ্রন্থাদি প্রেরণ করেন তাব মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত মূল চৈতন্যচরিতামৃতও ছিল। বনবিষ্ণুপুরের কাছে মল্লরাজা বীর হাম্বীর নিয়োজিত দস্যুগণ কর্ত্তৃক ঐ পুস্তকের সিন্দুকটি লুণ্ঠিত হওয়ার সংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছালে বার্দ্ধক্যে জীর্ণ কবিরাজ গোস্বামী, আজীবন একাগ্র সাধনার ফল স্বরূপ এই পুস্তক নষ্ট হওয়ার শোকে, মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েন। নিত্যানন্দদাস রচিত 'প্রেমবিলাসের' মতে তাঁর সে মূর্চ্ছা আর ভাঙেনি। কিন্তু প্রেমবিলাসের অনতিকাল পরেই রচিত যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ' হতে জানা যায় যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বহুক্ষণ পরে চেতনা লাভ করেন এবং এর পরে আরও কিছুকাল ইহলোকে বর্ত্তমান ছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া কবিরাজ গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, এবং বাঙলা ভাষায় অদ্বৈত-সূত্র-কড়চা, রসভক্তি-লহরী, স্বরূপবর্ণন, রাগময়ীকণা প্রভৃতি পুস্তকগুলি রচনা ক'রেছিলেন। এগুলি তাঁর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা। চৈতন্যচরিতামৃতই সম্ভবত তাঁর শেষ গ্রন্থ।

## শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু

বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের পরেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের স্থান। তাঁদের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ চৈতন্য-জীবনীগুলিতে ও বহু বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যায়। এঁরা শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হ'য়েছিলেন এবং এই ভক্তগণ যে অভাব বোধ করতেন তা পূরণ করতেই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। দীনেশবাবুর ভাষায় বলা যায়,—"ইঁহারা দীপশলকা; কিন্তু চৈতন্যদেব দীপ। চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে ইঁহারা জ্বলিতে পারিতেন কি না, কে বলিবে?"

নিত্যানন্দ ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিবাস বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে। তাঁর পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাড়ুড়ী, পিতার নাম হড়াই ওঝা এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ শালিগ্রামে সূর্য্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা দেবী ও জাহ্নবী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। জাহ্নবী দেবীর গর্ভে বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) নামে পুত্র ও গঙ্গা নামে কন্যা জন্মে। নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে 'বিষ্ণুভক্তি পথের প্রথম অবতার' মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে অগ্রজের ন্যায় মান্য ও সমাদর করতেন। সে জন্য তাঁকে বলরামের অবতার বলা হয়।

বীরচন্দ্র নিত্যানন্দের উপযুক্ত পুত্র। তিনি খড়দায় বসবাস করেন। বৈষ্ণব সমাজের উপর তাঁর অশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি এই সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। গৌড়ের মুসলমান সম্রাট্ তাঁকে বিশেষ সমাদর করতেন। শ্যামসুন্দর রায়ের বিগ্রহ নির্ম্মাণের জন্য সম্রাট্ তাঁকে একটি বহু মূল্যবান কৃষ্ণ প্রস্তর উপহার দিয়েছিলেন এবং মুসলমান আক্রমণ হ'তে মন্দিরের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ সাঙ্কেতিক খন্তি উপহার দিয়েছিলেন। বীরচন্দ্র জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ হ'ল 'নেড়া নেড়িগণকে' শোচনীয় অবস্থা হ'তে মুক্তিদান। ভারতবর্ষ হ'তে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হওয়ার পরও বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী (সহজিয়াগণ) বাঙলাদেশে হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে পতিত ও অস্পৃশ্যরূপে অবশিষ্ট ছিল। এশিয়ার প্রধান প্রধান বৌদ্ধ মঠগুলির সঙ্গে সম্পর্কবিচ্যুতি ঘটায় এরা আদর্শ-ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে এবং এদের মধ্যে নৈতিক অবনতি ও নানা ব্যভিচার দেখা দেয়। মস্তক মুণ্ডিত থাকার জন্য এদের 'নেড়া নেড়ি' বলা হত। এদের মধ্যে অনেকে সামাজিক পীড়ন অসহ্য হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক সুবিধা ও রাজানুগ্রহ লাভের আশায় ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। বীরচন্দ্র খড়দায় প্রায় ১২০০ ভিক্ষু

ও ১৩০০ ভিক্ষুণীকে বৈষ্ণব ধৰ্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং তিনি একটি বিধান সৃষ্টি করেন যাতে বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম গ্রহণ করার পর তারা সহজেই বিবাহ করতে পারবে! এই ভাবে বীরচন্দ্র এই পতিত নেড়া-নেড়িগণকে সমাজে সমান মর্যাদা লাভের সুযোগ করে দিলেন এবং তাদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনের সৃষ্টি করে বহু ব্যভিচার ও গুপ্ত শিশুহত্যা রোধ করলেন।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন, তা ছাড়া তিনি 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তার' নামে পুস্তকও রচনা করেন। প্রেমবিলাস-কার নিত্যানন্দ দাস বার বার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বীরচন্দ্রেরও জীবনী রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই পুস্তকের কোন সন্ধানই আজ পৰ্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। নিত্যানন্দের বংশলতিকার মধ্যেও নানা গোলযোগ আছে শোনা যায়।

অদ্বৈতাচার্য্যের পূৰ্ব্বপুরুষের আদি নিবাস শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় পরগণার অধীন নবগ্রাম। কিন্তু তিনি শান্তিপুরে এসে বসবাস করেন। অদ্বৈত ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহের নাম নৃসিংহ, পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম নাভা দেবী এবং পত্নীর নাম সীতা দেবী।

অদ্বৈতের প্রকৃত নাম কমলাক্ষ। তিনি বাল্যে শান্তিপুরে বিদ্যাশিক্ষা করতে আসেন। বেদপাঠ ও অন্যান্য শিক্ষা সমাপন করার পর তিনি 'বেদ-পঞ্চানন' এবং 'অদ্বৈত-আচার্য্য' উপাধি দু'টি লাভ করেন।

অদ্বৈত মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞাত হ'য়েছিলেন। এই কারণে মহাপ্রভু তাঁকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ক'রতেন। আবার অদ্বৈত নিজেকে মহাপ্রভুর দাসানুদাস জ্ঞান ক'রতেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, তাঁরই ভক্তিতে আকৃষ্ট হ'য়ে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন;—'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার। সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥' (চৈ. ভা)। চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়, অদ্বৈতই সৰ্ব্বপ্রথম চৈতন্য-বিষয়ক পদ রচনা করেন। তারপর নাম করা যায়, নরহরি সরকার ঠাকুরের। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হ'য়েছে যে, অদ্বৈতাচাৰ্য্য বৃন্দাবনে গিয়ে সৰ্ব্বপ্রথম মদনমোহনের বিগ্রহটি আবিস্কার ক'রেছিলেন। কথিত আছে, এই মূৰ্ত্তিটি কুব্জার আদেশে নিৰ্ম্মিত হ'য়েছিল। মুসলমান আক্রমণের ভয়ে অদ্বৈত এই মূৰ্ত্তিটি লুকিয়ে রাখেন এবং পরে মথুরা চৌবে নামে একজন ভক্তকে প্রদান করেন। সনাতন গোস্বামী আবার এই শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট বিগ্রহটি পেয়ে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। অদ্বৈত প্রভু প্রায় ১২৫ বৎসর জীবিত

ছিলেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'য়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

"মহাবিষ্ণুব অংশ হৈল অদ্বৈত-গুণধাম।" (চৈ. চ)—অদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অংশ হতে অবতীর্ণ বলে কথিত হন। অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস (শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের ভূতপূর্ব্ব রাজা দিব্যসিংহ) সর্ব্বপ্রথম 'বাল্য-লীলাসূত্র' নামে অদ্বৈত প্রভুর প্রথম বয়সের একটি চরিতাখ্যান রচনা করেন। এছাড়া, হরিচরণ দাস রচিত অদ্বৈত-মঙ্গল, ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত-প্রকাশ (১৫৬৮ খৃীঃ) এবং নরহরি দাস রচিত অদ্বৈত-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে অদ্বৈতের জীবন-চরিত বর্ণিত হ'য়েছে। অদ্বৈত প্রভুর ভার্য্যা সীতা দেবীরও দু' একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত কাব্য পাওয়া গেছে। লোকনাথ দাস নামে কোন ভক্ত রচিত 'শ্রীসীতাচরিত্র' এবং সীতা দেবীর শিষ্য বিষ্ণুদাস আচার্য্য রচিত 'সীতাগুণকদম্ব' এই জাতীয় পুস্তক।

## ছয় গোস্বামী

### (১) রূপ গোস্বামী—

এ'র এক পূর্ব্বপুরুষ জগদ্‌গুরু (বিপ্ররাজ) মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এবং কর্ণাট দেশের রাজা ছিলেন। এ'র পিতার নাম কুমারদেব এবং মাতার নাম রেবতী দেবী। কুমারদেব বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে বসবাস করেন। আনুমানিক ১৪৯০ খৃীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৯২ খৃী) রূপ গোস্বামীর জন্ম হয়। এ'র পূর্ব্বনাম সন্তোষ। ইনি পদগৌরবে সাকর-মল্লিক (Chief Secretary) নামে সম্রাট্ হুসেন শাহের মন্ত্রীত্বের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর অগ্রজ অমর (সনাতন) দবীর-খাস (Private Secretary) নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা গৌড়ের উপকণ্ঠে রামকেলি গ্রামে বাস স্থাপন করে-ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, ফাসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁরা উভয় ভ্রাতাই বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। আনুমানিক ১৫১৩ অথবা ১৫১৬ খৃীষ্টাব্দে তাঁরা রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মহাপ্রভু সাকর-মল্লিক ও দবীর-খাসের যথাক্রমে নামকরণ করেন রূপ ও সনাতন। এর পর রূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গিয়ে অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্ম, সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। রূপ গোস্বামী ছিলেন একাধারে ভক্ত, কবি, আলংকারিক,

রসবেত্তা, দার্শনিক, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ও শাস্ত্রকৃত। তাঁর রচিত উজ্জ্বলনীলমণি (এটি রসগ্রন্থ বা প্রেম-বিজ্ঞান। এতে ৩৬৫ রকম ভাবে প্রেমের বিভিন্ন বিচিত্র আবেগ আলোচনা করা হ'য়েছে। নায়িকার হৃদয়ের সম্ভবপর অনুভূতিগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে সংস্কৃত ক্লাসিক সাহিত্য হ'তে উদাহরণ প্রদর্শন করা হ'য়েছে।) এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (এটিতে বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে।)—এই গ্রন্থ দু'টিকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বেদ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি ব্যতীত রূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ললিত-মাধব, বিদগ্ধ-মাধব, দানকেলি-কৌমুদী প্রভৃতি নাটক, হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ দূত-কাব্য, লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। রূপ গোস্বামীর রচনাগুলির মধ্যে কবিত্বের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি ও কল্পনার অপরূপ প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়। শোনা যায়, তিনি 'কারিকা' নামে একটি গ্রন্থ বাঙলা গদ্যে রচনা ক'রেছিলেন। আনুমানিক ১৫৯১ (মতান্তরে ১৫৬৫) খৃীষ্টাব্দে রূপ গোস্বামীর তিরোধান ঘটে।

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ঊনবিংশ ও বিংশতিতম পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যলীলার প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে রূপ-সনাতনের অপূর্ব্ব জীবন-আলেখ্য পাওয়া যায়।

**(২) সনাতন গোস্বামী—**

রূপ গোস্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর সনাতন সম্রাট্ কর্ত্তৃক বন্দী হ'ন। তিনি সেখান থেকে পলায়ন করে দরবেশের ছদ্মবেশে মহাপ্রভুর সঙ্গে কাশীতে মিলিত হন। রূপ গোস্বামীর অগ্রজ ও গুরুতুল্য সনাতন তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সেই সঙ্গে অপরিসীম তিতিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। মহাপ্রভুর নির্দ্দেশিত পথে সনাতন বৈষ্ণব সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় হরি-ভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি রচনা করেন। সনাতনের বিনীত স্বভাবের জন্য, এবং কিছুটা সামাজিক কারণেও, সনাতনের ইচ্ছায় এই গ্রন্থখানি গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত হ'য়েছে। এই গ্রন্থের টীকা দিক্‌প্রকাশিকাও সনাতনের রচিত। সটীক ভাগবতামৃত এবং বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থ সনাতন রচিত। সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে আগরদাসের শিষ্য নাভাজী-কৃত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থে একটি অপূর্ব্ব গল্প আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটিকে অবলম্বন করে তাঁর 'স্পর্শমণি' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেছেন। মুঘল সম্রাট্ আকবর ত্যাগ, বিনয়, ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের প্রতিমূর্ত্তি সনাতন ও রূপের যশ-সৌরভে আকৃষ্ট

হ'য়ে ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁদের দর্শনলাভ করেন এবং তিনি তাঁদের যথেষ্ট সমাদর করতেন। অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহ রূপ-সনাতনকে গুরুত্বে বরণ করেন। আনুমানিক ১৫৯১ (মতান্তরে ১৫৫৯) খ্রীষ্টাব্দে সনাতন অপ্রকট হন।

**(৩) জীব গোস্বামী—**

জীব গোস্বামী নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ঋষি। মরমী বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণে তিনি তাঁর খুল্লতাত ও গুরু রূপ গোস্বামীকেও ছাড়িয়ে গেছেন। ইনি রূপ-সনাতনের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বল্লভের (অনুপম) পুত্র। তাঁর জন্মকাল অজ্ঞাত। তবে অনুমান করা হয়, ষোড়শ শতকের প্রথম বা দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই কোন সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়। শৈশবেই মাতাপিতার বিয়োগ হওয়ায় এবং অল্প বয়সে ঈশ্বরানুভূতি হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগ করে বারাণসীতে পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির কাছে ছয় বৎসর কাব্য স্মৃতি ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং বৃন্দাবনে গিয়ে কৌমার্য্যব্রত ধারণ করে আজীবন বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রায় সকল বিষয়েই সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর পরিণত বয়সে রচিত গোপালচম্পূ, ভক্তিরসামৃতশেষ, সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম প্রভৃতি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী ও তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র তাঁকে শুধু বৈষ্ণব দার্শনিকদের মধ্যেই অগ্রগণ্য করেনি—সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ সুধীবৃন্দ, তীর্থঙ্কর এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের সঙ্গে সমান আসন প্রদান করেছে।

শ্রীজীব রূপ গোস্বামীর শিষ্য। কিন্তু তিনি শুধু ভাগ্যবান শিষ্যই ছিলেন না,—ভাগ্যবান গুরুও ছিলেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ গোস্বামী চৈতন্যোত্তরকালে বাঙলা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব-জগৎ শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিগণের প্রচারিত ভাবধারায় প্রদীপ্ত করে তুলেছিলেন।

**(৪) রঘুনাথ দাস—**

ইনি বৃন্দাবনের বিখ্যাত ষট্-গোস্বামীর অন্যতম এবং বৈষ্ণব সমাজে দাস-গোস্বামী নামে পরিচিত। ইনি সপ্তগ্রামের রাজা গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র। আনুমানিক ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনাথ, গৌতম

বুদ্ধের মতোই ঐশ্বর্য্যবিলাসের স্রোতে প্রাণ-পদ্মকে ভেসে যেতে না দিয়ে, তরুণ বয়সে সুন্দরী বনিতা, নৃত্য-গীত-মুখর রাজপ্রাসাদ ও বিশাল রাজত্ব পরিত্যাগ করে শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর আদেশে বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করেন। যেমন তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, তেমনি ছিল তাঁর মহান চরিত্র। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর সাধনার কথা চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হ'য়েছে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় স্তবাবলী, মুক্তাচরিত, দানচরিত, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এ'র রচিত কয়েকটি বৈষ্ণব পদও পাওয়া যায়। ইনি ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

**(৫) রঘুনাথ ভট্ট—**

ইনি বারাণসী নিবাসী, শ্রীচৈতন্যের ভক্ত, তপন মিশ্রের পুত্র। তপন মিশ্র মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে দু'মাস সেবা করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর আজ্ঞায় বৃন্দাবনে গমন করে রূপ-সনাতনের সহকর্ম্মীরূপে বাস করেন।

**(৬) গোপাল ভট্ট—**

দাক্ষিণাত্যে ভট্টমারী গ্রামে বেঙ্কট ভট্ট নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। উপনিষদের বিখ্যাত ভাষ্যকার ধর্ম্মরাজ অধিরেন্দ্র বেঙ্কট ভট্টকে গুরু বলে উল্লেখ করেছেন। বেঙ্কট ভট্টের তিন পুত্র,—ত্রিমল্ল, প্রবোধানন্দ ও গোপাল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু চার মাস ত্রিমল্ল বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। আনুমানিক ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল ভট্টের জন্ম হয়। তিনি অগ্রজ প্রবোধানন্দের কাছে শিক্ষা লাভ করে নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। তিনি মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৃন্দাবনে আসেন এবং বিখ্যাত ছয় গোস্বামীর অন্যতম রূপে পরিচিত হন। ভক্তমাল গ্রন্থে একটি গল্প আছে যে, গোপাল ভট্ট রাধারমণ নামে যে শালগ্রাম শিলার পূজা করতেন সেটি তাঁর ভক্তিতে ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সহসা কৃষ্ণের মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য এই গোস্বামী গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আনুমানিক ১৫৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল ভট্ট ইহলোক ত্যাগ করেন।

## বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছয়টি প্রধান কেন্দ্র

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছয়টি প্রধান কেন্দ্র স্থান হ'ল,—বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র (নীলাচল), বাঁকুড়া জেলার বন-বিষ্ণুপুর, রাজসাহী জেলার খেতুরি এবং উড়িষ্যা। এগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি স্থান—যথাক্রমে রাধামাধবের মধুরলীলার স্থল, মহাপ্রভুর পবিত্র জন্ম ও আদ্যলীলার স্থান এবং মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্ত্যলীলার পুণ্যভূমিরূপে—শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালেই এবং শেষোক্ত তিনটি স্থান চৈতন্যোত্তর কালে যথাক্রমে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ গোস্বামীর ত্যাগ ও আজীবন একাগ্র সাধনায় ও চরিত্র মাধুর্য্যে প্রাধান্য লাভ করে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষায় রচিত গ্রন্থে এই তিন আচার্য্যের কাহিনী বিস্তৃত ও সুন্দর ভাবে বর্ণিত হ'য়েছে।

**শ্রীনিবাস আচার্য্য—**

শ্রীনিবাস চৈতন্যোত্তরকালে বাঙ্গলা দেশের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আচার্য্য। ইনি মহাপ্রভুর অবতাররূপে কল্পিত হন। প্রিয়দর্শন শ্রীনিবাস নদীয়ার নিকটে চাখন্ডী গ্রাম নিবাসী মহাপ্রভুর পরমভক্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের (চৈতন্যদাস) একমাত্র সন্তান। তাঁর মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। আনুমানিক ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যে পন্ডিত ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাসের টোলে তিনি বিদ্যার্জ্জন করেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বৃন্দাবনে, তদানীন্তন উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সুধী, জীব গোস্বামীর নিকট তিনি বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন এবং গোপাল ভট্টের দ্বারা দীক্ষিত হন। নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তাঁর সহধ্যায়ী ছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ বঙ্গদেশে বিস্তৃত ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য এবং রূপ-সনাতনের দার্শনিক গ্রন্থাদি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, হরিভক্তিবিলাস এবং মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথে শ্রীধর আচার্য্যকৃত ভাগবতের টীকা এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গোস্বামীর জীবনব্যাপী সাধনায় রচিত অমূল্য গ্রন্থাদি বৃহত্তর বৈষ্ণব সমাজে প্রচারের জন্য চিন্তিত ছিলেন। তাঁরা এই ত্রয়ীর উপর এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করে গ্রন্থগুলি তাঁদের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশে পাঠান। পথে বিষ্ণুপুরের কাছে

বিষ্ণুপুরের স্বাধীন নরপতি ও দস্যু-সর্দ্দার বীর হাম্বীর নিয়োজিত দস্যু-দলের দ্বারা গ্রন্থের সিন্দুকটি অপহৃত হয়। গ্রন্থের অনুসন্ধানে শ্রীনিবাস রাজসভায় উপস্থিত হ'লে রাজা তাঁর পাণ্ডিত্য ও ভক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে অনুতপ্ত-চিত্তে গ্রন্থগুলি প্রত্যার্পণ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হরিচরণ দাস নামে অভিহিত হন। রাণী সুলক্ষণাও বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। রাজা স্বীয় গুরু শ্রীনিবাসের চরণে সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করে স্বয়ং তাঁর প্রতিভূ হ'য়ে রাজ্য পরিচালনা করেন। শ্রীনিবাস ভক্তগণের অনুরোধে দুইবার দার-পরিগ্রহ করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নাম দ্রৌপদী (ঈশ্বরী) এবং দ্বিতীয়ার নাম পদ্মাবতী (গৌরাঙ্গপ্রিয়া)। শ্রীনিবাসের তিন পুত্র—বৃন্দাবনাচার্য্য, রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ও গোবিন্দগতি আচার্য্য; তিন কন্যা—হেমলতা দেবী, কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী ও কাঞ্চনলতিকা দেবী।

বীর হাম্বীর ও তাঁর বংশধরগণের চেষ্টায় বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায়। রাজ্যমধ্যে জীব হনন নিষিদ্ধ হয় এবং প্রতিদিন নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় ভগবানের নাম জপ না করা আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য হয়। রাজা গোপালসিংহদেবের সময় এই আইন আরো কড়া হয় এবং সে অঞ্চলের লোক এই বাধ্যতামূলক পূজার্চ্চনাকে পরিহাস করে 'গোপালসিংহের ব্যাগার' বলত।

**নরোত্তম দাস ঠাকুর—**

নরোত্তম খেতুরির রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের একমাত্র পুত্র। তাঁর মাতার নাম নারায়ণী। আনুমানিক ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁর জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তাঁর ঈশ্বরানুভূতি হয় এবং তিনি বারে বারে অসীমত্বের আহ্বান অনুভব করতেন। ষোল বছর বয়সের সময় তিনি লোকজনসহ অশ্বারোহণে গৌড়ে যাওয়ার পথে অন্তর্হিত হন এবং বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পদব্রজে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। তিনি লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে জীব গোস্বামীর কাছে অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর নরোত্তম শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে বঙ্গদেশ যাত্রা করেন। বিষ্ণুপুরে গ্রন্থের সিন্দুকটি অপহৃত হওয়ার পর তিনি খেতুরির উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। মাতা পিতা এবং খুল্লতাত পুত্র ও বর্ত্তমান রাজা সন্তোষ রায়ের সহস্র অনুরোধ আর তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে পারেনি।

নরোত্তমের একমাত্র অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য রাজা খেতুরিতে দশ দিনব্যাপী বিরাট্ উৎসবের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের এবং অপর পাঁচটি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। সহস্র সহস্র বৈষ্ণব এই বিখ্যাত উৎসবে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহাপ্রভুর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীনিবাস, বৃন্দাবনদাস, শ্যামানন্দ, পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নরহরি সরকার, বীর হাম্বীর প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবে সুকণ্ঠ নরোত্তম লীলা-কীর্ত্তন করেন* এবং এই পদ্ধতি সেই পরগণার নাম অনুসারে গরানহাটী নামে প্রচলিত। পরবর্ত্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে রেণেটী (রাণীহাটী) পদ্ধতি বিপ্রদাস নামে কীর্ত্তন গায়কের দ্বারা প্রচলিত হয়। তারপর আসে মনোহরশাহী পদ্ধতির যুগ। খেতুরির এই বিখ্যাত উৎসব আনুমানিক ১৫৮৩ খৃীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। "এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথ প্রদর্শক আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েক জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি।...এই উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক বৈষ্ণব-লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

নরোত্তমের সাধনা ও নির্ম্মল চরিত্রে আকৃষ্ট হ'য়ে নিষ্ঠাবান বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ-সন্তান কায়স্থ-সন্তান নরোত্তমের পদধূলি গ্রহণ করে নিজেদের পবিত্র মনে করেছেন এবং তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। নরোত্তম রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাঁর প্রার্থনার পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁকে নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার মনে করেন।

**শ্যামানন্দ গোস্বামী—**

শ্যামানন্দের পূর্ব্বপুরুষ আগে বাঙলা দেশের অধিবাসী ছিলেন, পরে উড়িষ্যায় গিয়ে বসবাস করেন। শ্যামানন্দের পিতা সদ্‌গোপ জাতীয় কৃষ্ণ

---

* "এথা সর্ব্বমহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম-দ্বারে॥
হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলুঁ।
এ হেন গানের প্রথা কভু না দেখিলুঁ॥
নরোত্তম-কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
যে পিয়ে তাহার তৃষ্ণা বাঢ়ে অনিবার॥"

—নরোত্তমবিলাস, সপ্তম বিলাস।

মণ্ডল উড়িষ্যার দণ্ডকেশ্বরের কাছে ধারেন্দ্রাবাহাদুরপুরে বাস করতেন। এঁদের পৈতৃক পেশা কৃষিকার্য্য। শ্যামানন্দের মাতার নাম দুরিকা। বাল্যে শ্যামানন্দের নাম ছিল 'দুখী'। সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকের উচ্চশিক্ষার নানা প্রতিবন্ধক থাকলেও দুখী অসীম অধ্যবসায়ে তরুণ বয়সে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন এবং আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা বলবতী হওয়ায় গোপনে সংসার পরিত্যাগ করেন। .তিনি অম্বিকা-কালনায় গৌরীদাসের শিষ্য হৃদয়-চৈতন্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে কৃষ্ণদাস নাম নেন। এর পর তিনি বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর ছাত্র হন। কথিত হয়, কৃষ্ণদাস কৃষ্ণের সম্মুখে রাধাকে সমস্ত রাত্রি নৃত্য করতে দেখেন এবং প্রভাতে রাধার একটি চরণের নূপুর কুড়িয়ে পেয়ে জীব গোস্বামীকে দেন। জীব গোস্বামী তাঁর নামকরণ করেন শ্যামানন্দ। ভক্ত বৈষ্ণবের চক্ষে তিনি অদ্বৈতপ্রভুর অবতার। শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে দেশে ফেরেন। মল্লভূমের রাজা রসিকমুরারি ও তাঁর দুই রাণী ঈশানী ও মালতী শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই রাজার প্রভাবে অভিজাত সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের নরপতি রসিকমুরারির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উড়িষ্যায় মহাপ্রভুর শেষ জীবনের প্রভাব ছিলই তার উপর শ্যামানন্দ সেখানের দীনতম কুটীর থেকে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অমৃত-বাণী বহন করে নিয়ে যান।[১]

উপাসনা-সার-সংগ্রহ নামে বৈষ্ণবতত্ত্বের একটি পুঁথির শেষে এই রকম ভণিতা পাওয়া যায়,—

"শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর পাদপদ্ম-আশ।
উপাসনাসার কহে শ্যামানন্দ দাস॥"

## পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন

পৃষ্ঠা ৫এ প্রথম অনুচ্ছেদের পূর্ব্বে এই অংশটুকু পড়তে হবে,—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'বংশীখন্ড' থেকে একটি পদ উদ্ধৃত করা হ'ল। রাধাকে বশ করার শেষ চেষ্টায় কৃষ্ণ রত্নখচিত একটি অপূর্ব্ব বাঁশী গড়লেন। এই মোহন-বাঁশীর ধ্বনিতে ব্যাকুল হ'য়ে রাধা বড়ায়িকে সম্বোধন করে বলেছেন,—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন আভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চন্ডীদাসে॥"

'রাধাবিরহ' খন্ডের নিম্নোদ্ধৃত পদটি রাধার উক্তি। পদটি প্রচলিত পদাবলী সাহিত্যে 'প্রথম প্রহর নিশি, সুস্বপন দেখি বসি, সব কথা কহিয়ে তোমারে' এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়। পদটির প্রাচীন—সমসাময়িক—ভাষা বহুল-প্রচারের জন্য, গায়ক ও লিপিকরগণের কৃপায়, বারবার রূপান্তরিত হ'য়ে ঐ ভাবে আধুনিক যুগের ভাষায় পরিণত হ'য়েছে।

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহানিলোঁ তাহার বদনে।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভৈ.লোঁ মদনে॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥"

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যেখানে শেষ, পদাবলীর সেখানে আরম্ভ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ক্ষুধাই রূপান্তরিত হ'য়ে পদাবলীর অতীন্দ্রিয় প্রেমের সুধায় পরিণত হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংসারানভিজ্ঞা, অশিক্ষিতা গোপ-বালিকা 'চন্দ্রাবলী রাহী'র চিত্তের উন্মেষ প্রতিটি স্তরে চমকপ্রদ। কিন্তু প্রেমের সোনারকাঠির স্পর্শে এই রাধার প্রকৃত জাগরণ দেখতে পাই পদাবলীতে। সেখানে রাধার সমস্ত দ্বিধা, সব দ্বন্দ্ব-সংশয়,—সব বোঝাপড়ার অবসান হ'য়েছে। উপলব্ধি হ'য়েছে পরম সত্যের। যেন সমুদ্রগামী এক তটিনী মোহনার কাছে এসে তার আঁকাবাঁকা গতিপথ ছেড়ে অনন্ত-সমুদ্রে মিশে যেতে চেয়েছে এক হ'য়ে—চরম আত্মনিবেদনে।

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোঁহারে সঁপেছি, কুল শীল জাতি মান॥

* * *

কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম, তোমার চরণ মানি॥"

পৃষ্ঠা ২১এ প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় চরণে পড়তে হবে,—পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী অথবা মেনকা। (একটি পুঁথিতে পাওয়া যায়,—'পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে। জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে॥')

পৃষ্ঠা ২৪এ প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বাদশ চরণের পর পড়তে হবে,—বর্ত্তমানে বাল্মীকি-রামায়ণে শ্লোক সংখ্যা ২৪০০০, কিন্তু বৌদ্ধ মহা-বিভাষা গ্রন্থের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে মনে হয়, খৃষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতকেও এই মহাকাব্যে শ্লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ১২০০০।

পৃষ্ঠা ৭২এ প্রথম চরণে পড়তে হবে,—মহাভারতে বর্ণিত পরীক্ষিৎ (ডক্টর শ্রীযুত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যে, পরীক্ষিৎ-এর বর্ত্তমান কাল

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতক।)—এর জ্যেষ্ঠপুত্র জনমেজয়ের সর্পসত্র বা সর্পযজ্ঞ এমনিই এক যুদ্ধের মার্জ্জিত রূপ। সুপণ্ডিত Pargiter, এই সর্প-সত্রের কাহিনীকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করে,—এই সর্পকে নাগ নামে এক জাতির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন,—"the Nagas killed Parikshit II, but his son Janamejaya III defeated them and peace was made!" (AIHT)

পৃষ্ঠা ১৫০এ প্রথম অনুচ্ছেদের পরে পড়তে হবে,—খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক সম্রাট্ সেলুকস প্রেরিত রাজদূত মেগাস্থিনিস্ তাঁর বিবরণীতে পাটলিপুত্রের পূর্ব্বভাগে ও গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাঢ় নামে এক পরাক্রমশালী বৃহৎ জনপদের কথা লিখেছেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অনুমান যে এই জনপদই রাঢ় দেশ বা পশ্চিম-বঙ্গ।

পৃষ্ঠা ১৫৮এ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ চরণ দু'টি শুদ্ধ ক'রে এই ভাবে পড়তে হবে,—খালিমপুর-লিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতামহের নাম 'সর্ব্ববিদ্যাবিৎ' দয়িতবিষ্ণু এবং পিতার নাম 'খণ্ডিতারাতি' ব্যপট। (পাল-রাজাদের যতগুলি অনুশাসন পাওয়া গেছে তার মধ্যে খালিমপুরে প্রাপ্ত উক্ত তাম্রলিপিখানিই প্রাচীনতম। ঐটি ধর্ম্মপালদেবের দ্বাত্রিংশৎ রাজ্যাঙ্কে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ এবং রচনাভঙ্গি সুন্দর।)

পৃষ্ঠা ১৫৯এ পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক আলোচনা প্রয়োজন। 'বাঙালীর ইতিহাস-'এ দেখা যায় যে, প্রথম বিগ্রহপাল অথবা শূরপাল বোধহয় ছিলেন দেবপালের সমরনায়ক বাক্পালের পুত্র। 'An Advanced History of India' তে এবং অন্যান্য ইতিহাসে দেখা যায়, বাক্পাল পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের অন্যতম পুত্র এবং ধর্ম্মপালদেবের ভ্রাতা। বাক্পালের পুত্রের নাম জয়পাল। প্রথম বিগ্রহপাল (প্রথম শূরপাল) উক্ত বাক্-পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র।

ঐ পৃষ্ঠাতেই ত্রিংশৎ চরণে 'বাঙালীর ইতিহাস' অনুসরণ করে লেখা হ'য়েছে, প্রথম মহীপালের পুত্র জয়পাল। কিন্তু 'An Advanced History of India' এবং অন্যান্য ইতিহাসের মতে প্রথম মহীপালের পুত্রের নাম নয়পাল।

পৃষ্ঠা ১৬১তে তৃতীয় অনুচ্ছেদের চতুর্থ-পঞ্চম চরণ দ্রষ্টব্য। 'বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম-'কার শ্রীযুত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন যে, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যায়িকায় গৌড়েশ্বররূপে রাজা ধর্ম্মপালই বিরাজ করছেন "এবং অদৃষ্টের ফেরে তাঁহারই অঙ্কলক্ষ্মী 'রম্না' তাঁহার কৌলিকুণ্ডিকা 'রঞ্জাবতী' সাজিয়া পরের ঘর করিতেছেন"।

উপরোক্তগুলি ছাড়াও কোথাও কোথাও মুদ্রাকর-প্রমাদ রয়ে গেছে। সে সমস্তগুলি সহজেই পাঠক-পাঠিকার চোখে পড়বে। তাই সেগুলির উল্লেখ করে বইটি আর ভারাক্রান্ত করা হ'ল না।

# গ্রন্থ-পঞ্জী


অন্নদামঙ্গল — ভারতচন্দ্র।
আধুনিক সাহিত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য — মৌলবী এনামুল হক্।
কবিকঙ্কণ চণ্ডী (২ খণ্ড) — মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)
কৃত্তিবাসী রামায়ণ — ডক্টর ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত।
কালিকা পুরাণ — বঙ্গবাসী সংস্করণ।
কাশীরামদাসের মহাভারত —
কীর্ত্তন পদাবলী — শ্রীসুধীর রায় ও শ্রীঅপর্ণা দেবী।
গীত-গোবিন্দম্ — শ্রীজয়দেব।
গোবিন্দদাসের কড়চা — ডক্টর ৺দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)।
গোবিন্দ-গীতাবলী — ডক্টর ৺গঙ্গানাথ ঝা সম্পাদিত।
গৌড়লেখমালা — ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
চণ্ডীদাস পদাবলী — শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
চর্য্যাপদ — শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত।
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য — ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী — শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত।
ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম) — ৺যোগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
ধর্ম্মমঙ্গল (মাণিক গাঙ্গুলি) — সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।
পদ্মাপুরাণ — বিজয়গুপ্ত।
পঞ্চভূত — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রাচীন সাহিত্য — ”
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস — ডক্টর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী — ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন।
প্রাচীন বাংলা লেখকগণ (শনিবারের চিঠি) — ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
” ” — শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব — ৺রামগতি ন্যায়রত্ন।
বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — ডক্টর ৺দীনেশচন্দ্র সেন।
বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (২ খণ্ড) — ”
বৃহদ্বঙ্গ — ”
বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী — ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম — শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত।
বাঙ্গালার ইতিহাস (২ খণ্ড) — ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন।
বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য — ”
বাঙলা সাহিত্যের ভূমিকা — শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা—শ্রীমদনমোহন কুমার।
বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)—ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়।
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাংলা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান—শ্রীবিজয়কুমার মজুমদার। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২০)।
বাংলার ব্রত—ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বাণীদীপ—ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত।
বিদ্যাপতি—রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।
বাল্মীকি-রামায়ণ (সারানুবাদ)—শ্রীরাজশেখর বসু।
বেহুলা—ডক্টর ৺দীনেশচন্দ্র সেন।
বৌদ্ধগান ও দোঁহা—ডক্টর ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাহিত্য—ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—
ভাগবত—
ভারত সংস্কৃতি—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
ভারতের ইতিকথা—ডক্টর শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভারতবর্ষের মানব ও মানব সমাজ—শ্রীশরৎচন্দ্র রায়। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৫)।
ভাষার ইতিবৃত্ত—ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন।
মহাভারত (অনুবাদ)—৺কালিপ্রসন্ন সিংহ।
মহাভারত (সারানুবাদ)—শ্রীরাজশেখর বসু।
মহাকবি বিদ্যাপতি—
মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি—আরা নাগরী প্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত।
রসকদম্ব (কবিবল্লভ বিরচিত)—শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু)—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন— শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত।
শ্রীগৌড়পদ তরঙ্গিণী—শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র কর্তৃক সংকলিত ও ৺মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত।
শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীবৃন্দাবন দাস বিরচিত।
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত।
শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল—শ্রীজয়ানন্দ বিরচিত।
শ্রীধর্ম্মপুরাণ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৫ খণ্ড)—৺সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত।
শ্রীশ্রীপদামৃতমাধুরী—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত।
সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ—ডক্টর শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

A History of Brajabuli Literature—Dr. Sukumar Sen.
An Advanced History of India—Majumdar, Raichaudhuri and Datta.
Buddhist Mystic Songs—Edited by Dr. Md. Shahidullah.

Chaitanya and his age—Dr. Dinesh Chandra Sen.
Dance of Shiva and other Essays—A. Coomarswamy.
Discovery of Living Buddhism in Bengal—Mm. Haraprasad Sastri.
Dharma Worship—K. P. Chattopadhaya.
Early History of the Vaishnava Sect—H. C. Ray Chaudhuri.
Early History of the Vaishnava faith and movement in Bengal—Dr. S. K. De.
Encyclopaedia of Religion and Ethics—W. Crooke.
History of Bengal (D.U.)—Dr. R. C. Mazumdar.
History of Indian Literature—Winternitz.
Indus Valley Civilisation—Mackay.
Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature—Dr. Sashi Bhusan Das Gupta.
Origin and Development of Bengali Language—Dr. Suniti Kumar Chatterji.
Outline of Mahayanism—Suzuki.
Some Aspects of Bengali Society—Dr. T. C. Das Gupta.
Studies in the Tantras—Dr. P. C. Bagchi.
The Ideals of Indian Art—E. B. Havell.
The Popular Religion and Folklore of Northern India—W. Crooke.
The Village gods of South India—H. Whitehead.
The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal—Dr. D. C. Sen.
The Bengali Ramayans—Dr. D. C. Sen.
Tree and Serpent Worship—J. Ferguson.
Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems—R. G. Bhandarkar.